মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

বড়দাদা

৺পশুপতিনাথ সান্যাল

প্রবোধকুমার সান্যালের অন্যান্য বই

মহাপ্রস্থানের পথে
জলকল্লোল
যত দূর যাই
অরণ্য পথ
জীবনমৃত্যু
আগ্নেয়গিরি
উত্তরকাল
শ্রেষ্ঠগল্প
মল্লিকা
লাল রং
বন্যাসঙ্গিনী
নদ ও নদী
দেশ-দেশান্তর
হাসুবানু
বনহংসী
মধুচাঁদের মাস
কল্পান্ত
নীচের তলায়
আঁকাবাঁকা
পঞ্চতীর্থ
দুরাশার ডাক
অঙ্গরাগ
দেবীর দেশের মেয়ে
এই যুদ্ধ
ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

তুচ্ছ

"তুমি জানো ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

গল্পটা অনেক দূর এগিয়েছিল।—

পিতলের পিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের আলোটা জ্বলছে অনেকক্ষণ থেকে। শিখাটা নিস্তেজ, তেলের অভাবে সল্‌তেটা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত আলোটা যেন পৌঁছচ্ছে না।

বাইরে শ্রাবণের বর্ষা নেমেছে। পুরনো ঘরের কড়ি-কাঠের ফাটল বেয়ে জল চুঁইয়ে নেমে এসেছে ঘরের মেঝেতে। কিন্তু সেই আধমরা আলোটাকে ঘিরে যে ছয় সাতটি অর্বাচীন ছেলেমেয়ে ব'সে রয়েছে,—ঘনবর্ষার দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই; তারা গল্পের আসরে তন্ময় হয়ে রয়েছে।

......আওয়াগড় রাজ্য নাকি সাতটি নদীর পার। কত পাহাড় আর কত তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে যেতে-যেতে তবে নাকি মস্ত রাজবাড়ী। রাজার নাকি দুই ছেলে; যুবরাজ মহেন্দ্র আর যোগেন্দ্র। যুবরাজ মহেন্দ্র সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে হাতীর পিঠে চ'ড়ে বেরিয়েছিলেন মৃগয়ায়। মাথায় তাঁর রাজছত্র। ঘোড়াশালা থেকে গিয়েছিল ঘোড়া, রুপার জড়োয়া সাজ প'রে যুবরাজের অভিযানে। অস্ত্র, লস্কর, খাদ্য, সজ্জা,—সব মিলিয়ে সে এক বিরাট শোভাযাত্রা।

দেশ দেশান্তর পেরিয়ে চলেছে সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা। অবশেষে যুবরাজ মহেন্দ্রর তাঁবু পড়লো কোন্ এক জনপদে কি এক নদীর ধারে। কাছেই শিবের মন্দির,—সেই মন্দিরে সেদিন অক্ষয়তৃতীয়ার মেলা। মস্ত সমারোহ সেই মেলায়।

গল্পটা অনেকদূর এগিয়েছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলুম, আওয়াগড় কোথায় [illegible]

থাম্—একটা ধমক এলো আমার মুখের [illegible]য়,—[illegible]লুম না সাতটা নদীর পার?

কি-কি নদী?

গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরী! নৌকায় গেলে লাগে ছ'মাস, গরুর গাড়ীতে এক বছর, হেঁটে গেলে বাঘের পেটে যায়! যাবি তুই হেঁটে?

চুপ ক'রে গেলুম। একজন তাকালো সভয়ে পিছন দিকে। ঘরের দেওয়াল থেকে বালি ধ্বসেছে, কড়িকাঠ থেকে উইপোকার দড়ি নেমেছে নীচের দিকে, ইঁদুর ছুটছে এগর্ত থেকে ওগর্তয়, আরসোলা চ'রে বেড়াচ্ছে ঘরময়। আলোটা আরো মলিন হয়ে এসেছে।

অক্ষয়তৃতীয়ার মেলায় শিবের পুজো দিতে গিয়েছিল কুমারী যোগমায়া! অমন সুন্দরী মেয়ে ছিল না আর ভূ-ভারতে। মেঘের মতন কালো চুল, আর খগরাজ পায় লাজ নাসিকার কাছে!

যোগমায়া কে?—আমার চোখে কৌতূহল জ্বলে উঠলো।

রাজকন্যে! আবার কে?—আরেকজন আমাকে ধমকালো।

না রে না—যোগমায়া হোলো এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে। সদাগরী অপিসে চাকরি করতো তার বাপ। সেই যোগমায়াকে যুবরাজ মহেন্দ্র দেখে একেবারে মুগ্ধ। তিনি গিয়ে সেই গরীব ব্রাহ্মণকে বললেন, ঠাকুর, আমি তোমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবো। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করলেন যুবরাজকে। দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর?

অসীম কৌতূহল আর উদ্বেগ আমাদের মুখে চোখে। কিন্তু ঘরের বাইরে দালানে শুয়েছিলেন দিদিমা,—তিনি অন্ধকারের থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কাতরোক্তি ক'রে বললেন, তারপর! তারপর থেকেই ত' সর্বনাশ, বাবা! ওই যে বলে, 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—তাই!

রাজকুমার মহেন্দ্র পরম সমাদরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইলেন নিজের রাজ্যে, কিন্তু যোগমায়া যেতে রাজি নন্। তিনি ভয়ে আর ভাবনায় মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে রইলেন। কত সাধ্য সাধনা, কত কাকুতি মিনতি,—কিন্তু মেয়ের কী কান্না! রাজবাড়ী নাকি ভয়ঙ্কর, ঢাল-তরোয়াল নিয়ে থাকে সেখানকার পাহারা, রাজবাড়ীতে গিয়ে একবার ঢুকলে আর কোনোদিন বাপের বাড়ী আসা যায় না; কান্নাকাটি করলে নাকি তারা মাটির তলায় পুঁতে ফেলে।

যোগমায়া প্রাণভয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। যুবরাজ মহেন্দ্র মনের

দুঃখে মৃগয়া ত্যাগ করলেন। বিদায় দিলেন তাঁর লোক লস্করকে। একা একা [illegible]তে লাগলেন এখানে ওখানে। কখনো কখনো সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে [illegible]ন্, যোগমায়াকে সাধ্য সাধনা করেন,—আবার বা এক সময়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান্। যোগমায়া বাপের বাড়ী ছেড়ে এক পাও নড়েন না। বড় বেশী তাঁর প্রাণভয়।

বারো বছর পর্যন্ত যুবরাজ মহেন্দ্র যোগমায়াকে নিয়ে যাবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই যুবরাজ যোগেন্দ্র রাজা হন্, কিন্তু রাজবাড়ীর চক্রান্তে তাঁকে কি এক ওষুধ খাইয়ে পাগল ক'রে দেওয়া হয়; সেই পাগল একদিন এক লাঠির ডগায় একটি পুঁটলী বেঁধে আর মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান্। ছোট যুবরাজ মহেন্দ্র অনেক চেষ্টা ক'রেও যোগমায়াকে না আনতে পেরে অবশেষে বিবাগী হন্। তাঁরও দিন কাটে পথে পথে।

আঁক্!—চেঁচিয়ে ওঠে ছোট বোন। সঙ্গে সঙ্গে একটা হুড়োহুড়ি, সেই গোলমালে পিলসুজ সুদ্ধ প্রদীপটা ছিট্‌কে যায় কোথায়! ব্যাপারটা আর কিছু নয়, অন্ধকারে একটা আরসোলা উ'ড়ে এসে তা'র নাকে বসেছিল!

গল্পটা সেদিন শেষ হয়নি সেই শ্রাবণের রাত্রে। কিন্তু গল্পটার ভয়াবহ বিয়োগান্ত সম্ভাবনার চিন্তা ছিল সকলের মনে। পাড়ার কোন্ মেয়ে শ্বশুর-ঘর করতে যায় না,—মনে প'ড়ে যেতো যোগমায়াকে; কোন্ স্বামী কোন্ মনের দুঃখে কোথায় চ'লে গেল,—অমনি মনে প'ড়ে যেতো রাজ্যহারা পরিব্রাজক যুবরাজ মহেন্দ্রকে। যুবরাজ আমাদের সকলের প্রিয়পাত্র।

হঠাৎ কোনো কোনোদিন মনের ভুলে দিদিমা নিশ্বাস ফেলে বলতেন, হ্যাঁরে, অনেকদিন ন'জামাইকে দেখিনি, তোরা খোঁজ পেলি কিছু? কোথায় আছে জানিস?

জবাব দেবার মতন কোনো মানুষকে কাছাকাছি পাওয়া যেতো না। সদ্য স্নান সেরে ন'মাসিমা তাঁর চুলের রাশির ডগায় গেরো দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেন স্থির প্রতিমূর্তি'র মতন। দিদিমা মুখ তুলে বলতেন, অনেকদিন খবর নেই, বেঁচে আছে ত?

তুচ্ছ

স্বামীর উল্লেখমাত্র ন'মাসিমার প্রসন্ন সুন্দর মুখে রক্তের আভাস দেখা দিত। শান্তকণ্ঠে বলতেন, ছেলেমেয়ে তিনটের জ্ঞান হয়েছে, এখন ওসব কথা তোলো কেন, মা?

দিদিমার মুখে আর কোনো কথা আসে না, মাসিমা তেমনি দৃপ্তভঙ্গীতে ফিরে চ'লে যান্। দিদিমার কাঁধের পাশে আমি পোষা বিড়ালটির মতো ব'সে থাকতুম।

কিছু কি শোকের ছায়া ছিল আমার মনে? কিছু কি বিষণ্ণতা? অপরিণত মানস চেতনার মধ্যে যেন উপলব্ধি করতে পারতুম, নরনারীর ভিতরকার কিছু একটা রহস্যজনক সম্পর্ক! কোথাও একটা অন্যায় ঘটছে, কিছু একটা ভুল থেকে যাচ্ছে,—সেটা যেন নৈরাশ্যে, বেদনায়, যন্ত্রণায় আর চিত্তগ্লানিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

মামা একদিন এসে বললেন, বেঁচে আছে গো, বেঁচে আছে,—তোমার মেয়েকে সিঁদুর পরতে বলো কপালে!

দিদিমা ভুরু কুঁচকে বললেন, সুখবরটা দিয়ে বুঝি তুই গাঁজার পয়সা চাইতে এলি?

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, গাঁজার দাম ত' পাঁচ পয়সা, খবরটা যে লাখো টাকার? শুনে এলুম তোমার ভাসুরপো ভোলা ভটচার্যির মুখে। জোড়াসাঁকোয় আপিংয়ের দোকানের সামনে তোমার জামাইকে সে দেখতে পেয়েছে!—আজ আমার দু'টাকা চাই।

দু'টাকা!—দিদিমা ফণা তুলে উঠলেন, মাগের ভাত কাপড় আমি যোগাবো, আর তোর চাই হাতখরচ? দুটাকা রোজগার করেছিস কখনো? কখনো দেখেছিস চোখে একসঙ্গে?

বারুদখানায় আগুন লাগলো। মামা চীৎকার ক'রে উঠলেন, তোর টাকা? ফল্‌না ভট্‌চার্যির টাকায় তোর গুষ্টিকে খাওয়াসনে? রমেশ মিত্তিরকে দিয়ে জাল উইল ক'রে আমাকে পথে বসাসনি? ঘুঘু চরাবো ভিটেয় ব'লে দিচ্ছি! পেয়াদা ছোটাবো! বেড়াল কাঁদাবো! এই চললুম হাইকোর্টে!

হাইকোর্টে যাবার জন্য মামা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। পরে জানা গেল, আনা

তারেপ্রাপ্সা পেয়ে তিনি আপাতত মামলা-মোকদ্দমা স্থগিত রাখলেন। হাইকোর্ট অনেকদূর।

আমার ডাক পড়তো মামার ঘরে। গিয়ে দাঁড়াতুম দরজার এক কোণে ভয়ে ভয়ে। চণ্ডালের গল্প শুনেছিলুম মিত্তিরদের বরদা-ঝির কাছে। মামার মুখশ্রী দেখলে সেই জুলু চণ্ডালকে মনে প'ড়ে যেতো। ঘড়ির কাজ করতে করতে এক সময়ে মুখ তুলে মামা বললেন, মাগিকে ডেকে দে ত'?

কোন্ মাগিকে?

মামা মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, গুয়োটা! বলে আবার কোন্ মাগি! বাড়ীতে এক পাল মাগির মধ্যে মামী কোন্টা? ডাক্ শিগগির! ফের যদি আমার বেড়ালকে মারবি, কি ডালিমগাছের ফুল ছিঁড়বি,—ত' বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো!

মামীকে ডেকে আনলুম। মামা বললেন, একটা পয়সা দাও ওই ছোঁড়ার হাতে—তামাক আনবে!

পয়সা!—মামী ডুকরে উঠলেন, আমার জন্যে কি করেছ তুমি শুনি? এক জোড়া ঢাকাই শাঁখা কিনে দিয়েছিলে, সরলা তখন পেটে! তোমার জন্যে আমার মাথা ধরার ব্যামো, চুলে তেল পড়ে না দুবছর,—যেমন খাইপরি তেমন গতরে খাটি,—হাত পা প'চে গেল হাজায়! কোন্ দিকে তোমার চোখ আছে বলো দিকি?

আমি দাঁড়িয়ে। মামা তাঁর ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়িতে হাত বুলিয়ে ক্রুর চক্ষে মামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ! পয়সা দিবিনে, কেমন? আমার পকেট মারে ওপাড়ার ছোট বৌ এসে—না? বলি ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে নীচের তলায় কোথায় যাস, শুনি?

আ মর, মুখে আগুন! পঞ্চাশ বছর বয়স হ'তে চললো, কথা শোনো—! বলতে বলতে মামী হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেলেন।

মামা বললেন, ওরে গুয়োটা, বিনি পয়সায় তামাক আনতে পারবিনে?

বললুম, পারবো!

তবে নিয়ে আয় দেখি কেমন বাপের বেটা?

ছুটে চ'লে গেলুম তেতলায় দিদিমার ঠাকুর ঘরে। ঘরের এক-পাল্লা দরজায়

তালা বন্ধ। একথা জানা ছিল মিত্তিরদের ঝি বরদা এসে সংক্রান্তি[illegible] দিয়ে গেছে পাঁচ পয়সা। এই বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে [illegible] গেছে পয়সা ক'টা।

বাঁহাতে দরজার পাল্লাটা ঠেলে ধ'রে কচি ডান হাতখানা ভিতরে সেঁধিয়ে দিতেই হাতে উঠে এলো আনিটা। সমস্ত শরীর কাঁপছে ঠকঠক ক'রে। স[illegible] অন্তর কাঁপছে থরথরিয়ে।

তামাক আনলুম লালার দোকান থেকে। মামা উল্লসিত হয়ে বললেন আমার ভাগ্নে একথা ভুলবিনে কোনোদিন। তোর নামে আমি সর্বস্ব উইল্ ক'রে যাবো! যা, তামাক সেজে আন্।

তামাক সেজে আনলুম হুঁকোয়। মামা সন্দিগ্ধ চক্ষে বললেন, এত তাড়াতাড়ি যে ধরালি? টেনেছিস বুঝি?

কই, না?

দেখি মুখে গন্ধ?

মামা মুখের কাছে মুখ আনতেই চেঁচিয়ে উঠলুম, উঃ—কী বিচ্ছিরি তামাকের গন্ধ আপনার মুখে! বমি আসে...ও-য়-য়-ক্!—বলতে বলতে স'রে পড়লুম।

কিন্তু চুরি ধরা প'ড়ে যায়। কে নিলে ঠাকুরের পয়সা? ভয়ে আমার গা কেমন করে! তামাক কিনেছি, কিনে এনেছি লাট্টু আর লেত্তি! সুতরাং এদিক ওদিক খোঁজ করতে লাগলুম। বেলতলার ছাদে ভিজে শাড়ীর আঁচলে কা'র যেন একটা পয়সা বাঁধা ছিল—সেটা সংগ্রহ করলুম সন্ধ্যায়। কিন্তু শাড়ীখানা হোলো মামীর। রেড়ির তেল আনবার সময় সেটার খোঁজ পড়লো। জানি বহুলোকের খরদৃষ্টি আমার ওপর। অতএব তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে দিদিমার কাঠের বাক্সয় আমার হাত পড়লো। সেখান থেকে দু'পয়সা হাতড়ে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে আসছি,—মামী তখন চীৎকার করছেন কাপড় দেখিয়ে। মা ছুটে এলেন, এলেন ন' মাসিমা। আলো নেই কোথাও, অন্ধকারে হাত চালাবার সুযোগ মিললো। একটা পয়সা ছুড়ে দিলুম শাড়ীখানার মধ্যে। মায়ের কথায় মামী সেই শাড়ী ঝাড়া দিতেই ঠন্ ক'রে পড়লো তাঁর হারানো পয়সাটা!

তুচ্ছ

দিদিমা চীৎকার ক'রে উঠলেন, আবাগি, তোর এত বড় আস্পদ্দা, চুরির দায়ে বাছাদের সন্দেহ! দুটি চক্ষের মাথা খা।

মামা ওঘরে লাঠি ঠুকে বললেন, দাঁড়াও যাচ্ছি!

কিছুক্ষণ পরে একাদশীর বাতাসা কেনবার জন্য দিদিমার বাক্স খুলে দেখা গেল, দুটি পয়সাই উধাও! ব্যাপারটা দেখতে দেখতে জটিল হয়ে উঠছে। আমি যেন প্রত্যেকটা ঘটনায় দ্রুত জড়িয়ে পড়ছিলুম। মনে পড়ে গেল ছোট বোনের বিস্কুটের বাক্সয় এক আধটা পয়সা জমতো। আপাতত সেটার থেকে অতি সঙ্গোপনে কিছু নিয়ে তেতলায় গিয়ে ঠাকুরের দেনা শোধ ক'রে এলুম। মামীর দেনা আগেই শোধ হয়েছে। বড়দাদা হাওয়াগাড়ী সিগারেট খেতে শিখেছিল—তা'র পকেট থেকে কিছু নিয়ে দিদিমার বাক্সয় রাখা গেল। এবার বাকি ছোট বোন।

কিন্তু বাড়ীতে তখন ভীষণ হৈ চৈ উঠেছে। মা তেড়ে এলেন আমার দিকে, আমি গিয়ে আশ্রয় নিলুম মামার ঘরে। মামা বীর্যবান লোক। তিনি লাঠি বাগিয়ে বললেন, তোকে বাঁচাবো আমি, নৈলে এই জান্ দেবো! আমার ভাগ্নে, একথা ওদের জানিয়ে যাবো। খবরদার!

সমগ্র ঘটনাবলী আমার নৈতিক সাধুতাকে কলঙ্কিত করতে উদ্যত বলেই আমি কাঁদছিলুম। মামা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় কি তোর, আমি আছি! দেশলাইটে বার কর ত' পকেট থেকে, আলোটা আগে জ্বালি!

মামা ঘরে আলো জ্বাললেন। তারপর আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যা, তোকে ঝোড়োর দোকানের সন্দেশ খাইয়ে দেবো। যা, কোনো ভয় নেই!

চারিদিকেই যখন চুরি হচ্ছে তখন ছোট বোন তার বিস্কুটের বাক্সটা খুলে তহবিল মেলাতে গিয়ে দেখে সর্বনাশ। সে হাউ মাউ করে উঠলো। এই গোপন তহবিলের সংবাদ একমাত্র আমিই জানতুম,—সুতরাং তৎক্ষণাৎ সবাই মিলে আমাকেই চেপে ধরলো।

আমার ভিতরকার দুঃসাহসী তখন জেগে উঠে বললে, কখ্খনো না, মিথ্যে কথা! আমাকে জব্দ করার ফন্দি! খুলুক টিনের বাক্স সকলের সামনে, দেখুক সবাই!

বিস্কুটের বাক্স টেনে সকলের মাঝখানে আমিই বসে গেলুম। আমার হাতে

যাদু ছিল। পুঁতির কৌটো খুলতেই বেরিয়ে পড়লো একটা আনি। তাই দেখে ছোট বোন ফস করে বললে, আমার যে চারটে তামার পয়সা ছিল?

থাম্ পোড়ারমুখি, চুপ করে যা।—মা ধমক দিলেন।

রাত্রে বড়দাদা বললেন, আমার পকেটে পয়সা ছিল, কোথায় গেল রে!

বললুম, তোমার পকেটে ত' সিগ্রেট্ থাকে, পয়সা থাকে কোথায়?

মা বললেন, কী বললি? কি থাকে?

বড়দাদা বললেন, ও দিন দিন ভারি বেড়ে উঠছে, তা জানো মা? পুরানো পড়া দিয়েছিলুম, হয়েছে?

বললুম, হয়েছে!

তবে মুখস্থ বল্।

মা বললেন, আচ্ছা আজ থাক্, কাল সকালে বলবে!

রাত্রে পাশে শুয়ে মা চুপি চুপি বললেন, ছি আর কখনো কারো পয়সায় হাত দিয়ো না, বুঝলে? সব আমি বুঝতে পেরেছি।

আমি তখন অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলুম বৈ কি।

মামী ধরা পড়লেন পরের দিন প্রাতে। মামার পকেটে ছিল এক আনা, সেটা অন্তর্হিত হয়েছে কোন্ মন্ত্রে!

মামীর চীৎকার—পকেট থেকে দেশলাই বা'র করেছিল কে? আমি?

ফের ছোবল মার্ছিস?—মামা হাঁক দিলেন।

মুখনাড়া দিয়ে মামী বললেন, মামা-ভাগ্নে গলাগলি হয়নি কাল সন্ধ্যাবেলা?

খবরদার! মুখ সামলে কথা বলিস। আমার ভাগ্নে মনে রাখিস।—মামা আবার চীৎকার করলেন।

দিদিমা এদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার নাতির নামে যে লাগায়, সে চোখের মাথা খাক্।

কিন্তু মামীর অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই প্রখর ছিল!

সদর দরজায় মাঝে মাঝে ন'মাসিমার স্বামী এসে ডাক দিতেন। ভিতরে তিনি কোনদিনই আসেননি। বাইরের রকে ব'সে ডাকাডাকি করতেন, কেউ কেউ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতো। হয়ত অনেক ডাকাডাকিতে বিরক্ত হয়ে এক-

সময়ে ন'মাসিমা গিয়ে দূরত্ব বাঁচিয়ে দাঁড়াতেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বক্তব্য কিছু থাকতো না। সেই নীরবতা যেন কণ্ঠরোধ করতো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজের সন্তানগুলির দিকে একবার প্রসন্ন স্নেহে তাকিয়ে এক সময় তিনি উঠে প'ড়ে বলতেন, যাই—

ছেঁড়া কোট গায়ে, সে কোটে বোতাম নেই। ছেঁড়া কাপড়ে কোথাও কোথাও গেরো বাঁধা; জামার পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে চটা-ওঠা কলাইয়ের একটি গেলাসের মাথা। পায়ের চটি জোড়াটা তথৈবচ। কোথায় তিনি যাবেন, কোথায় থাকেন, কেমন ক'রে তাঁর দিন গুজরাণ হয়,—এসব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু কেন এই আসা-যাওয়া? কীসের টান? কোন্ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগে? কোন্ কথাটা তাঁর আজো বলা হয়নি?

ন'মাসিমা আগেই ভিতরে চ'লে গিয়েছেন দৃষ্টির আড়ালে। তাঁর স্বামী অবসন্ন ক্লান্ত পা টেনে-টেনে চ'লে যাবার আগে একটি মেয়েকে অনুরোধ করলেন, বিশুকে একবার ডাকো ত' মা?

একটু পরে ভিতর থেকে মা এসে দাঁড়ালেন। দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক। এক সময় ন' মাসিমার স্বামী বললেন, তোমার বোন কোনো কথা না ব'লে চ'লে গেল। তোমার চোখে জল কেন, বিশু?

মা বললেন, আপনি মানুষ হ'লে আর চোখের জল পড়তো না!

ও, তুমিও বুঝি ওই দলে?—সহাস্যে তিনি বললেন, যাক গে।—এইটিই বুঝি তোমার সেই কোলের ছেলে? একেই ত' তিন মাসেরটি রেখে রাজেন মারা গেছে! শোনো বিশু, খড়দার গঙ্গার ধারে একটু থাকবার জায়গা পেয়েছি। তোমার বোনকে বুঝিয়ে বলো, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে চলুক আমার সঙ্গে।

মা বললেন, ওরা কি গঙ্গাজল খেয়ে থাকবে?

কেন, আমি ওখানে এক মসলার দোকানে কাজ পাবো, তাতেই যা হোক ক'রে চ'লে যাবে! গঙ্গার ধারে বেশ থাকবো।

ভিতর থেকে সহসা ন' মাসিমার গলার আওয়াজ এলো, বিশু, ভেতরে চ'লে এসো, ওখানে তোমার থাকার দরকার নেই।

মা বললেন, আমার কথা শুনবে কেন, ওরা কেউ আপনাকে বিশ্বাস করে না,—যেতেও চায় না!

তবে আর কি করবো! যাই!—হ্যাঁ, আর এক কথা। তোমার মাসোহারার জন্যে আমি খুবই হাঁটাহাঁটি করছি। বোধ হয় হয়ে যাবে। মা বললেন, হ'লে বাঁচি, দিন আর চলে না!

ভিতর থেকে আবার ডাক এলো, বিশু?

মা তাড়াতাড়ি ভিতরে চ'লে গেলেন।—

হঠাৎ একদিন দু'জন পুলিশের লোক এসে সদর দরজায় দাঁড়ালো। তাদের গলার আওয়াজ কর্কশ। কিন্তু পুলিশের নামে লোকে ভয় পায়, পাড়ায় পাড়ায় আতঙ্ক দেখা দেয়, লোকের বাড়ীর জানলা দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ত্রাহি মধুসূদন।

এটা কি নোগেনবাবুর বাড়ী আছে? হামরা আসিয়েছি জোড়াবাগান পুলিশ থেকে।

ব্যাঘ্রের আবির্ভাবে হরিণের দল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তেতলার ছাদে গিয়ে ঠাকুর ঘরের পাশে আশ্রয় নিয়েছি আমরা। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে জানা গেল, ন' মাসিমার স্বামী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ। খবরটা শোনামাত্র বাড়ীময় একটা ধিক্কার প'ড়ে গেল।

মামা বললেন, আমি পারবো না। আমার বিরুদ্ধে অনেক থানায় ডায়েরী লেখা আছে, আমাকে দেবে না জামিনে দাঁড়াতে,—আর কাউকে পাঠাও।

অবশেষে বড়দাদার জামিনে ন'মাসিমার স্বামী খালাস হলেন। কিন্তু তারপর? তারপর দিন তিনেকের মধ্যেই আসামী নিরুদ্দেশ! ফলে বড়দাদাকে নিয়ে পুলিশে টানাটানি। বাড়ীতে হাঁড়ি চড়া বন্ধ। কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানৎ। কাশীপুরের দিকে সর্বমঙ্গলার কাছে পুজো। সত্যপীরের সিন্নি। ঠাকুরঘরে শান্তিস্বস্ত্যয়ন, গ্রহপুজো। কিন্তু সকলের সম্মিলিত প্রার্থনার জোরে মাসখানেক পরে একদিন ন'মাসিমার স্বামী নিজের থেকে পুলিশে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। চুরির অভিযোগ সত্য নয়,—তাঁর নাকি জীবনধারণের উপযুক্ত সুপ্রকট কোন ব্যবস্থা নেই! আইনের চক্ষে সেটি দণ্ডনীয়।

তাঁর ছয়মাসের জেল্ হোলো! বড়দাদার বিপদ কাটলো। কিন্তু ন'মাসিমার শান্ত অবিচলিত চিত্তের কোনো বিকার আমরা দেখিনি। ন'মাসিমার গম্ভীর ব্যক্তিত্ব পাষাণ-প্রতিমাকে স্মরণ করিয়ে দিত।

দিদিমা বলতেন, দুষ্টু গরুর চেনে শূন্য গোয়াল ভালো। খবরদার,—আমার বাড়ীর দরজায় যেন সে পা দেয় না। অমন জামাইয়ের মুখ দেখতে চাইনে। এমুখো হ'লে পাড়ার লোক ডাকবো।

মামা বলেন, তবে জামাইয়ের গুষ্টিকে বাড়ীতে বেআইনী ধ'রে রেখেছ কেন?

তুই আমাকে আইন দেখাসনে খবরদার!—দিদিমা হেঁকে উঠলেন।

মামা বললেন, বেআইনী আটক রাখলে দুবচ্ছর জেল্। হাকিম অমনি এক কথায় খচাখচ! ঘুঘু দেখেছ, আর ফাঁদ দেখোনি! মায়ে-ঝিয়ে একদড়িতে বাঁধা পড়বে!

দূর হ, দূর হ, নিপাত যা......

তবে আমিও চললুম পুলিশে খবর দিতে। মনে রেখো হাতের ঢিল একবার ছুড়লে আর ফিরবে না!

মামা অবশ্য কোথাও যাননি, ঢিলও ছোড়েন নি। ভয় দেখিয়ে সেদিন তিনি আফিংয়ের পয়সা আদায় করেছিলেন।

সমগ্র ব্যাপারটা ভুলে যেতে প্রায় বছর খানেক সময় লেগেছিল। এমন সময় একদিন নীচের তলায় হৈ চৈ উঠলো, ন' মাসিমার স্বামী এসে দাঁড়িয়েছেন সদর দরজায়। ওঁর সঙ্গে পুলিশের ছোঁয়াচ আছে, সুতরাং আতঙ্কে সবাই থরহরি। বাড়ী নিশুতি, কেউ যেন নেই,—একেবারে শ্মশান।

সদর দরজায় গুমগুম শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। মেঝের উপরে কান পেতে সেই মৃদু গম্ভীর আওয়াজ শুনছি। পুরুষ-হৃদয়ের সেই মর্মান্তিক ডাক কোনো পাষাণীর মনকে বিচলিত করছে না, কিন্তু এক নাবালকের সমগ্র প্রাণসত্তাকে মথিত ক'রে সেদিন [illegible] অশ্রু এনেছিল। কেন সে অশ্রু? কী অর্থ তা'র? চিরকালের বিচ্ছেদ বেদনা সেদিন কি তাকে অভিভূত করেছিল? মনুষ্যত্ব অপমানিত হচ্ছে—সেদিন কি অনুভব করেছিলুম?

দিদিমা শান্ত মৃদু কণ্ঠে মাকে ডাকলেন। বললেন, তুই [illegible] হয় একবার যা মা, কি বলে শুনে আয়। এ জ্বালা আর সইতে পারিনে। আমার মরণ হলেই মুক্তি পাই।

চোখের জল মুছে মা গেলেন। আমি গেলুম পিছনে পিছনে। মা গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। জেল ফেরৎ ব্যক্তিকে জীবনে প্রথম দেখলুম। চেহারাটা খর্বকায়, কিন্তু সৌম্যদর্শন। এমন কি সত্যকার সুপুরুষ বলা চলে। দৃষ্টি শান্ত, অমায়িক। মাথায় টাক, দাড়ি-গোঁফ নেই। অত রৌদ্রে পথ হেঁটে এসে মুখখানা রাঙা। দরজার সামনে কুলুঙ্গিতে ব'সে জোরে-জোরে নিশ্বাস টানছেন।

মুখ তুলে তিনি মিষ্টকণ্ঠে বললেন, তোমাদের দেখতে এলুম অনেকদিন পর, ছেলেমেয়েরা কই?

মা বললেন, তা'রা ত' নেই এখানে, কাশী গেছে।

কাশী!

হ্যাঁ, মেজদি এসে নিয়ে গেছেন সবাইকে। তা'রা সেখানেই থাকবে।

রাঙা মুখে নৈরাশ্য ফোটে। মুখ তুলে তিনি তাকান মার দিকে। আশা, আশ্বাস, আনন্দ, বেদনা,—সেই চক্ষে কোনো কিছু কি দেখতে পেয়েছিলুম? কিছু কি ছিল কথা? কিছু ব্যাকুলতা?

কিন্তু তিনি আর বসতে চাইলেন না। হাঁপানীর টান তাঁকে অস্থির ক'রে তুলছিল। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, দেখি যদি কাশী যেতে পারি, গেলে দেখা হবে।

হঠাৎ দিদিমা বেরিয়ে এলেন আড়াল থেকে। চাপা রুষ্ট কণ্ঠে তিনি বললেন, তোমার আর সেখানে গিয়ে কাজ নেই, মহেন্দ্র—এবার থেকে ওদের তুমি মুক্তি দাও!

নতমুখে শান্তকণ্ঠে জবাব এলো, কিন্[illegible]মার ছেলে মেয়ে? আমার স্ত্রী?

দিদিমা এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, [illegible]য়ের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না। আর যোগমায়ার কথা যদি বলো, সে তোমার মুখও দেখতে চায় না! বিশু, ভেতরে এসো।

মাকে নিয়ে দিদিমা ভিতরে গেলেন। রুদ্ধশ্বাস আর রুদ্ধকণ্ঠে এলুম মায়ের পিছনে-পিছনে। উত্তাল প্রশ্নটা আমার অধীরকণ্ঠে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো,—মা? কোন্ মহেন্দ্র?

মা বললেন, হ্যাঁরে, সেটা গল্পটা! ওই হোলো সেই আওয়াগড়ের কুমার মহেন্দ্র চক্কোত্তি! তোর ন'মাসির নাম যোগমায়া,—জানিসনে?

শ্রাবণের রাত্রে যে-রূপকথা শেষ হয়নি, এই চৈত্রের দুপুরে এই কি তা'র পরিণাম? সহসা সেখান থেকে ঠিক্‌রে বাইরে এলুম। ততক্ষণে যুবরাজ মহেন্দ্র চ'লে গেছে অনেকদূর। ক্ষিরি নাপতিনীর ঘর ছাড়িয়ে, চম্পটিদের বাড়ী পেরিয়ে অর্জুনের দোকান বাঁ-হাতি রেখে এগিয়ে গেছে সে। ছুটতে ছুটতে চললুম তাঁ'র পিছু পিছু। যোগাসনে ধ্যানস্থ যিনি দেবাদিদেব, ভিন্নরূপে তিনিই হলেন ভোলানাথ। তিনি সর্বহারা, নিরাশ্রয়। পরণে ছিন্নবাস, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। তিনি চিরকালের পথিক, চির পরিব্রাজক। আমার স্বপ্নলোকের রাজভিখারীকে দেখতে চাই!

আমার আর্তকণ্ঠের আবেগ সামলাতে পারিনি সেদিন। ছুটতে ছুটতে গিয়ে পিছন থেকে ডাকলুম, মেসোমশাই? মেসোমশাই!

রৌদ্রদগ্ধ পথের উপরেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে, বললেন, কি রে? কেন এলি এত রোদে? কি বলছিস?

আপনিই কি যুবরাজ মহেন্দ্র? আওয়াগড়ের রাজা?

লোকে বলতো বটে। কিন্তু সে বেঁচে নেই!

আবার সেই প্রসন্ন সুন্দর হাসি! আমি পায়ের ধুলো নিলুম। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোর থেকে একটি টাকা বা'র ক'রে বললুম, মা আপনাকে নিতে বললেন।

টাকাটা তিনি নিঃসঙ্কোচে হাত পেতে নিলেন। তারপর বললেন, তোর মাকে বলিস, আসছে মাস থেকেই তা'র পাঁচটাকা মাসোহারা ব্যবস্থা হয়েছে!—সবাইকে আশীর্বাদ ক'রে যাই! তোরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিস।

বছর তিনেক পেরিয়ে গেছে তারপর। পুঁটিবাগানের প্রান্তে এক গলিতে দুখানা ঘরে আমরা ভাড়া থাকি। সেদিন দশহরার যোগ। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে

ক্লান্ত হয়ে মধ্যাহ্নকালে মা ফিরলেন গঙ্গার ঘাট থেকে। গঙ্গাজলের ফোঁটার মতো মায়ের চোখ বেয়ে জল নামছিল।

মহেন্দ্র মেসোমশাই মারা গেছেন। তাঁর অন্তিম ঘনিয়ে আসে কিছুদিন থেকে। কলকাতার এক চায়ের দোকানের বেঞ্চে ব'সেই তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর ছেঁড়া জামার পকেটে ছিল কাগজপত্র, তা'র থেকে জানা যায় তিনি রাজা উপাধিধারী এক মস্ত জমিদার। ভিন্ন পকেটে ছিল ন্যাকড়ায় বাঁধা একটি টাকা।

*

কলকাতার খোয়া বাঁধানো রাস্তায় ঘড়ঘড় ক'রে লোহা বাঁধানো চাকায় ঘোড়ার গাড়ী চ'লে যেতো। আমাদের গলি পেরিয়ে যেতো সেই গাড়ী সশব্দে—যেতো অনেক দূরে—মানিকতলার গির্জা পেরিয়ে, হেদোর মোড় ছাড়িয়ে। আমি চেয়ে থাকতুম চারখানা ঘূর্ণ্যমান চাকার দিকে, ঘোড়ার পায়ের নীচে। সোনার বেনেরা চড়তো ল্যাণ্ডো, কিংবা ফীটন্‌,—তাদের ঘোড়াগুলি ভালো। তাদের পরণে ফরাসডাঙ্গা অথবা শিমলার কোঁচানো ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবী, পায়ে কালো রংয়ের পাম-সু,—হাতের আঙ্গুলে অনেকগুলি ঝলমলে পাথর বসানো আংটি। গায়ের রং তাদের ফর্সা, চোখগুলি একটু কটা। নিজেরা চালিয়ে যেতো গাড়ী—পিছনে থাকতো সহিস। কালো রংয়ের পাল্‌কী গাড়ীতে যেতো অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, তাদের ছিল আবরু। পেতলের আংটা টানা গাড়ীর দরজা,—ওরই মধ্যে ইঞ্চিখানেক ফাঁক থাকতো বায়ু চলাচলের জন্য। ওর মধ্যেই আমি দেখে নিতুম হীরের নাকছাবির হঠাৎ-ঝলকানি, কিংবা চুড়িপরা হাতের দোলা,—এবং তা'র পাশে হয়ত বা একজোড়া অসুরের মতো কালো গোঁফ। বড়রাস্তায় ট্রাম যায় ঘণ্টা বাজিয়ে—তাদের রং হোলো হল্‌দে আর খয়েরি মেলানো। একখানা ট্রামে অনেকগুলি দরজা, ভিতরে এধার থেকে ওধার অবধি ইস্কুলের মতন বেঞ্চি পাতা,—সকাল ন'টা দশটায় কিছু কিছু লোক চলাচল করে,—তারপর সারাদিন ট্রামগাড়ীতে তেমন আর লোক সমাগম নেই।

ভাড়া তিনপয়সা আর পাঁচ পয়সা—ট্রান্সফার হোলো চার পয়সা আর ছ'পয়সা। এছাড়া যানবাহনের মধ্যে ছিল পাল্কী,—তা'র আড়ৎ ছিল গোয়াবাগানে।

নতুন বউরা আসতো পাল্কীতে। উড়ে' বেহারারা হল্‌দে রংয়ের কাপড় আর নতুন গামছায় সাজগোজ ক'রে চারজনে নিয়ে যেতো পাল্কী কাঁধে তুলে। সুবিধা এই, অন্দরমহল থেকে সওয়ারী নিয়ে আবার অন্দরমহলে গিয়েই পেঁাছে দেওয়া। ভাড়া চার আনা, কিংবা চারজনে আট আনা। গিন্নীরা পাল্কী চ'ড়ে যেতেন এপাড়া থেকে ওপাড়ায়। বড়লোকের বাড়ীর মেয়েরা পাল্কী চ'ড়ে যেতেন গঙ্গাস্নানে,—একেবারে জলের উপরে গিয়ে পাল্কী নামাতো। সে আবরুর বিচিত্র দৃশ্য। জলের উপরে নামবে মেয়েরা,—চারধারে কাপড়ের পর্দা ধ'রে দাঁড়াতো চারজন। তারা নাকি অসূর্য্যম্পশ্যা,—সূর্যের সঙ্গে তাদের দেখাশোনা নেই। সেকালের আবরু হোলো আভিজাত্যের চিহ্ন, একালের আবরু হোলো পরিহাসের বস্তু। পাল্কী কাঁধে নিয়ে বেহারারা চ'লে যেতো দূর থেকে দূরে। তাদের সম্মিলিত বোল্‌ শুনতে শুনতে মনটা তাদেরই সঙ্গে উধাও হয়ে যেতো। শরৎকালের আকাশ পূজার গন্ধে ভরো-ভরো, সোনা-ঝরানো রোদ পড়তো বাড়ীর উঠানে; কোথাও কোথাও আগমনী গান শোনা যাচ্ছে। পাল্কী চ'ড়ে বউ চলেছে বাপের বাড়ী। সঙ্গে তোরঙ্গ আর ক্যাশ-বাক্স,—ওতে থাকতো গহনা। বউদের চুলে ফুলেলা গন্ধের আভাস—চুলের ফিতে আর কাঁটায়, সিঁদুর কৌটায় আর আলতায় থাকতো শ্বশুরবাড়ীর গন্ধ,—থাকতো মৃদু মোহের আবেশ। বাপের বাড়ীতে মেয়েকে পেঁাছে দিয়ে পাল্কীর বেহারারা পাত পেড়ে উঠানে ব'সে যেতো। শ্বশুরবাড়ীর ঝি বউকে পেঁাছে দিয়ে পুজোর 'বিদায়' নিয়ে হাসিমুখে ফিরতো।

মোটরগাড়ী দেখা দিয়েছে কলকাতায় খানকয়েক। তখন ওর নাম ছিল হাওয়া গাড়ী। রবারের ফানুসটা টিপলেই বিকট আওয়াজ হয়,—সেই আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসে পাড়ার ছেলেমেয়েরা সদর দরজায়, আর সঙ্গে সঙ্গে দোতলার জানলাগুলো যায় খুলে। পাড়ার মধ্যে মোটর গাড়ী ঢুকলে লোকে লোকারণ্য,—বুড়ো গঙ্গার মা ভয় পেয়ে তা'র ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতো। কার্তিক স্যাক্‌রার ঘরের ঠুকঠাক আওয়াজ থেমে যেতো। কাওরাদের [illegible] দীপু গুণ্ডার এক মেয়েছেলে থাকতো,—তা'র নাম লছমী। ছাপরা জেলায় নাকি

তার বাড়ী। সেই স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা একখানা ফিনফিনে বৃন্দাবনী শাড়ী কোনোমতে কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতো বস্তির মুখে হাওয়া গাড়ী দেখার জন্য। আমার চোখে পড়তো মেয়েটার কপালে আর হাতে সবুজ রংয়ের উল্কী,—হাতে দুগাছা কাচের চুড়ি, পান জর্দায় টকটকে মুখ, হাত আর পায়ের আঙ্গুলে মেহেদীপাতার রংলাগা। দীপু যখন কেরোসিন তেল বিক্রি করতে যেতো, লছমী তখন আলাপ জমাতো এপাশে ওপাশে। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার পর মার খেতো মেয়েটা আগাপাছতলা,—তা'র কোনো কারণ আমাদের জানা ছিল না। চেঁচামেচি আর কান্নাকাটির শব্দে দিদিমা একসময়ে বিরক্ত হয়ে বলতেন, কালকেই আমি থানায় খবর পাঠাবো। রোজ রোজ এই কেলেঙ্কার আর বরদাস্ত হয়না। ওরে, উত্তর দিকের জানলা দুটো বন্ধ ক'রে দে ত'?

তবু কান্নার আওয়াজ আসতো অনেক রাত পর্যন্ত। সে-কান্না মেয়ের, নারীর, জননী ও ভগিনীর। সেই কান্না শুনে ঘুম আসতো না; সেই কান্না ঘুমের মধ্যেও আমার গলায় ফুঁপিয়ে উঠতো। স্বপ্নে দেখতুম, ভয়ানক মার খাচ্ছি মায়ের হাতে,—সর্বাঙ্গে আমার দড়া দড়া দাগ! স্বপ্নের কাতরোক্তিতে নিজেরই ঘুম এক সময়ে ভেঙ্গে যেতো! চেয়ে দেখতুম,—চোখ খুলে যেতো। নিঃসাড় ঘুমে অচেতন সবাই। ভগ্ন জরাজীর্ণ বাড়ীর আনাচে কানাচে বিড়াল কাঁদে। কান্না শুনতুম দেওয়ালের ফাটলে, বেলগাছের নীচে, ও-মহলের শূন্য ঘরগুলির আশে পাশে। কে যেন স'রে যেতো, যেন ছায়ামূর্তি ন'ড়ে যেতো, বাতাসের সরসরানি, জানলার ধারে খুটখাট, ছাদের উপরে পায়ের শব্দ, বেল-গাছের আগডালে বেম্মদত্যির আনাগোনা, শাঁকচুন্নির শাড়ীর হাওয়া,—আর নীচের তলায় কাটা ছাগলের রক্তাক্ত মুণ্ড নিয়ে পিশাচের দাঁতের কড়মড়ি।

শরীরের রক্ত চলাচল থেমে যেতো। চোখ বুজতুম অন্ধকারে।

সকালে উঠে দেখতুম সমস্তটা নির্ভুল বাস্তব,—ভ্রম, ভ্রান্তি কোথাও কিছু নেই। সেই প্রাচীন অনাবিষ্কৃত দিগন্ত, অগ্নিকোণ থেকে সূর্যের সেই আবির্ভাব,—তিনকড়িদের বাড়ীর ধার দিয়ে সেই দইওয়ালা হেঁকে চলেছে। অর্জুন মুদির দোকান পেরিয়ে সে চ'লে গেল কাঁসারিপাড়ার দিকে, কিংবা বাহির শিমলায়।

কলকাতাটা কত বড়—ভাবতুম মনে মনে। কোন্ দিকে ঠন্ঠনে আর

বউবাজার? কোন্ দিকে বা ধর্মতলা? একা একা কি যাওয়া যায় জোড়াসাঁকো আর মুর্গিহাটা, কিংবা সেই পাথুরেঘাটা? শ্যামবাজার আর রাধাবাজার? উল্টোডিঙি আর পায়রাটুনি? বালীগঞ্জ আর বকুলবাগান? চুপ ক'রে থাকতুম। কে নিয়ে যাবে? কবে আবিষ্কার করতে পারবো এক একটি পথ? কবে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে যাবো জানা থেকে অজানায়? কিন্তু যাওয়া সহজ নয়। পথে নামলেই ধরবে সেই ডাইনী,—তা'র নাম কাগী। এই পথ দিয়ে যায় সে সকালে দুপুরে। বাঁকা চোখে সে তোমার দিকে তাকিয়ে গেলে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেবে, রক্ত উঠবে মুখ দিয়ে! কাগী আসছে সামনের পথ দিয়ে,—অমনি সব বাড়ীর দরজা বন্ধ, ছেলেমেয়েরা গিয়ে লুকিয়েছে খাটের তলায়। কাগীর আকর্ষণ বড় ভয়ানক,—দিনের বেলায় সে ডাইনী; রাত্রে সে হয়ে ওঠে পিশাচী। শুকনো খড়ের মতন তা'র চুল, গরুড়ের মতন নাক, চোখ দুটো আগুনের ডেলা, কাঠকয়লার মতো বর্ণ, হাত দুখানা লোহার বরগার মতন শক্ত আর সরু। কাগীকে চোখে দেখলে আর রক্ষা নেই। ছটফট ক'রে মরতে হবে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে,—পাগল হয়ে কামড়াতে ইচ্ছে হবে সবাইকে। দিনের বেলায় এই হলো সকলের বড় ভয়। সন্ধ্যায় আসে রাক্ষসী ছেলে-ভয়-দেখানো। সদর দরজায় এসে সে দাঁড়ায়। মুখের উপরে মস্ত বড় মুখোস,—করাল তা'র চোখ, লকলকে রক্তাক্ত জিহবা, সর্বাঙ্গে কালো আচ্ছাদন, মস্ত মস্ত দুখানা টিনের হাত,—মাথায় দানবীয় পরচুলা। রেড়ির তেলের আলোটা তা'র দিকে তুলে ধ'রে সবাই দেখে,—আর বুকের মধ্যে গুরু গুরু কাঁপন লাগে। বিস্তৃত দুখানা হাত তুলে ছায়ান্ধকারে সেই রাক্ষসী যখন আলুথালু নাচে,—তখন সে প্রলয় তাণ্ডব,—রক্তে রক্তে ঝনঝনিয়ে ওঠে আতঙ্কময় অস্থিরতা, অন্ধকার নিশীথিনী যেন বিভীষিকার ছায়া ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র। অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে অস্তিত্বের চারিধার।

হঠাৎ পাশ থেকে আমার পিঠে ধাক্কা পড়ে,—আর অবাধ্য হ'বি কখনো?

কেঁদে বলতুম, না।

না ব'লে কোথাও চ'লে যাবি?

না।

পাশ থেকে বড় বোন বলতো, আর পা-জামা নোংরা করবি?

কম্পিত কণ্ঠে জানাতুম—না।

তারপর আড়ালে আমাকে সরিয়ে এনে রাক্ষসীকে একটি অথবা দ'ুটি পয়সা দেওয়া হোতো। উদ্দেশ্য—ও যে প্রকৃত রাক্ষসী নয়, এ যেন আমি জানতে না পারি। ও যে একটা পুরুষ, এটা যে ওর সন্ধ্যাবেলার পেশা,—এটা জানতে পারলে পাছে আমার ভয় ভেঙেগ যায়! অবশেষে লোকটা মাথার ওপর মুখোসটা তুলে দিয়ে টিনের হাত দুখানা খুলে নিয়ে এক সময়ে চ'লে যেতো।

কোনো কোনো সন্ধ্যারাত্রে ভিন্ন আকর্ষণ ছিল। মেয়েদের মতো ক'রে কাপড়পরা, মুখে একমুখ লম্বা দাড়ি, হাতে তেলের প্রদীপের পাত্র,—দরজায় এসে আওয়াজ দিত দীর্ঘকণ্ঠে—ইয়া পীর, মুশকিল আসান!

লোকটা শান্ত, আত্মসমাহিত। চোখ দুটো অচঞ্চল, ললাট মসৃণ রেখাহীন, মুখ প্রসন্ন গম্ভীর,—যীশুখৃষ্টের ছবিখানা মনে পড়ে যেতো। চাহনি যেন ক্ষমাসুন্দর, ভাষণ অতি মৃদু,—দাঁড়াবার ভঙগীটি যেন তপোবনের মুনির মতো। পীরের জন্য ভিক্ষা দাও—ভালো; না দাও—কোনো নালিশ নেই। পথে নেমে আবার সে নারীসুলভ কণ্ঠে ডাক দিত—ইয়া পীর, মুশকিল আসান! বহুদূর থেকে যেন সেটা সঙগীতের মূর্ছনার মতো কানে এসে বাজতো অনেক রাত পর্যন্ত। প্রদীপের পাত্রের সেই আলো বহুদূর গিয়ে মিলিয়ে যেতো। সেই বিলীয়মান আলো আমার মনকে কতবার টেনে নিয়ে গেছে তা'র পিছু পিছু। চাইতুম একটা মুক্তি। সে-মুক্তির চেহারাটা জানা ছিল না, তা'র কল্পনাটাতেও ছিল একটা দুর্ভাবনা,—তবু ছিল প্রবল একটা পিপাসা বাঁধন ডিঙিগয়ে যাবার, সমস্তটাকে অস্বীকার ক'রে ছোটবার। বাইরেটা বোবা, মুখের ভাষা তখনও এসে পেঁছয়নি, যুক্তি আর বিশ্লেষণের বুদ্ধি তখনও কাঁচা,—কিন্তু অন্তর্লোক কাজ ক'রে চলেছে। ভয়, কুসংস্কার, প্রচলন, অন্ধতা, অনাচার,— সমস্তর বিরুদ্ধে অন্তর্দ্রোহ চলছে,—বাইরে তা'র অভিব্যক্তি নেই।

*

শ্বশুরবাড়ীর থেকে মেয়ে এলো বাপের বাড়ীতে,—ঘাড়ের কাছে তার বঁটির ক্ষতচিহ্ন; সে-নাকি আত্মনাশ করার চেষ্টা করেছিল। স্বামী, শাশুড়ী ও

ননদদের কদাচারের সে সব কাহিনী শুনে যাওয়াটা ক্লান্তিকর। কোন্ মাসতুতো ভাই কবে এসে বয়স্থা কুমারী শিবরাণীকে ডেকে নিয়ে গেল ছাদের চিলে-কোঠায়,—সেখানে কী যেন বলাবলি,—তারপর শিবরাণী নীচে নেমে এলো কাঁদতে কাঁদতে। পরণে শান্তিপুরী কালাপাড় শাড়ী, দপদপ করছে গায়ের রং, নাকটা ঈষৎ খাঁদা,—বেশী বয়স হ'লেও মেয়েটার তখনও বিয়ে হয়নি। গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে মহলে তখনও জামার চলন হয়নি,—তখনও পেটিকোট ব্যবহার ছিল অভব্যতা, সকলের সামনে চুল খোলাটা ছিল অসভ্যতা; আয়নার সামনে এসে কেউ দাঁড়ালে তা'র চরিত্রের ওপর দাগ প'ড়ে যেতো। কুটুম্বর মেয়ে শিবরাণীর বেলা এ সব শাসন কিন্তু চলতে পারতো না। আবার দেখি কবে একদিন জামাই এলো কোন্ শনিবারে। রবিবারটা থাকবে,—যাবে সেই সোমবারে। ভরসন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর চোখে কান্না; জামাই তা'কে কী যেন অপমান ক'রে চ'লে গেছে। ব'লে গেছে আর কোনোদিন অমন স্ত্রীর মুখ দর্শন করবে না। বাড়ীতে শোকের ছায়া। দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। একদিন যেন কবে বাড়ীর বধূকে দেখতে এলেন বধূর পিতা—তিনি কিছু শিক্ষিত, কিছু বা অবস্থাপন্ন। তাঁর সামনে বধূর আচরণ নিয়ে সমালোচনা উঠলো,—সঙ্গে সঙ্গে বেধে উঠলো কদর্য কচকচি আর বাক্‌বিতন্ডা। বধূর পিতা একদিকে,—আর একদিকে পরস্পর মারমুখী জনতা। ভদ্রলোক নতমুখে সেই যে গেলেন, এ বাড়ীতে আর এলেন না কোনোদিন। বধূনির্যাতনটাও প্রচলিত ব্যবস্থার একটা অঙ্গ ছিল।

বধূ নির্যাতন? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল সেই আনন্দময়ীর কথা। প্রায় ত্রিশ বছর আগে সেই বধূটি প্রকাশ করতে গিয়েছিল স্বকীয়তা আর মৌলিক বিচার বুদ্ধি। স্বভাব চরিত্রে তা'র ছিল আভিজাত্য—এই ছিল অপরাধ, তা'র চেয়ে বড় অপরাধ,—লেখাপড়ার দিকে তা'র ঝোঁক ছিল। ফলে স্বামী, শাশুড়ী আর ননদ একদিকে,—অন্য দিকে সে একা। বলা হোলো, তুমি যদি মানিয়ে চলতে না পারো, বাপের বাড়ী চ'লে যাও। আনন্দময়ী বললে, যাবো না—এখানেই আমার অধিকার। আমার স্বামী, আমার ঘরকন্না, আমার শাস্ত্রসম্মত দাবী—

আনন্দময়ীকে অবরোধ ক'রে রাখা হোলো তেতলার ছাদের পায়রার খোপরে। সর্বাঙ্গে তা'র আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। সেখানে পানীয় দেওয়া হোতো

না। সেখানে সে ছিল চার মাস,—তা'র মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিল। হঠাৎ এক প্রতিবেশী সন্দেহবশে খবর পাঠালো থানায়। এই সংবাদে সমগ্র বাঙ্গলা দেশের হৃদয় বেদনায় উত্তাল হয়ে উঠলো। স্বামী, শাশুড়ী ও ননদকে কারাগারে যেতে হোলো।

মনে পড়ছে সেই সেকালের স্নেহলতাকে। দরিদ্র পিতার সুশ্রী কন্যা। কিন্তু কন্যাদায়ে অনেক টাকা লাগে যে। অত বড় মেয়ের বিয়ে হয় না,—আত্মীয় কুটুম্ব মহলে আর পাড়াপল্লীর আসরে ঢি ঢি নিন্দা! অবশেষে একদিন স্নেহলতা নিজের শরীরের ওপর কেরোসিন ঢেলে তার ওপর একটি দেশালাইর কাঠি ধরালো। সে যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন সমস্ত দেশের লোক সেই ঘটনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো অনেক দিন। স্নেহলতা, আর আনন্দময়ী,—ওরাই নাকি আধুনিক নারী আন্দোলনের প্রথম সাড়া জাগিয়েছিল।

*

ঊর্মিলাদিদি এলেন ছেলেপুলের সঙ্গে স্বামীকে নিয়ে। তাঁরা নাকি পূবদেশের কোন্ জমিদার। ঊর্মিলাদির গায়ে একগা গয়না—দড়ি আর কড়ির হার, হাতের বাজুতে মোটা মোটা ফারফোরের তাগা, দুই হাতে একরাশি সোনার চুড়ির সঙ্গে বালা আর ব্রেসলেট, কানে মস্ত মাকড়ি, কোমরে চন্দ্রহার, মাথায় সোনার ফুল আর টায়রা, নাকে চেন্‌টানা নথ, আর পায়ের আঙ্গুলে চুট্‌কী। বড়মানুষের আবির্ভাবে বাড়ীব সবাই তটস্থ। ঊর্মিলাদি ভয়ানক বদ্‌রাগী আর আত্মাভিমানী,—পান থেকে চুণ খসবার যো নেই। ছেলে দুটি বেপরোয়া। বড়টি জুতো প'রে যায় ঠাকুরঘরে, কিংবা ভাঁড়ারে, কিংবা রান্নাঘরে। স্বামী হলেন হরিশবাবু। তিনি আমাকে দেখে আঙ্গুল দেখিয়ে কা'কে যেন বললেন, এটা সেই বাপখেগো ছেলেটা না? যা, আমার জুতোটা বুরুশ কর দেখি?

তথাস্তু। ফরমাসের গন্ধ পেয়ে আনন্দে ডিগ্‌বাজী খেয়ে চললুম। কী আনন্দ বড়লোকের তাঁবেদারিতে, কী উল্লাস ধনীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোয়। যা খেতে পাইনে, যা চোখে দেখিনে,—তারই ছিটেফোঁটা পেয়ে যাই

কপালঠুকে। গন্ধতেলের ফোঁটাটা, বড় মাছের কাঁটাটা, দুধের তলানি, দইয়ের শেষদাগটুকু, পানতুয়ার ভাঙগা অবশেষ,—ওই পেয়েই মাঝে মাঝে ছাগলছানার মতো অহেতুক আনন্দে ঘুরপাক খেয়ে আসি। সুপ্রসিদ্ধ জমিদার হরিশের জন্য বিড়ি কিনে আনা, পানের ডিবে এগিয়ে দেওয়া, গেঞ্জিতে সাবান মাখানো, কাপড়খানা শুকোলে হাতের কাছে এনে গুছিয়ে দেওয়া। নাপিতে পাওয়া যায় কিনা, জুতোসেলাইয়ের মুচি যাচ্ছে কিনা, স্নানের জন্য তেল সাবান গামছা, স্নানশেষে আয়না চিরুনী, খেতে যাবার আগে পায়ের কাছে চটিজোড়াটা। দেখেশুনে সেজমাসিমা বললেন, ধন্যি ছেলে! ওর চোখ আছে দ্যাখো সব দিকে। দিনরাত ফাই ফরমাস খাটছে,—মুখে রা নেই!

ঊর্মিলাদির যাবার দিন এলো। গতকাল ওর বড় ছেলেটা পাথরের টুকরো ছোড়াছুড়ি করতে গিয়ে আমার কপালে একটা পাথর এসে ঠাঁই ক'রে লাগে। চোখদুটো একেবারে অন্ধকার। কপাল ফুলে ওঠে নীল হয়ে,—হয়ত বা পাকবে। কিন্তু বহু চেষ্টায় আঘাতটাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি, নচেৎ মারপিঠের অভিযোগটা আমার বিরুদ্ধেই আসবে জানতুম।

ঊর্মিলাদিদিরা গাড়ীতে ওঠবার আগে আর একটা আহারাদির ঘটা লেগে গেল। আমি বিস্মিত! এই ত' একটু আগে ওদের মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব শেষ হয়েছে! ওরা বড়লোক, জমিদার,—ক্ষুধা কি তাই এত বেশী?

গাওয়া ঘিয়ের গরম গরম লুচি, গল্‌দা চিংড়ীর কালিয়া, বড় বড় বেগুন ভাজা, লেবুর গন্ধ মাখানো উৎকৃষ্ট ছানার সন্দেশ,—তার পাশে টাট্‌কা রসে ফেলা একহাঁড়ি পানতুয়া।

আমার দিকে ফিরে কে যেন বললে, যা, চট্‌ ক'রে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়,—এখানে দাঁড়াসনে।

ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনতে লাগলো দশ মিনিট। কিন্তু ভিতরে এসে খবর দিতেই ঊর্মিলাদি বোধ করি হাত বাড়িয়ে আমার হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন সেজমাসিমা।—থাক্‌ থাক্‌, ওরা রয়েছে কল্‌কেতার সদরে...বাড়ীর দো'রে ভালো ভালো মিষ্টির দোকান...ওদের ভাবনা কি? কত জুটে যাবে! তোর ছেলে দুটোকে বেশ ক'রে খাওয়া দিকি?—নে, খা বাবা!

আমার দিকে ফিরে সেজমাসিমা সহাস্যে বললেন, সেয়ানা ছেলে দ্যাখো... মুখ ফিরিয়ে নেছে। বলি, যা দিকি, সবাই মিলে তোরঙ্গ আর বাক্স এনে গাড়ীর ছাদে তোল্!...যা, আমি তোকে পয়সা দেবো, দই কিনে খাস!

কপালের কালশিরাটা অনেক দিন পর্যন্ত মিলোয়নি।

*

দিদিমার বাড়ীতেই আমরা থাকতুম, কিন্তু তাঁর ওমহলে ভাড়াটে জুটতো না অনেক সময়ে। লোকে দেখে যেতো, আসবো ব'লে চ'লে যেতো। শূন্য মহলে জঞ্জাল উড়ে বেড়াতো সারাদিন, দুপুরের রোদে বেলগাছের ঝরাপাতার সরসরানি শোনা যেতো, গোলা পায়রা এসে হয়ত বাসা বাঁধতো, হয়ত বা বিড়াল কেঁদে যেতো কোনো কোনো রাত্রে। দিনের বেলায় ওমহলটা ছিল আমাদের দুরন্তপনার অবারিত ক্ষেত্র। জঞ্জালের মধ্যে খুঁজে পেতুম ঝরা পালক, কিংবা পুরনো তারিখের চিঠি, কিংবা ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি। বড় জোর পেয়ে যেতুম সিস-ভাঙ্গা পেন্সিলের টুকরো। আমাদের আনন্দ, কিন্তু বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনার শেষ নেই। কলকাতার মাঝখানে ভদ্র পল্লীতে এই দোতলা বাড়ী, ছ'খানা ঘর, মস্ত উঠোন, দুটো চালা ঘর—ভাড়া মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। ভাড়াটে না পেলে মালিকের অসুবিধে,—টেক্স খাজনা গুণতে হয়। সুতরাং দিদিমা বড়ই বিপন্ন বোধ করতেন। ভাড়া বন্ধ হ'লে হাঁড়িও যে বন্ধ হবে!

অবশেষে একদিন একটি লোক এসে জানালো, তাঁরা নীচের তলাকার একটি ঘর ভাড়া নিতে পারেন পাঁচ টাকায়। থাকবেন স্বামী স্ত্রী আর একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে।

মামা বললেন, পাঁচ টাকা! কলকাতায় গোয়াল ঘর পাওয়া যায় না পাঁচ টাকায়। আট টাকার কম আমি রাজি নই। অতঃপর অনেক দর কসাকসির পর দিদিমা রাজি হলেন সাত টাকায়। ভাড়াটে-কর্তা মামার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। লোকটা বুঝি কালীঘাটের ওদিকে মাটির পুতুল আর টিনের খেলনা বিক্রি করতে যায়। এর আগে ওরা ছিল সাবেক কোন্ বাড়ীতে; সেখানে নাকি বাড়ীওয়ালার অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওরা চলে আসতে বাধ্য হয়।

কথাটায় দুঃখের সুর ছিল, সুতরাং দিন তিনেকের মধ্যেই ওরা যেন আমাদের আপন হয়ে গেল। আমরা ছোট ছোট কয়েকজন ভাই বোন খেলার সঙ্গী পেয়ে গেলুম ওই ছোট মেয়েটাকে। মেয়েটার নাম নণ্টু। নণ্টু বড় সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী,—কিন্তু তার দোষ ছিল এই, সে সহজে জামা কাপড় পরতে চাইতো না। এজন্য তার লাঞ্ছনা আর তিরস্কার হোতো অনেক সময়ে। কিন্তু নণ্টু ছিল অবাধ্য, তাকে বাগ মানানো কঠিন। সুতরাং আমাদের এ মহলে সে যখন ছিট্‌কে আসতো, তখন এদিক থেকেও তা'র উপর তাড়না হোতো। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনোটাতেই তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

আমরা কয়েকজন নণ্টুর মার খুব প্রিয় ছিলুম। মহিলাটি আমাদের মা-মাসিমাদের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত। ঘোমটা টানা থাকতো কপালে সব সময়ে,—আমরা সেই ঘোমটার নিচে দিয়ে দেখতুম তাঁর বড় বড় কালো চোখ আর পরিচ্ছন্ন দাঁতের মিষ্ট হাসি। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বলতেন, এসো বাবা এসো, তোমার জন্যে কমলা লেবু রেখেছি—খাও গে।

আড়ষ্ট হয়ে বলতুম, নণ্টুকে দিন্ না লেবু?

নণ্টু? ও পোড়ার মুখির কথা আর বলো না। ভাত ছাড়া কিচ্ছু খায় না, তাও আবার নুন দিয়ে। ভাতের সঙ্গে আর কিছু ছোঁয় না। পোড়ারমুখী ভাত খায় চার পাঁচ বার।

নণ্টুর মা পুনরায় বলতেন, গরীবের ঘরে নুন ভাত খাওয়াই ত সুবিধে বাবা?

সুমধুর সঙ্গীতের মতন তিনি কথা বলতেন, কিন্তু সেদিন তাঁর সব কথার মানে বুঝতুম না। শুধু মনে হতো, এ মেয়ের জন্মানো উচিত ছিল কোন বড় ঘরে, এ বাড়ীর এই আবহাওয়ায় ওঁকে যেন মানায় না।

ছোট ছেলে-মেয়েরা নণ্টুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল নানা কারণে। নণ্টু বেল-গাছের ডালে উঠে কাকের বাসা ভেঙ্গে দিত, নয়ত চড়াই পাখী ধ'রে তা'র পায়ে দড়ি বেঁধে ঘোরাতো। তার ভয়ে কুকুর বিড়াল পাড়া ছেড়েছিল। আবার কখনো বা নেংটি ইঁদুর ধরে কাক-চিলকে ডাকতো তারস্বরে। তার মা এক সময়ে তাকে হয়ত পরিয়ে দিত কালো ফুল-তোলা এক টুকরো

বৃন্দাবনী শাড়ী, আর সে সেখানা কোমর থেকে খুলে হাতে জড়ো ক'রে নিয়ে উঠোনে গান গেয়ে বেড়াতো। আশ্চর্য, গানের গলা তার অতি মিষ্ট ছিল,—কিন্তু বেহায়া মেয়ে ছাড়া কেউ গান গায়? সুতরাং আমাদের ওপর নিষেধ ছিল আমরা যেন নন্টুর সঙ্গে না মিশি। দিন দিন সে যেন হয়ে উঠলো মূর্তিমতী এক সমস্যা,—সে ভয় পায় না, ভয় করেও না কাউকে। মার খায়, কিন্তু মুখের হাসি কমে না। তা'র এই সব চাল-চলনে এবং এই প্রকার স্বেচ্ছাচারের চেহারা দেখে আমার ভিতরের অত্যুগ্র বিদ্রোহী বালক পরম কৌতুক বোধ করতো। সকলের চোখ এড়িয়ে আমি গিয়ে দাঁড়াতুম তার পাশে,—সে আমাকে শেখাতো কেমন ক'রে ভাঙ্গা পাঁচিলের উপর থেকে উঠোনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়, কেমন ক'রে ভাঙ্গতে হয় বেলগাছে কাকের বাসা। মেয়েটার চুল ছিল ছোট ছোট। মুখে চোখে ও সর্বাঙ্গে কেমন এক প্রকার সোঁদা বন্য গন্ধ! চাহনিটা যেন নেশা ধরানো, আর তা'র সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতার হাওয়া। সে যদি হাত ধ'রে টানতো কখনো, ঠিক যেন অকুলে ভেসে যাওয়ার ভয় হোতো। শাসনের ভয়ে যখন আমার বুকের ভিতরে কাঁপতো, তখন সে আমাকে বাইরের থেকে ডাক দিত ইসারায়,—আমার বুকের ভিতর আবার কেঁপে উঠতো—পাছে তা'র দুর্বার আকর্ষণে শাসন শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ি। তা'র জ্বালায় শিশুপাঠ্য কথামালায় আমার মন কিছুতেই বসতে চাইতো না।

দিনের বেলা নন্টুর মায়ের রান্না চড়তো না, কেন না রান্নার উপকরণ জুটতো না দিনমানে। দারিদ্র্যই তা'র কারণ। তাঁর কাজ ছিল শান্ত মনে পুরনো কাপড় শেলাই করা, কিম্বা রামায়ণখানা নিয়ে এক মনে ব'সে থাকা,—কিংবা অমনি একটা কিছু। সন্ধ্যার সময় যখন রেড়ির তেলের আলো জ্বলতো তাঁর দরজায়, তখন মধ্যে মাঝে দেখতুম নন্টুর বাবা আসতো পোঁটলা পুঁটলী নিয়ে। তখন ভাত চড়তো। সেই ভাতের গন্ধে জেগে উঠতো নন্টু। এক সময় হয়ত সেই লোকটি দীর্ঘ মিষ্ট কণ্ঠে দেহতত্ত্বের গান ধরতো,—'মন যে আমার পথ হারালো, মাগো—তোমার চরণ স্মরণ করি।'

লোকটার গলা ছিল মিষ্ট,—সেই গলায় সংসার-বৈরাগ্যের একটা করুণ আবেদন ছিল। এধার থেকে দিদিমা সেই গান শুনে সজল চক্ষে ব'লে উঠতেন, সবাইকে রেখে কবে যাবো মা? কাশী—কাশী—বিশ্বনাথ!

তুচ্ছ

লোকটা কিন্তু সূর্যোদয়ের আগেই উঠে নিজের কাজে চলে যেতো। দিনের বেলায় কোনোদিন আমরা তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখিনি। পুতুল বেচে তা'র যা রোজগার হয় তা'তে দুবেলা অন্ন জোটে না, তার ওপর আছে ঘর ভাড়া, আছে কাপড় চোপড়,—কিন্তু সকাল সন্ধ্যা তা'র অধ্যবসায় অসীম।

দিদিমা বলতেন, মুখে ভাত তুলবো কেমন ক'রে, মা? মেয়েকে নিয়ে বউটি উপোস ক'রে রইলো—এতে যে ভিটের অমঙ্গল! দু'কুন্‌কে চাল-ডাল তোরা দিয়ে আয় মা। এমন ভাড়াটের কাছে ঘরভাড়াই বা নেবো কেমন ক'রে?

নণ্টুর মাকে ডাকা হোতো, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাদের দান গ্রহণ করতেন না। বরং হাসিমুখে বলতেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে!

আমি দেখতুম সহাস্য মুখে তাঁর কী দৃঢ়তা। সেই শান্ত হাসির কাছে আমাদের দাক্ষিণ্য যেন ছোট হয়ে যেতো। সেজমাসিমা বলতেন, বউটার অংখার দেখেছ? রক্তের তেজ আছে বৈ কি, নৈলে উপোস করে কিসের জোরে?

দিদিমা চুপ ক'রে থাকতেন। আমরা লুকিয়ে গিয়ে নণ্টুকে এক বাটি ভাত খাইয়ে আসতুম। অত দারিদ্র্যের মধ্যেও মেয়েটাকে কোনোদিন মলিন কিংবা বিমর্ষ দেখা যেতো না। বড় কঠিন মেয়ে। আমাদের এ মহলে ছিল কলরব, কলহ আর কোলাহল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হৈ চৈ লেগে থাকে। দারিদ্র্যের থেকে জন্ম চিত্তক্ষোভের, তার থেকে নিত্য অসন্তোষ আর অশান্তি। মামার বিকৃত চীৎকার, দিদিমার কটূক্তি, মামীর আচরণ নিয়ে কদর্য কোলাহল,—সমস্তটা মিলিয়ে আবহাওয়াটা থাকতো দূষিত। ও মহলটা কিন্তু সবসময়ে শান্ত,—সেখানে যেন তপোবনের তপস্বিনী ব'সে থাকতো আত্মসমাহিত হয়ে। আমি এক একবার আড়াল থেকে নণ্টুর মাকে দেখে আসতুম। হয়ত ঘরে আলো জ্বালা। নণ্টু ঘুমিয়ে। আর নণ্টুর মা ব'সে রয়েছেন আলোটার দিকে চেয়ে,—তাঁর চক্ষের পলক পড়ছেনা। হয়ত বা চোখের পাতায় থাকতো জলের আভাস, কিংবা স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকতেন কোনো জটিল ভাবনা নিয়ে। আমিও চেয়ে থাকতুম তাঁর দিকে একাগ্র চক্ষে, চেয়ে-

চেয়ে আত্মবিস্মৃত হতুম, কিন্তু কি দেখতুম আজকে আর আমার মনে পড়ে না।

অত ঘনিষ্ঠতা, অতদিনের আনাগোনা আর ঘরোয়া বন্ধুত্ব,—কিন্তু সহসা একদিন যেন তার অবসান ঘটলো। ভিতরে ভিতরে একটা অসন্তোষ যেন রি রি ক'রে উঠলো। আমাদের পরে নির্দেশ এলো, ওমহলে যেন আর না যাই,—নণ্টুর সঙ্গে যেন আর বাক্যালাপ না করি। চাপা চাপা কথাবার্তা আর কানাকানিতে ভরে উঠলো আমাদের এ মহল। এক এক জায়গায় এক এক দলের জটলা বসে গেল।

একথা চাপা রইলো না যে, ওরা মন্দ লোক। যে লোকটা সকাল সন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নির্বিরোধে পরিবার প্রতিপালন করে সে লোকটা নাকি শয়তান। যে নণ্টু আমাদের সকলের নিত্য প্রিয় সঙ্গী—যার কলহাস্য আর আনন্দোচ্ছ্বাস এ বাড়ীর দূষিত অসাড় আবহাওয়াকে মুখর ক'রে রাখে সে নাকি মূর্তিমতী পাপ, আর তার মা নাকি বিষাক্ত সর্প অপেক্ষাও ভয়াবহ জীব। মামা বললেন, খবরদার,—ওদের মুখ দর্শন করো না।

দিদিমার সঙ্গে মামার কোনোকালেই মিল নেই, কিন্তু এখানে তাঁদের মধ্যে কোনো বিরোধই দেখা গেল না। দিদিমা বললেন, দুর্গা দুর্গা, মুখ দেখাও পাপ।

সেজ মাসিমা এসেছিলেন সেদিন চুঁচুঁড়া থেকে। তিনি শোনামাত্র বললেন, খ্যাংরা মেরে তাড়াও বাড়ী থেকে। ছোট মেয়েটা আসে এ দিকে,—তোরা যেন ওকে ছুঁসনে, বাবা। কালনাগিনীর বাচ্চা!

কানাকানির থেকে জানাজানি। তারপর এ বাড়ী থেকে ওবাড়ী,—এবং এ পাড়া থেকে ওপাড়া। এই উপলক্ষ্যে যাদের মধ্যে বিবাদ ছিল, তাদের মধ্যে গলাগলি দেখা গেল। শাশুড়ীর পাশে বউ এসে দাঁড়ালো, মামীর পাশে মামা, মামার পাশে দিদিমা। সবাই ভালো, সবাই পরম বৈষ্ণব, সকলেই সমাজনীতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত, কল্যাণকামনায় সকলেই এক মত।

সেজমাসিমা চেঁচিয়ে বললেন, ভালোয় ভালোয় ওরা যদি ঘর ছেড়ে না যায় তবে পুলিশে খবর দাও, দাদা।

মামা তাঁর ছিলিমে শেষ টান দিয়ে এসে বললেন, তা আর বলতে?

কলকাতার সব থানার দারোগা আমার মুঠোর মধ্যে। সাত দিনের মধ্যে যদি ঘর ছেড়ে না দেয় ত' ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো। বুনো ওল দেখলে ভয় পাইনে, আমিও বাঘা তেঁতুল!

পাড়ার সমাজপতি চাটুয্যে মশাই একদিন এসে বললেন, ভট্‌চায, কি সব শুনছি? তোদের বাড়ীতে কেমন লোককে ভাড়াটে বসিয়েছিস?

মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, এবারটা মাপ কর। দুষ্টু গরু গোয়ালে এসে ঢুকেছে। গলায় দড়ি বেঁধে শিগগিরই বিদেয় করছি।

পাড়ায় নাকি আর মুখ দেখানো যাচ্ছে না। সমগ্র পল্লী নাকি অশুচি হয়ে উঠেছে নণ্টুদের অস্তিত্বে। সমাজবিধি, নৈতিক চেতনা, লৌকিক সংস্কার—সমস্তই তাদের জন্য নাকি বিপন্ন। সুতরাং সেদিনকার সেই অগণ্য নরনারীর সঙ্ঘবদ্ধ শাসন ও রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি নিরুপায় প্রাণী থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

একটা মর্মান্তিক ঘটনা থেকে একদিন আগুনটা জ্ব'লে উঠলো। গোপনে এক কাঁসি ভাত নিয়ে আমিই আড়ালে গিয়ে নণ্টুর থালায় ঢেলে দিচ্ছিলুম,—কিন্তু মামীর সতর্ক চক্ষু সেটা লক্ষ্য করে। তিনি ছুটে গিয়ে একখানা খুন্তি এনে নণ্টুর কপালে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ মেয়েটার কপাল বেয়ে ঝর ঝরিয়ে নেমে এলো রক্তের ধারা। কিন্তু নণ্টু ভ্রূক্ষেপ করলো না, রক্তটা বাঁ হাতে মুছে ভাতের থালা নিয়ে পালিয়ে গেল। নণ্টুর মা অনেক সহ্য করেছিল, এবার কিন্তু আর বরদাস্ত করতে পারলো না। সেই শান্ত দেবীমূর্তি এবার চঞ্চল হয়ে উঠে কাঠের চ্যালা বা'র ক'রে নণ্টুকে প্রহার আরম্ভ ক'রে দিল। এ মহলে আমার ওপর লাঞ্ছনা,—সে ত' আমায় সয়ে গেছে। আমাকে নাকি বশীকরণ করেছে নণ্টুর মা।

গলা বাড়িয়ে এক সময় নণ্টুর মা বললে, মেয়েটাকে এমন ক'রে মারলেন যে, একেবারে রক্তারক্তি? ভাত কি আমরা চেয়েছিলুম? ওকে আপনাদের ছেলেই ত ডেকেছিল? মামী জবাব দিলেন, গলার আওয়াজ করলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে পারি তা জানো?

হোমাগ্নিশিখার মতো নণ্টুর মা কাঁপতে লাগলো। বললে, আপনারা না ভদ্রলোক?

তুচ্ছ

মুখ সামলে কথা বলিস। জিব টেনে বার করবো। সতীপনা ধরা প'ড়ে গেছে তাই বুঝি এখন গলাবাজি? জানি জানি, সব জানি। শাক দিয়ে এত দিন মাছ ঢাকা ছিল!—মামীর মুখে আরো যে সব অদ্ভুত ভাষা যোগাতে লাগলো, সে সব সে বয়সে আমি প্রথম শুনলুম।

এ নাটকের প্রধান নায়ক হলেন মামা। তিনি একদিন সন্ধ্যার পর নণ্টুর বাবাকে পাকড়াও করলেন। চোখ রাঙিয়ে বললেন, ঘর যদি না ছেড়ে দাও তবে গলায় দড়ি বেঁধে তুর্কি নাচন নাচাবো। মনে করেছ আমি শুধু গাঁজা-আফিংই খাই, আর কোনো গুণ নেই আমার? ইতিজাতের সঙ্গে আমি ঝগড়া করিনে, দাঙ্গা বাধাই—এ কথা মনে রেখো।

নণ্টুর বাবা সবিনয়ে বললে, অন্য জায়গা খুঁজে নেবার একটু সময় দিন্?

তিন দিন!—মামা হাঁক দিলেন, তিন দিনের বেশী সময় দেবো না। তারপর গলা ধাক্কা!

এক পক্ষ মারমুখী, অন্য পক্ষ শান্ত। আমরা অনেক নিচে নামতে পারি এ তারা জেনেছে। আমরা বাড়ীওয়ালা। ভদ্রতার মুখোস আমরা যে কোন সময়ে খুলে ফেলতে পারি। লোকটা মামার মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরে চলে গেল।

পরম্পরায় কথাটা 'রটনা হতে লাগলো। কে যেন হলপ ক'রে বললে, নণ্টুর মা নাকি বাল-বিধবা। নণ্টুর বয়স যখন পাঁচ মাস, তখন তা'র স্বামীর মৃত্যু ঘটে। তার পর থেকে এই লোকটি ওদের প্রতিপালনের ভার নেয়। এ লোকটি নাকি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে,—যেন কোথাকার জমিদার। কিন্তু সব ছেড়ে এসে এখন খেল্না ফিরি করে, সকাল সন্ধ্যা ঘুরে টাকাটা-সিকেটা জোগাড় করে আনে। অনেক তুকতাক, অনেক মারণ উচাটন জানে নাকি ওই নণ্টুর মা,—লোকটা তাই ওদেরকে ছেড়ে যেতে পারে না। ওই ডাইনী, ওই পিশাচীই হোলো যত নষ্টের গোড়া। ওই লোকটাকে নাকি পথের কাঙ্গাল করেছে ওই শয়তানী।

তিন দিনের বদলে সাতদিন পেরিয়ে গেল, ওরা বাড়ী ছাড়লো না। লোকটা পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। কখন আসে কখন যায়—কেউ জানতেও পারে

না। সম্ভবত ঘর খুঁজে পায়নি। নণ্টুর মা পাথরের মতন দরজার ধারে ব'সে থাকে।

বেশ মনে পড়ছে সেটা বর্ষাকাল। আগের দিন সমস্ত রাত ধ'রে বৃষ্টি হয়েছে। পরদিন সকালেও জলকাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়। এমন সময় পুলিশ-পেয়াদা এসে হাজির হোলো বাড়ীর দরজায়। পাড়ার লোক এসে দাঁড়ালো ঘিরে। মামা বিজয় গর্বে বেরিয়ে এলেন। কারো মুখে ক্রূর হাসি, কারো মুখে ধিক্কার, কারো মুখে বা রসিকতা।

পুলিশের পেয়াদা নণ্টুর মার ঘরে ঢুকে জিনিষ পত্র টেনে রাস্তার জল-কাদায় নামালো। হাঁড়ি, কলসী, কড়াই, ছেঁড়া মাদুর, ভাঙগা তোরঙগ আর থালা বাটি। মেয়ের হাত ধ'রে নণ্টুর মা পথে এসে নামতে বাধ্য হোলো। হঠাৎ সবাই চুপ। নণ্টুর মা'র মুখে চোখে এক প্রকার নিঃসঙ্কোচ প্রশান্তি—সেই প্রসন্ন মুখে যেন সকলের জন্য ক্ষমা। কুণ্ঠা নেই, অধোবদন নয়, নির্বিকার দৃষ্টি, আচরণে কোথাও নেই জড়তা আর আড়ষ্টতা,—তাঁর দিকে তাকিয়ে সবাই যেন থমকে গেল।

আমিও থমকে গেলুম একান্তে দাঁড়িয়ে। হৃৎপিণ্ড ঠেলে গলার কাছে কান্না উঠে আসছে, কিন্তু আমি শান্ত। হঠাৎ হোতো যদি সর্বনাশা ভূমিকম্প—খুশী হতুম। যদি হঠাৎ বজ্রাঘাতে আমার মৃত্যু ঘটতো, দুঃখিত হতুম না। মনে মনে ভাবছিলুম ওই অপমানিতা জননী সকলকে ক্ষমা ক'রে গেলেন, কিন্তু আমি রইলুম আমাদের পরিবারের সকলের বড় শত্রু, চিরদিনের শত্রু!

নণ্টুর মা সকলকে প্রণাম করতে গেল, কিন্তু যাঁরা বয়স্ক তাঁরা সরে দাঁড়িয়ে বললেন, থাক্ আর ছুঁয়ে কাজ নেই মা,—ওখান থেকেই কাজ সারো। আশীর্বাদ করি তোমার সুমতি হোক।

নণ্টুর বাবা এলো অনেক বেলায়। চাষা-ধোপাপাড়ার কোন্ বস্তিতে নাকি একখানা ঘর পাওয়া গেছে। কিন্তু আকাশ ভেঙগে নেমেছে তখন বৃষ্টি। ওরা সেই বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো সপরিবারে পথে দাঁড়িয়ে! কিন্তু তা'তে আমাদের কি এসে যায়! আমাদের বাড়ীর দরজা জানালা সব আগেই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। উত্তেজনার মধ্যে কেউ লক্ষ্য করেনি—পথের একান্তে

দাঁড়িয়ে আমিও ভিজছিলুম বৃষ্টির জলে। শ্রাবণের ধারা বোধ হয় আমারও চোখে ছিল।

যারা সেদিন মারতে গিয়েছিল নন্টুদের, তা'রা সবাই কালক্রমে মহাকালের বিশাল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। হয়ত নন্টুরাও হারিয়েছে! কিন্তু রেখে গেছে যা, তা'র দাম কম নয়। যে-শয়তানী পিশাচীকে পাড়াসুদ্ধ লোকে ধিক্কার দিয়ে গেছে, তা'র মুখখানাই ত' উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ওই অন্ধকারে। পরণে রং-চটা শাড়ী, নধর হাতে কাঁচের চুড়ি, নত মুখের সামনে খোলা রামায়ণ, পাশে অস্ফুট পদ্মের মতো নন্টু ঘুমিয়ে। মাটির পিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের আলোটা জ্বলছে।

আলোটা আজও জ্বলছে! মুখখানা আজও হারায়নি!

*

বাড়ীর বিধবাদের একাদশীর আসরে একদিন বারাকপুর আর নৈহাটির গল্প জমে উঠলো।

বরাহনগর আর বনহুগলী ছাড়িয়ে সেই পথ নাকি আরো অনেক দূর। লাল রংয়ের ঘোড়ার গাড়ী যদি বার-শিমলে থেকে একবার ছাড়ে তবে সারাদিন লাগে সেখানে পেঁছিতে। হাতীবাগান পেরিয়ে যেতে হয়, সেই গণৎকারদের পাড়াটা ছাড়িয়ে। পূর্বদিকে নয়—উল্টোডিঙিগর বন-জঙগলের দিকে গেলে আর কোন পথ নেই; সেখানে গেলে বেলগেছের জলাবিল পেরিয়ে ডাকাতরা হানা দেয়, ঘোড়ার গাড়ী আক্রমণ করে। সুতরাং হাতীবাগান পেরিয়ে সোজা উত্তুরে পথ। শ্যামবাজারের মোড় ছাড়িয়ে গেলে ধূ-ধূ প্রান্তর—সেই পথে সন্ধ্যে হয়ে এলে গা ছম ছম করে। কোথাও কোথাও টিমটিমে তেলের আলো জ্বলে, কোথাও এক আধটি মুড়ি-মুড়কির দোকান, কোথাও বা কাটা কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেরিওয়ালা। তার পরে এগিয়ে যাও, দেখবে শুধু গরু-মহিষের খাটাল, আহিরীদের পাড়া, আর পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর পাশ দিয়ে ঊর্মিলা দিদির শ্বশুরবাড়ী যাবার পথ। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এলে সেই দুর্গম অঞ্চলের দিকে এগোবার মত বুকের পাটা আছে কজনের?

মামা ভয় দেখাতেন। ভাই-বোনদের পিছন দিকে বসে ভয়ে ভয়ে শুনতুম সেই কাহিনী। চারিদিকে দস্যু আর ডাকাত, চারিদিক থেকে ঘিরে আসতো আতঙ্ক নাবালকের চোখে। মামা বলতেন, যাও না সিঁথি আর বরানগর ছাড়িয়ে বনহুগলী, নপাড়া আর পালপাড়া পেরিয়ে পেনেটির দিকে, অমনি বেরিয়ে আসবে বেলঘরের মাঠ পেরিয়ে ডাকাতরা,—আগে খুন করবে গাড়োয়ানকে, ভয় পেয়ে ঘোড়া দুটো পালাবে যেদিকে খুশি,—জনমানব কেউ কোথাও নেই! তারপর পথের মাঝখানে একে একে সবংশে নিধন! তারা তরোয়াল দিয়ে কুচিয়ে কাটে, আর নয়ত ভীমা ভয়ঙ্করী কালীর সামনে নিয়ে বলি দেয়। পেনেটি ছাড়িয়ে যাওয়া কি আর সোজা কথা? কিন্তু যদি যেতে পারো তবেই পাবে খড়দা,—তবেই দর্শন পাবে শ্যামসুন্দরের। সামনে গঙ্গা বইছে কুলুকুলু— চৈত্রমাসে সুখচর উঠেছে জেগে!

লাল রংয়ের ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া হোলো কম, আর তার ঘোড়া দুটো হোলো নিরীহ। তারা ক্লান্ত পায়ে দৌড়য়, খেতে পায় না পেট ভরে—চাবুক মারলেও তাদের গতিবেগ বাড়ে না। সেই গাড়ীতে যাওয়া সুবিধে। কিন্তু সেই গাড়ীতে পেনেটি যাবার দুঃসাহস কারো নেই। যদি যেতেই হয় তবে কালীঘাটে যাওয়াই নিরাপদ।

তীর্থে যাওয়ার গল্প এমনি করেই জমে উঠতো। ত্রিবেণী, ষাঁড়েশ্বরতলা, বর্ধমানের পাগলা কালী, তারকেশ্বর, বেলগেছের ওলাইবিবি, রামরাজাতলা, নবদ্বীপ—কত দেশের কত রকমের কাহিনী।

তারপরে একদিন স্থির হোলো দিদিমারা যাবেন শ্রীক্ষেত্রে। সামনে নতুন বর্ষাকাল,—শ্রীক্ষেত্রে রথের মেলা। সেখানে যেতে হলে রেলগাড়ীতে সারারাত থাকতে হয়। পথে আছে ভদ্রক, ডাকাতেরা সেখানে নাকি লুঠপাট করে। ছোট ছেলেমেয়েরা সেখানে গেলে আর রক্ষে নেই, তাদেরকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় মায়ের কোল থেকে,—নিয়ে যায় একেবারে কোন্ নিরুদ্দেশে। সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। বড় দুর্গম সেই তীর্থ, বিপদভঞ্জন মধুসূদন ছাড়া সেই ভয়ানক পথে আর কেউ নেই।

চুপ করে বসেছিলুম দিদিমার পিছনে আঁচল ধরে। কানাকানিতে শুনতে পেলুম দিদিমারা যাবেন সাত-আটজনে মিলে,—মাও যাবেন সঙ্গে। চম্পটিদের

গিন্নি যাবেন, ঝকোর মা যাবেন, আর যাবেন সেজো মাসিমা। সবাই মিলে বেশ একটি দল। সবাই যাবে শ্রীক্ষেত্রে। ধীরে ধীরে যাবার দিন এগিয়ে এলো।

কিছুদিন আগে আমাদের নেড়ুদা'র সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। কাছাকাছিই তারা থাকতো ভিন্ন বাড়ীতে। মা আর দিদিমা তাদের ওখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, নেড়ু, একে রাখতে পারবে ত? ছেলে কিন্তু বড্ড দুরন্ত!

নেড়ু বললে, ভয় পাচ্ছ কেন, দিদিমা? ও তো আমার এখানেই সারাদিন খেলাধুলো করে। তোমাদের দেরী হবে কদ্দিন?

ধরো না কেন, দিন পনরো। ভদ্রকে যাবো, ভুবনেশ্বরে নামবো,—শ্রীক্ষেত্রেও ধরো পাঁচ ছয় দিন! তুমি ওকে সাবধানে রাখতে পারবে ত?

বৌদিদি এসে আমাকে কাছে টেনে নিল। মা বললেন, ও কিন্তু বড্ড বেয়াড়া, বৌমা। না বলে বেরিয়ে চলে যায়। ওকে চোখে চোখে রেখো।

বৌদিদি বললে, কোনো ভয় নেই, আমি ঠিক রাখতে পারবো, মাসিমা।

দিদিমা বললেন, ওকে রোজ এক পয়সার দই কিনে দিয়ো, আমি পয়সা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বড্ড দুরন্ত ভাই, কোথাও ওকে যেতে দিয়ো না। রাত্তিরে ত মায়ের কাছে ওর শোওয়া অভ্যাস, ওকে তোমাদের কাছেই রেখো, নাৎবৌ।

নেড়ুদা বললে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, আমরা দুজনে ঠিক ওকে রাখতে পারবো।

বহু নিষেধ, বহু উপদেশ এবং বহুতর নির্দেশ দিয়ে নেড়ুদার কাছে আমাকে রেখে ওরা একদিন সেই লাল রংয়ের গাড়ী চড়ে চললো হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। বেলা অপরাহ্ণ, মেঘ করেছিল সেদিন। সেদিন নেড়ুদার বাড়ীর নীচের তলাটা যেন বড় শূন্য মনে হচ্ছিল। অন্ধকার জমে আসছিল আনাচে-কানাচে। ছ্যাকড়া গাড়ীখানার আওয়াজ অনেক দূর গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলুম আমি সদর দরজার পাশে। কিন্তু আমার আরেকটা আমি যেন ছুটে চললুম ওই গাড়ীখানার পিছনে পিছনে! মিত্তিরদের বাড়ীর পাশ কাটিয়ে, চাটুয্যেদের গা ঘেঁসে, অর্জুন মুদির দোকান ছাড়িয়ে, কাঁসারিপাড়ার ভিতর দিয়ে গাড়ীখানা দৌড়চ্ছে, আর আমিও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি যেন তার পিছনে

পিছনে—তবু ধরতে পাচ্ছিনে! ধরবার জন্যেই ছুটি, ধরতে পারবো না জেনেও ছুটতে থাকি।

মা নেই সামনে, সুতরাং পৃথিবীও নেই। আছে শুধু চোখ আর কান, আছে শুধু চেতনা। মা কাছে নেই, তাই নোংরা নর্দমার পাশে আধমরা বিড়ালছানাটার কান্না কানে এসে বাজে, তাই বৌদিদি এসে পিঠের ওপর হাত রাখলে চোখে জল আসে। নীচের তলাটা বড় শূন্য, বড় শূন্য আমার দুটো চোখ। দই কিনে খাই, কিন্তু তার মধ্যে অমৃতের আস্বাদটা যেন মিলিয়ে গেছে। ঘন বর্ষা নেমেছে নীচের তলায়, কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিই নালার জলে, সেই নৌকো চলে যায় কত নদনদী পেরিয়ে ভদ্রক ছাড়িয়ে, ভুবনেশ্বরের পথ দিয়ে—শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রের তীরে তীরে। নালার পথ বেয়ে গেছে নৌকো, বৃষ্টির দিকে আমি চেয়ে থাকি।

নেড়ুদার বিয়ে হয়েছে মাত্র মাস দুই আগে। বৌদিদি এসে ফিটফাট করে ঘরখানা সাজিয়েছে। ঘর ওই একখানি। তার বাইরে একটুখানি রান্নার জায়গা, আর দেওয়ালের একটু আড়ালে তাদের ভাঁড়ার ঘর। সামনেই নালার ধারে কলতলা। জায়গাটুকু খুব সামান্যই, কিন্তু ওরই ভাড়া মাসে ছ'টাকা। নেড়ুদা চাকরী করে উকীলের বাড়ী। মাইনে বুঝি তিরিশ টাকা। সকাল-বেলায় উঠে নেড়ুদা বাজার করে দেয়, বৌদিদি রাঁধতে বসে, আর আমি ফাই-ফরমাস খাটি। নেড়ুদা বেরিয়ে গেলে বৌদিদি সেই যে দরজা বন্ধ করে, আবার খোলে সেই ভর-সন্ধ্যেবেলায়—যখন নেড়ুদা ফিরে আসে আফিস থেকে। দিদিমা যাবার সময় আমার জন্যে পাঁচটি টাকা বৌদিদির আঁচলে বেঁধে দিয়ে গেছেন। রাত্রে আমি শুয়ে থাকি বৌদিদির পাশে। মায়ের কাছে শোওয়া অভ্যাস—সুতরাং ঘুম আসে না।

সকালবেলায় গরম গরম মুড়ি আর জিলিপি, ভাতের পাতে ঘি, বিকালে জলখাবার, রাত্রে পরোটা আর আলুর দম। বৌদিদির হাতে মাছের তরকারী চমৎকার রান্না হয়। তা' ছাড়া সারাদিন এটা-ওটা। তেঁতুলের আচার আছে ঘরে, হাঁড়ির মধ্যে থাকে তিলকুটো। আবার যদি বৌদিদির জন্যে তাম্বুল-বাহার পান এনে দিতে পারি, তবে টক-মিষ্টি লজেন্স উপহার পাই। এত খাওয়া আর এত যত্ন—সত্যি বলতে কি—কোনদিনই বাড়ীতে পাই নি। নেড়ুদা

আমাকে ক্যাম্বিসের বল্ উপহার এনে দিয়েছে। বৌদিদি বলেছে, এবার পুজোর সময় আমাকে সিল্কের জামা কিনে দেবে। ওরা দেখে অবাক হয়েছে, আমি অবাধ্য নই, বাইরে একবারও পা বাড়াইনে, শ্লেট পেন্সিল নিয়ে একমনে আঁক কষি, ফার্ষ্টবুক আর কথামালা মুখস্থ করি এবং বৌদিদির সঙ্গে সমস্ত কাজে লেগে থাকি। ওরা বলে আমি নাকি বদলে গেছি।

নেড়ুদা হাসিমুখে শুধু বলে, বেশী রাত্তির পর্যন্ত জেগে থাকতে নেই কিন্তু। একবার নিশি ডাকলে দেখবি তখন মজা!

নিশি কি?

গাধা কোথাকার! নিশি জানিস নে? তারা আসে মাঝ-রাত্তিরে। জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে নাকি আওয়াজ করে—ছোট ছেলের নাম ধরে ডাকে! ব্যস, জেগে আছিস জানতে পারলেই ডাবের মুখুটি বন্ধ করে দিল! আর যাবি কোথা? তার পিছু পিছু যেতে হবে রাত্তিরে উঠে।

বৌদিদির পাশে আমি ভয়ে ভয়ে সরে বসি। নেড়ুদা বলে, আর রাত জাগবি?

না।

নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়বি ত' আজ থেকে?

হ্যাঁ!

বৌদিদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আমার লক্ষ্মী ঠাকুরপো। আর কোনোদিন জেগে থেকো না, কেমন?

ঘাড় নেড়ে আমি সম্মতি জানাই। বৌদিদি হাসিমুখে উঠে গিয়ে নেড়ুদাকে আসন পেতে খেতে দেয়। দেখতে দেখতেই রাত ঘনিয়ে আসে।

মা-দিদিমার খুঁটি ছিল শক্ত, সেই জন্য আমার চুলের টিকি সারাদিনে দেখা যেতো না। জানতুম যেখানেই থাকি এক সময় আমার ডাক পড়বেই। অনেক দূরে এগিয়ে যেতুম, কিন্তু বিশ্বাস অটুট থাকতো—পিছন থেকে টানবার মানুষ আছে। সেখানে নিশ্চিত জীবন, নিশ্চিন্ত মন। সেখানে শাসনটা ছিল কঠিন বটে, কিন্তু বত্রিশ নাড়ীর দুশ্ছেদ্য বাঁধন ছিল। এখানে যত্ন-সমাদর প্রচুর, পান থেকে চূণ খসে না—কিন্তু এখানে কর্তব্য আর দায়িত্ব। এখানে অবাধ্য হতে ভয় পাই, বাইরে যেতে ভরসা পাইনে। সেখানে বেপরোয়া.

বিপ্লব বাধিয়ে তুললেও মায়ের বুকের মধ্যে আমার নিশ্চিন্ত বাসা ছিল—এখানে বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য প্রচুর পরিমাণে থাকলেও জননীর সর্বক্ষমাশীল হৃদয়টা নেই। সেই কারণে কোনো এক সময় একা পড়ে গেলেই আমার মন আপন মনে কাঁদতে বসে। দিনমানের সমস্ত সময়টায় বৌদিদির সাদর প্রীতির পাহারার মধ্যে বার বার আমার ঘুম এসে পড়তো, কোথাও বসে থাকলে চোখ ঢুলে আসতো—কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুতে গেলে সমস্ত তন্দ্রা যেতো ছুটে, দাদা আর বৌদিদি পাশে থাকলেও আশ্রয় খুঁজে পেতুম না। চোখ বুজে পড়ে থাকতুম নিঃসাড়ে, ঘোলাটে তন্দ্রা দুই চোখের পাতার মধ্যে কিলবিল করে ঘুরতো এবং মাঝে মাঝে আমার চাপা নিঃশ্বাসে কেমন যেন আন্তরিক উৎপীড়নের সংবাদ নিয়ে এক একটা অনিচ্ছুক আওয়াজ গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতো। বিছানাটার ওই বিস্তীর্ণ মরুভূমির বালু আর কাঁকরের মধ্যে শুয়ে সুদীর্ঘ রাত আমাকে কাটাতে হোতো অসহনীয় অস্বস্তিতে।

হঠাৎ একদিন রাত্রে—রাত তখন গভীর—নেড়ুদা আমায় গায়ে সক্রোধে একটা চিমটি কাটলো। তিনটে আঙুল দিয়ে আমার গায়ের চামড়াটা সে এমন মুচড়ে দিল যে, পরদিন সেখানে কালশিরার দাগ ফুটেছিল। অন্ধকারে সে মুখ বিকৃত করে বললে, বদমায়েস, শুয়োর কোথাকার। তোকে না রোজ রোজ ঘুমোতে বলি? ঘুমো বলছি এখনও? কাল থেকে হাতের কাছে বেতগাছটা রেখে দেবো।

অনড় পাথরের মতো আমি পড়ে রইলুম—নিঃশ্বাসটা রুদ্ধ হয়ে রইলো যন্ত্রণায়, কিন্তু একটুও সাড়া না দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইলুম। অনুভব করতে পারি বৌদিদি জেগে রয়েছে। একটু আগে ওদের অতি মিহি আলাপও শুনেছি। বৌদিদি জেগে আছে, অথচ আমার যন্ত্রণায় তাঁর কোনো সমবেদনা নেই, আমার লাঞ্ছনায় তাঁর কোন প্রতিরোধ নেই—এ আশ্চর্য। বুঝতে পারি ঘরের ভিতরকার বীভৎস অন্ধকারের কুণ্ডলীটা যেন বুকফাটা অবরোধে দম আটকে রয়েছে। কিন্তু উপায় নেই, রাত্রি বড় দীর্ঘ—দিনের আলো ফুটতে তখনও অনেক দেরি। বুঝতে পারছিলুম, আমি যতক্ষণ না ঘুমোই—ওরা দুজনে ততক্ষণ অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। আমার শরীর খারাপ হলে ওদের পক্ষে লজ্জার কারণ আছে বৈ কি।

তুচ্ছ

সকালবেলায় সমস্তটা সহজ। মুখ ধুয়ে এসে পড়তে বসবার আগেই বৌদিদির হাতে গরম গরম আলুর চপ আর টাটকা মুড়ি। গত রাত্রে নেড়ুদা আমার জন্যে এনেছিল এক ভাঁড় পানতুয়া—এক বাটি দুধের সঙ্গে দুটো পানতুয়া সেই বয়স অবধি কখনো পাইনি! আমার ন্যায় সুবোধ বালকের চিবুক নেড়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে বৌদিদি বলে, এমন দেওর কজনের ভাগ্যে জোটে! আজ থেকে তোমাকে খুব ভালো গল্প বলবো—শুনতে শুনতে তোমার নাক ডেকে উঠবে—কেমন ভাই?

আমি খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। নেড়ুদার দরুণ কালশিরার দাগটা আমি বৌদিদির দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখি। ওটা দেখলে স্বামীর আচরণে হয়ত সে দুঃখ পাবে।

বৌদিদি আবার রান্নার জায়গায় গিয়ে বসলো। বৃষ্টির জলের ছাটে থৈ থৈ করছে চারিদিক। ঘরটি বাদ দিলে আর কোথাও শুক্‌নো আশ্রয় নেই। সমস্ত রাত ধরে ঘরের বাইরে বড় বড় ইঁদুর আর ছুঁচোর উৎপাত চলে। ঘরের বিছানাটা ত্যাগ ক'রে রাত্রে অন্য কোথাও আশ্রয় নেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

নেড়ুদা বাজার থেকে নিয়ে এলো তরী-তরকারী আর ভাল মাছ, তার সঙ্গে বর্ষাকালের ফল-পাকড়। সঙ্গে নিয়ে এসেছে একখানি সুন্দর টিনের রথ, তালপাতার বাঁশি আর রংচঙে মাটির জগন্নাথ। উৎসাহিত হয়ে এসে বললে, আজ রথযাত্রা রে! এই নে বাঁশি বাজা, রথের ওপর ঠাকুর চড়িয়ে টানগে যা,—কেমন? আজ আমার ছুটি, বিকেলবেলায় তোকে মেলা দেখিয়ে আনবো—যাবি ত আমার সঙ্গে?

যাবো!

নেড়ুদা ঠান্ডা হয়ে বসলো এক জায়গায়। তারপর বললে, আজ এতক্ষণ শ্রীক্ষেত্রে দিদিমা আর মাসিমারা বেশ মজা করে রথটানা দেখছে! ব্যস, উল্টো রথের আগেই ওরা ফিরবে। হিসেব করে দেখো, আর বড় জোর পাঁচ সাত দিন।

শ্লেটের ওপর সাতদিনের অঙ্কটা লিখে চললুম পরম যত্নে। সোমবার থেকে রবিবার, শনিবার থেকে শুক্রবার, বুধবার থেকে মঙ্গলবার। যেদিন থেকেই ধরি, আগের তারিখে এসে সাতটা দিন মিলে যায়। প্রত্যেকটি দিনের সঙ্গে রয়েছে আমার অধীরতা, আমার প্রাণান্তকর পিপাসা,—আমি যেন

শ্বক্‌নো জিব দিয়ে চাটতে থাকি এক একটি তারিখ। আমার জিহ্বার ঘর্ষণে যেন এক একটি তারিখের গায়ে রক্ত ফ্বটে ওঠে।

রথ টানল্বম প্রাণপণে সারাদিন, সেই রথটানার ঘর্ঘরধ্বনি কি পেঁছবে শ্রীক্ষেত্রে? বাঁশি বাজাল্বম, কিন্তু তার সেই বিকৃত বেস্বরো আওয়াজ আমার মর্মছেদনের আর্তনাদ নিয়ে কি পেঁছবে ভদ্রকের পথ দিয়ে ভুবনেশ্বরে? আষাঢ়ের অবেলায় যে বর্ষাধারা আবার নেমে এলো, তা'র মধ্যে মাতৃহারার বিশ্বব্যাপী বেদনা কি চোখের জল ফেলছে না? আজ পর্যন্ত এই প্থিবীতে যত লোক ভাঙ্গা গলায় কেঁদেছে, যত বিচ্ছেদের নিঃশ্বাস পড়েছে, যত সর্বহারা আর বৎসহারার ব্বক ভেঙ্গেছে—তারা যেন সবাই এসে ভিড় করেছে আমার তালপাতার ওই বাঁশিতে।

বাঁশি থামলো। নেড়্বদার সঙ্গে রথের মেলায় গিয়ে কত খেলনা কিনে আনল্বম। নীচের তলায় তখন সন্ধ্যার আলোটা জ্বালিয়ে রান্নাবান্না সেরে বৌদিদি পোষাকী শাড়ী পরে হাসিম্বখে দাঁড়িয়ে। আজ নেড়্বদার ছ্বটি, তাই বৌদিদি পান খেয়েছে, কপালে টিপ পরেছে, পাতা কেটে চুল বেঁধেছে। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বৌদিদি বললে, দাদা কেমন তোমাকে ভালোবাসে, দেখলে ত? ওমা, এত খেল্‌না নিয়ে কি করবে তুমি? দিদিমারা আর মাসিমারা এলে সব খেলা দেখিয়ো, কেমন? তোমাকে সব্বাই ভালোবাসে, না ঠাকুরপো?

ঘাড় নেড়ে বলল্বম, হ্যাঁ।

মা এলে দাদার ভালোবাসার কথা বলবে ত?

বৌদির ম্বখের দিকে তাকাল্বম। বলল্বম, দাদা কিনে দিয়েছে টিনের গাড়ী, ব্বড়ো ঠাকুর্দা, কলের প্বতুল,—এই দ্যাখোনা আরো কত!

বৌদিদি বললে, আমার কথা কি বলবে?

বা রে, তুমি যে দিনরাত আমাকে খাওয়াতে জোর করে? অত কি খাওয়া যায়?

বৌদিদি আমার কথা শ্বনে হাসিখ্বশী ম্বখে নেড়্বদার সঙ্গে ঘরে ঢ্বকলো, তারপর কি যেন চুপি চুপি কথা বলতে লাগলো।

খেয়ে দেয়ে আমিই আগে গেল্বম বিছানায়। ঘ্বমে আমার দ্বই চোখ জড়িয়ে এসেছে, পা দ্বটো টলে পড়ছে। কেউ যদি না ডাকে, কেউ যদি না

থাকে—আমি সাতদিন ধরে ঘুমোতে পারি। কিন্তু বিছানায় ওঠার পর আবার নতুন করে বৃষ্টি নেমে এলো। কতক্ষণ নেড়ুদা আর বৌদিদি ঘরের বাইরে হাসি-তামাসা আর গল্প-গুজব নিয়ে ছিল,—কিন্তু বৃষ্টির ছাটের জন্য তাদেরকে এক সময়ে ঘরের মধ্যে উঠে আসতে হোলো। এই ছোট ঘরটি ছাড়া আর কোথাও পা বাড়াবার উপায় নেই। ঘরের মধ্যে কখন তারা খাওয়া দাওয়া করেছে, কখন তারা সমস্ত কাজকর্ম সেরেছে এবং কখনই বা বিছানায় উঠেছে আমি টের পাইনি। তবু এক সময় আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চুপ করে পড়ে রইলুম অসাড় হয়ে। আমার নিঃশ্বাসের ছন্দটা নষ্ট হতেই বোধ হয় ওদের সন্দেহ হোলো। এক সময় নেড়ুদা একবার মৃদুকণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাকলো। সাড়া দিলুম না। আবার সে ডাকলো। তখনও আমার সাড়া নেই। কিন্তু তিন বারের বার ডাকতেই আমি উত্তর দিলুম, উঁ?

এখনও ঘুমোসনি?

চুপ করে রইলুম। কিন্তু বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগলো।

নেড়ুদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, তোর মতলব কি? কি ভেবেছিস?

বৌদিদি স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি জানতুম, সে ঘুমোয়নি। অন্ধকারে নিজের পায়ের ওপর সে পা ঘষছিল এতক্ষণ,—টের পাচ্ছিলুম। কিন্তু সে সাড়া দিল না। আমিও নেড়ুদা'র কথার কোনো জবাব দিতে পারলুম না।

নেড়ুদা আস্তে আস্তে উঠে মশারীর ভিতর থেকে বেরিয়ে নীচে নামলো, তারপর দেশলাই বার করে পিদিমটা জ্বাললো। তখনও আমি কিছু বুঝতে পারি নি। কিন্তু সে যখন হাত বাড়িয়ে আমার একখানা হাত ধরে হিড় হিড় করে তক্তা থেকে নামালো, আমি তার মুখ দেখে ভয় পেলুম। এ সেই দিনের বেলাকার নেড়ুদা নয়,—এ ক্রোধোন্মত্ত, প্রতিশোধপরায়ণ পৈশাচিক নেড়ুদা! আমি যেন তার সকলের বড় শত্রু, যেন তার পথের কাঁটা, তার জীবনের সব চেয়ে বড় বাধা।

তক্তা থেকে নেমেই দেখি, দপ দপ করছে নেড়ুদার দুটো চোখ। সে দৃষ্টি বিলোল বিহ্বল, রস ও রক্তের আভায় সেই দৃষ্টি অন্ধকারে জন্তুর মতো জ্বলছে। কিন্তু আমাকে কিছু বলবার সময় না দিয়েই ঠাস করে সে আমার গালে এক চড় মারলো। ` মার খেলে আমি সহ্য করতে পারতুম। এ গালে সে

বসালো আর এক চড়—তারপর লাথি মেরে আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে বললে, জুতিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে আসবো, তা জানিস? পাজি, শুয়োর, উল্লুক—

প্রশ্ন করতে পারতুম, রোজ রোজ এমন করে মারছ কেন? এত মারধর সত্ত্বেও বৌদিদি তোমাকে বাধা দেয় না কেন?—কিন্তু একথা উপলব্ধি করতে পারতুম সেদিন—আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া ওদের পক্ষে কঠিন ছিল। একজনের কাছ থেকে সক্রিয় উৎপীড়ন, আর একজনের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রিয় সমর্থন, সুতরাং কোনো রাত্রেই আমার স্নেহের আশ্রয় জুটতো না। কিন্তু আমি প্রশ্ন করিনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মশারীর মধ্যে বৌদিদির ছায়াটা নড়ছে। আমি শুনতে না পাই এমনভাবে ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে—এবার কাছাকাছি হয়েছে দুজনে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ নেড়ুদা আবার বেরিয়ে এলো। আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলুম। কাছে এসে লালচক্ষে সে আমার চুলের মুঠি ধরে আবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, তারপর তক্তার ওপর সজোরে আছড়ে ফেলে দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, রাত বারোটা বাজে, ঘুম নেই এখনো? ইচ্ছে করে বঁটি দিয়ে কেটে ফেলি।

বৌদিদির পাশে আবার চুপ করে পড়ে রইলুম অসাড় হয়ে। জানি বৌদিদিও জেগে আছে, কিন্তু সে সাড়া দিচ্ছে না। নেড়ুদা অত্যন্ত হায়রাণ হয়ে অসীম আক্রোশ আর বিরক্তির সঙ্গে কুলুঙ্গী থেকে একখানা বই টেনে পিদিমের আলোয় পড়তে বসে গেল। বইতে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সে অন্যমনষ্ক হতে চাইছিল। আমার ঘুম না আসা পর্যন্ত সে বই পড়তে চায়।

এক সময় আলো নিবিয়ে সে আবার মশারীর মধ্যে উঠে এলো। হাঁসফাঁস করে তার নিঃশ্বাস পড়ছিল। নির্মল সরকারদের বাড়ীর সেই মস্ত শিকারী কুকুরটা মাংস-ভাত খাবার আগে লালাসিক্ত জিব বার করে এমনি করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

আমি পড়ে রইলুম কাঠের পুতুলের মতো। সমস্ত রাত অবধি পিঠে ব্যথা ধরেছে, পাঁজরে বেদনার কনকনানি লেগেছে, আড়ষ্ট হয়ে এসেছে শরীরের

একাঙ্গ,—কিন্তু নড়িনি। পা ছড়াইনি, হাত সরাইনি, গা ফেরাইনি, মাথা ঘোরাইনি,—অবিচল নিশ্চেতন দেহকে কঠিন কঠোর শাসনে সমস্ত রাত ধরে স্থির করে রেখেছিলুম।

দুজন মানুষই আবার বদ্‌লে যায় দিনের বেলা। তখন সহজ—তখন স্বাভাবিক। আগের রাতটা কারো মনে থাকে না, দিনের বেলায় তার স্মৃতি যেন একান্তই অলীক। কালশিরার দাগ পড়েছে আমার শরীরের অনেক জায়গায়, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়েছে বালিশের ওপর, হাতপাখার আঘাতে রক্ত ফুটেছে এখানে ওখানে। ঘরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে নেড়ুদা বুঝতে পারতো আমি ঘুমোচ্ছি কিনা, বুঝতে পারতো আমার ঘুমের গভীরতা কতখানি। চোখ বুজে আমিও বুঝতে পারতুম, ওরা ইসারায় কথা বলছে, ওরাও আমার নিঃশ্বাসের দিকে কান খাড়া করে বুঝে নিত—চোখ বুজে থাকলেও চোখে আমার ঘুম নেই।

সমস্ত দিনমান ধরে নেড়ুদা ও বৌদিদির সেই অপরিসীম আন্তরিক স্নেহ, কোথাও তার ত্রুটি ছিল না। খেল্‌না স্তূপাকার হয়েছে, ছবির বই এনেছে, এসেছে আমার জন্যে নতুন চটি জুতো! বৌদিদি আমার মাথায় টেরি কেটে দেয়, নেড়ুদা এনে দেয় ঘুড়ি আর লাটাই। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ওদের দুজনকে কাছাকাছি দেখলেই আমি ভয় পাই,—যেমন ভয় পাই সন্ধ্যার আলো জ্বললে, শাঁখ বেজে উঠলে। দিনের বেলায় ওদেরকে চেনা সহজ, রাত্রে ওরা অচেনা,—তখন ওদের চোখ জ্বলে, ওদের ভঙ্গী দেখলে দুর্ভাবনা আসে, ইসারা-ইঙ্গিতে আতঙ্ক জাগে। বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও পালাবার পথ নেই, মুক্তি পাবার উপায় নেই, এড়িয়ে যাবার সুবিধা নেই। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই আমাকে মার খেতে হোতো মুখ বুজে। চীৎকার করে কোনো কোনো মধ্যরাত্রে আমি কাঁদতে পারতুম, কিন্তু আমার সেই ভাঙ্গাগলার আওয়াজ কি শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছবে। অতএব মুখ বুজে আমি পড়ে পড়ে মার খেতুম। মাঝখানে গিয়েছিল এক রবিবার। সেদিন দুপুর বেলায় ঘরে ঢুকে ওরা ভিতর থেকে জানলা দরজা বন্ধ করেছিল। সেদিন আমি ছাড়া পেয়ে নিজের আনন্দে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছিলুম। মনে পড়ছে শুধু সেই রাত্রে আমি কেবল ধমক খেয়েছিলুম, কিন্তু মার খাইনি!

বৌদিদির জ্বর এলো সপ্তাহের শেষ দিকে। গায়ে মাথায় যন্ত্রণা, শীতের কাঁপুনি ধরেছে,—দেখতে দেখতে জ্বরও বেড়েছে। নেড়ুদা শশব্যস্ত। ডাক্তারের কাছে খবর দিয়ে ঔষধ আনলো, নিজের হাতে রান্না করলো, রোগীর সেবায় লেগে গেল,—তারপর কাপড় কাচলো, বাসন মাজলো। সেদিন আমাতে আর নেড়ুদাতে খুব ভাব। আমি তার দক্ষিণ হস্ত। আমি গিয়ে বৌদিদির মাথা টিপে দিলুম, সাগু খাওয়ালুম, পায়ের সেবা করতে বসে গেলুম। রাত্রের দিকে নেড়ুদা মেঝের উপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। আমি শুলুম বৌদিদির পাশে এবং সেদিন ঘুমিয়ে রইলুম অকাতরে। বৌদিদির বদলে যদি নেড়ুদা থাকতো একা বিছানায়—তাহলেও আমি এইভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারতুম।

তিনদিন বৌদিদির বেহুঁস জ্বর ছিল, ওই তিনদিন আমিও বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়েছি। নতুন কালশিরের দাগ আর পড়েনি, নতুন করে বেতের দাগ আর গায়ে ফোটেনি। জ্বর অবস্থায় বৌদিদি আমার ওপর খুশী ছিল না, আমাকে দেখলে সে খিট্ খিট্ করে উঠতো। নেড়ুদা সেই দৃশ্য দেখে বরং একটু লজ্জিতই হোতো। কিন্তু আমি ছিলুম খুশী, পরম খুশী। নিশ্চিন্ত মনে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম। ভাবতুম যতদিন মা-দিদিমা না আসে, ততদিন যেন বৌদিদির জ্বর না ছাড়ে! ততদিন যেন নেড়ুদা মেঝের বিছানায় শুতে বাধ্য হয়!

বৌদিদির জ্বর যেদিন ছাড়লো, ঠিক তার পরের দিন সকালে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পেয়ে ছুটে গেলুম সদর দরজায়। ভুল আমার হয়নি—গাড়ী এসে থামলো আমার সামনে। মা-দিদিমারা এসেছেন। সমস্ত লাঞ্ছনা আর উৎপীড়ন পলকের মধ্যে ভুলে গেল সেই সেদিনকার নাবালক। কোনো দাগ নেই দেহে, কোনো দাগ নেই মনে। দইয়ের মধ্যে ফিরে এলো আবার অমৃতের আস্বাদ; আবার ফিরে এলো বিশ্বাস।

মা শুধু আমার দিকে স্থিরচক্ষে তাকিয়েছিলেন। নেড়ুদা বলতে লাগলো, মাসিমা, ছেলে তোমার একটুও দৌরাত্ম্য করেনি, একটুও অবাধ্য হয়নি,—এমন শান্ত হয়ে ছিল যে, সবাই অবাক।

সমস্ত খেলনাগুলি পড়ে রইলো বিভীষিকার স্মৃতি নিয়ে। দিদিমা পরে

আসছেন। মায়ের সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লুম মামার বাড়ীর দিকে। আনন্দের কান্নাটা অধীর হয়ে উঠছিল দুই ঠোঁটের মধ্যে।

*

দিদিমার বাড়ীর উত্তরদিকে ছিল বহুদূর অবধি খোলার খাপরা আর বস্তিপল্লী। দক্ষিণ দিকে সম্ভ্রান্ত সমাজের পাড়া। ছোটবেলা ওইটুকুই ছিল চেনা জগৎ। ভূগোলে দেখতুম উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত,—চিরদিন বরফে ঢাকা। কিন্তু খৃষ্টানদের গির্জা পেরিয়ে উত্তর দিকে আর আমার দৃষ্টি যেতো না—ওইটেই ছিল উত্তর মেরু। দক্ষিণ মেরুতে ছিল গলির প্রান্তে অর্জুন মুদির দোকান। এই দুইয়ের মাঝখানে আমার বাল্যকাল নিজের মনে জাল বুনে যেতো আমার অজ্ঞাতে। চেতনার মধ্যে পেতুম অনেক, কিন্তু বুদ্ধি আর যুক্তির দ্বারা বিচার করে কিছু পাওয়া যেতো না। উত্তরদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে খোলার খাপরার বস্তিতে দিনরাত্রির নিত্যকলরব লেগে থাকতো। সেখানে পাওয়া যেতো পাল্‌কির বেহারা, কেরোসিন তেলওয়ালা, নাপিত, লোহার কারখানার লোক, তেলকলের মজুর, ঝি-চাকরের বাসা, হাঁড়িমিস্ত্রী, চাঁচাঁড়িবোনা ডোম্, কাওরাগোষ্ঠী, এবং আরো বহুজাতের মেয়ে পুরুষ। তখন ইতর-ভদ্রের পার্থক্য ছিল অনেক বেশী। শুনতুম ওই বিশাল পল্লীতে থাকতো অনেক গাঁটকাটা, সন্ধ্যার পরে অনেক অন্ধকারের মানুষ টলতে টলতে আনাচে কানাচে হানা দিত, অনেক সময়ে শোনা যেতো খুনখারাপির খবর, চুরিদারির সংবাদ। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমি কাঁটা হয়ে থাক্‌তুম।

কিন্তু ওই বস্তির জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে আমাকে বাধ্য হয়ে যেতে হোতো কোন কোনদিন ভর সন্ধ্যায়। ওখানে কোন্ এক ঘরে থাকতো এক অন্ধ জরা-স্থবির বৃদ্ধ—সে জলপড়া জানতো, আবার ওঝার কাজও করতো।

শনিবার অমাবস্যার সন্ধ্যায় তেশূন্যে দাঁড়াতে গিয়ে কা'র ওপর ভর হয়েছে, কোন্ পোয়াতি বউ কোন্ তিথিতে না জেনে পানের বোঁটা ভেঙ্গে খেয়েছে, কোন্ শিশুর গায়ে লেগেছে 'হাওয়া', রাত গভীর হলেই কোন্ মেয়েটা যেন ডরিয়ে ওঠে, নীচের তলায় অন্ধকারে নামতে গিয়ে কে যেন হাউমাউ ক'রে উঠেছে,—প্রাচীন

বাড়ীর জরাজীর্ণ ইঁটকাঠের গন্ধের মধ্যে ব'সে আমি বিশ্বাস করতুম সমস্ত অবাস্তব ঘটনায়। আমাকে যেতে হোতো একঘটি জল আর একটি খড়কে কাঠি নিয়ে সেই অলিগলি বস্তির আঁকাবাঁকা গহ্বরে।

একটি খোলার চালার নীচে এসে দাঁড়াতুম। রেঁড়ির তেলের পিদিম হাতে নিয়ে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক টিপপরা পানখাওয়া মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে বলতো, সেই বাউনদের ছেলেটা। কি হয়েছে?

গলা পরিষ্কার ক'রে বলতুম, হাওয়া লেগেছে!

কা'র?

সেই পাঁচুঠাকুরের দোরধরা ছেলের।

স্ত্রীলোকটি বলে, ঘটিটা রাখো। পয়সা পাঁচটা এনেছ?

হাতের মুঠোর মধ্যে পাঁচটা পয়সা ততক্ষণে গরমে আর ঘামে ভিজে উঠেছে। পাঁচটি পয়সা দাওয়ার ওপর রেখে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়ালুম।

ঘরের ভিতরে ইঁটের পায়া দেওয়া তক্তপোষ মটমট ক'রে উঠলো। ছিমছিমে রেঁড়ির আলোয় দেখতে পাই এক কৃশকায় অন্ধ বৃদ্ধ—নাকটা তা'র মস্ত, হাত দুখানা শুকনো কাঠের বরগার মতো লম্বা; দীর্ঘ দেহযষ্টি—দেওয়াল আর দরজা ধ'রে-ধ'রে আন্দাজে এগিয়ে আসে। চোখ দুটোয় কালো তারা নেই, সবটাই হল্‌দে আর ঘোলাটে। লোকটা ধীরে ধীরে ব'সে পড়ে।

ঘটিটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বুড়ো ধীরে ধীরে দু'একটি ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার পর বীজমন্ত্র আরম্ভ করে। সে মন্ত্রের শব্দ আছে, কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য। সেই মন্ত্রপাঠ চলে বহুক্ষণ,—বিজবিজ করে, ফিসফিস করে, ফুৎকার দেয়, হাত ঘোরায়, আবার এক পর্ব চলে। আমি চেয়ে থাকি শান্ত চক্ষে,—দেশ কাল জরা মৃত্যু ব্যাধি কুসংস্কার,—সমস্তর বাইরে আমার দুই মূঢ় অজ্ঞান আচ্ছন্ন চক্ষু ওর দিকে মেলে থাকি। লোকটা মন্ত্র পড়তে পড়তে এক সময়ে ঘুমিয়ে নাসা-ধ্বনি ক'রে ওঠে, আবার ঘটিটা ধরে শক্ত হাতে। অবশেষে এক সময়ে খড়কে কাঠিটি নিয়ে আলোর দিকে হাত বাড়ায়। সময় বুঝে স্ত্রীলোকটি খড়কের মুখে আলোটা ধ'রে সেটি পুড়িয়ে দেয়, বৃদ্ধ সেই পোড়া কাঠি জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরতেই ছ্যাঁক্ ক'রে ওঠে। এইরূপ তিনবার। তিনবারের পরে সেই

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি বলে, নিয়ে যাও, দু'ঝিনুক খাইয়ে দাও গে।

জামার তলায় সেই ঘটি লুকিয়ে নিয়ে একসময়ে আমি বস্তির থেকে বেরিয়ে আসি। অন্ধকার পেরিয়ে আসি আলোর দিকে, মৃত্যুর থেকে জীবনের প্রান্তে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

সেই জলপড়া শিশুকে খাওয়াবামাত্র অসুখ সারে। শিশু ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলের কাছে—আর একটুও কাঁদে না। দুই ঝিনুক খেতে না খেতেই একেবারে ধন্বন্তরী।

দিদিমা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে বলেন, বুড়ো আছে বলেই সব দিক রক্ষে। নৈলে কি দশাই হোতো ছেলেপুলের।

মামা ছিলেন পাশের ঘরে ঘড়ি সারাবার কাজে ব্যস্ত। চোখ থেকে পরকলার ঠুলিটা নামিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ব'লে ওঠেন, গুষ্ঠির মাথা! তিনবার জলে ফুঁ দিলেই অমনি পেঁচোয় ছাড়ে! কবচ না ধরালে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

দিদিমা চেঁচিয়ে ওঠেন, থাম্ তুই থাম্... ক্ষণে অক্ষণে তুই কথা বলিসনে। নিব্বংশ হলে তুই থাকবি, তোকে যেতে হবে না নিমতলায়?

আমি গেলে রেখে যাবো তোমাদের? ফল্না ভট্চায্যির বাড়ীতে ঘুঘু চরাবো, দারোয়ান ছোটাবো—তবে যাবো।

খবরদার—দিদিমার গলা ঝনঝনিয়ে ওঠে,—মুখ সামলে কথা বলিস। এ বাড়ী তোর নয়, তুই এর মালিক ন'স,—এ বাড়ী স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তি...খবরদার!

মামা গর্জন ক'রে ওঠেন, স্ত্রীধনে কেনা? এলো কোত্থেকে স্ত্রীধন? রমেশ মিত্তিরকে ঘুষ খাইয়ে জাল উইল রেজেষ্টারী হয়নি? হাটে হাঁড়ি ভাঙবো তবে?

দিদিমা বলেন, ভাঙ্, যত হাঁড়ি তোর আছে একে একে ভাঙ্! বড্ড বাড়িয়েছিস তুই! তোর রোজগারে বাড়ী কেনা? তুই টাকা দিয়েছিলি?

মামা বলেন, আর দেরি নেই। সব কাগজ বা'র করেছি। এবার নালিশ ঠুকবো হাইকোর্টে। গরু বাছুরের দল তাড়াবো সব বাড়ী থেকে।

দিদিমা বলেন, তাই করিস। তোর যা ক্ষমতা তাই দেখাস। বাড়ীভাড়ার

সাতটাকা ক'রে তোকে মাসে মাসে দিই তাও বন্ধ করবো চোতমাস থেকে। তোকে আমি পথের 'বেগার' ক'রে তবে ছাড়বো। আ মর, এক তরকারী নুনে পোড়া!

মামা জামা কাপড় প'রে দুম দুম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যান্। যাবার সময় শাসিয়ে বলেন, রাতটা পোয়াক্, দেখবো কাল সকালে! ছুরিখানা ততক্ষণে শান দিয়ে আনি।

মামা চ'লে যেতেন সদর দরজার দিকে। মামী সেই সময়ে চক্ষের নিমেষে এসে দাঁড়াতেন দিদিমার সামনে। বলতেন, দু'আনা পয়সা দিলেই ত' ঝগড়া মিটে যায়।

দিদিমা চোখ পাকিয়ে ওঠেন, কিসের পয়সা? আমার কি কুবেরের ভাঁড়ার আছে?

মামী বলেন, আপিণ্ডের পয়সা নেই, তাই নিত্যি কেলেঙ্কার। আমারও আর সয় না। দু'আনা দিলেই ডাকাত শান্ত হয়।

গালমন্দ কটুকাটব্য ক'রে দিদিমা দু'আনা পয়সা বা'র ক'রে দেন্। মামী সেই পয়সা নিয়ে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হন্। মামা সেখানে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে।

ওই দুআনার পর শানানো ছুরি আবার ভোঁতা হয়ে আসে, জাল উইল প্রমাণিত হয় না; হাইকোর্টে নালিশ ঠোকার প্রয়োজন ক'মে আসে,—এবং তারপর দেখতে দেখতে আবার সাময়িকভাবে সবাই নিরস্ত হয়। খানিক রাত্রে নিমীলিত নেত্রে অত্যন্ত মিষ্টভদ্র মেজাজে মামা ভিন্ন মানুষ হয়ে ফিরে আসেন। সিঁড়ির কাছে আমি আলো দেখাই। তিনি উঠে এসে সস্নেহে বলেন, গুয়োটা, এখনও জেগে আছিস? নে তবে।—এই ব'লে চাদরের ভিতর থেকে শালপাতা মোড়া ছোট একটি আম-সন্দেশ বা'র ক'রে দেন্।

লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ঝোড়ো ময়রার সন্দেশ অনেকবার খেয়েছি, বাড়ীর লোকেরা কেউ জানেনি।

ঘুঘু চরানোর কথায় ঘুঘুর ডাক আমার মনে প'ড়ে যেতো। ঘুঘুর ডাকের মধ্যে হয়ত করুণ কান্নার সুর আছে তাই লোকে ভয় পায়। চৈত্রের দুপুরে

ঝিলিমিলি বেলগাছের ছায়ায় ক্লান্ত কাকের কণ্ঠে একপ্রকার বিকৃত স্বর শোনা যায়,—সেটাও নাকি অলক্ষণে। কিন্তু আমি থাকতুম কান পেতে, আমি শুনতুম ওদের মধ্যে বুকফাটা সঙ্গীত, দুপুরের উদাসী হাওয়া আমার হৃৎপিন্ডকে ছিঁড়ে নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতো।

হঠাৎ নীচের তলায় শোনা যেতো চীৎকার। বেঁকি তা'র কোলের মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কলতলায়।—মর, ম'রে যা—ওলাউঠোয় শেষ হয়ে যা। কেঁদে কেঁদে সেই থেকে—বল দিকি তোমরা—আমার হাড়মাস খেলে। ম'রে যা না? মরতে পারিসনে?—এই ব'লে সে নিজেই নিজের মাথা ঠোকে।

বেঁকির ভালো নাম সরলা। পায়রাটুনিতে তার শ্বশুরবাড়ী। সে চার পাঁচটি ছেলেপুলের মা। সবাই মিলে তাকে ক্ষ্যাপাতো। এ বাড়ীতে বেঁকি এসে প্রায়ই দেওয়ালে মাথা ঠোকে। করোগেটের বাল্‌তি শানের ওপর আছড়ে ভাঙে; আগুন জ্বালিয়ে দেয় ঘরকন্নায়। তা'র উচ্চকণ্ঠের কান্না শুনে প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হয়। পরে দেখা যায় কিছু খেতে পেলেই বেঁকি শান্ত। দিদিমা তাকে ডেকে আড়ালে দুখানা রুটি দিলে সে ভারি খুশী হয়ে খেতো। ছেলেপুলে হলেও স্বাস্থ্য তা'র তখনও ঝরেনি।

বাড়ীতে আসতো এক জামাই, নাম সত্যনারাণ। সে গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী, মাথায় পাগড়ী। একখানা পা তার খোঁড়া,—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে কোথা থেকে যে আসতো আর কোথায় বা চলে যেতো,—আমরা তার হদিস পেতুম না। ওই সন্ন্যাসী একদিন যাচ্ছিল নাকি রাস্তা দিয়ে দুপুরবেলায়। গরাণহাটার কোন্ বাড়ীতে তাকে ডেকে খাইয়ে দাইয়ে খোকনের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পরে বউ আর স্ত্রী নয়,—বরেরও আর প্রয়োজন নেই। জামাইয়ের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলা হয়েছিল, তোমার মহন্ত বাবাজির হাতে এই চাঁদা দিয়ে দিয়ো। তুমি যে মেয়েটার আইবুড়ো নাম ঘুচিয়ে দিয়ে গেলে এজন্য তোমাকে আশীর্বাদ করি।

সত্যনারাণ বললে, কিন্তু আমার বউ?

তোমার বউ তোমারই রইলো। মাঝে মাঝে এসে দেখে যেয়ো?

সেই থেকে সত্যনারাণ আসে বছরে হয়ত বার দুই। তার বউকে সে খুঁজে

বেড়ায় এখানে ওখানে। বড় বউ বেরিয়ে এসে বলে, ভালো আছো সত্যনারাণ? অনেকদিন পরে দেখা।

খোঁড়া সত্যনারাণ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

খাওয়া হয়েছে আজ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

তোমার কি শরীর ভালো নেই?

আজ্ঞে না—

বড়বউ বলেন, কিছু বলতে এসেছিলে বুঝি?

সত্যনারাণ মুখের দিকে তাকায়। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসতো কিনা, আমার ঠিক মনে পড়ে না। তারপর সে মুখ ফিরিয়ে বলতো, আজ্ঞে না।

দিদিমা ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে বলতেন, বাইরে কে এসেছে নাৎবৌ?

বড়বউ চট ক'রে ভিতরে এসে বলতো, না, কেউ নয়। চুড়িওলা!

আমি দাঁড়িয়ে থাকতুম সদর দরজায়। খোঁড়া সত্যনারাণ চ'লে যেতো গলি পেরিয়ে,—আমার মন ছুটতো তা'র পিছু পিছু, তারই সঙ্গে কোন্ অজানা পথে।

খোকনের একঘণ্টার বিয়ের সজ্জা দেখিনি বটে, কিন্তু দেখেছি মামাতো-মাসতুতো ভাইবোনদের বিয়ে। যে ব্যক্তির সঙ্গে দিবারাত্রির জীবনযাত্রা মিলে-মিশে থাকতো—সেই ব্যক্তি বরাভরণ পরে যখন চতুর্দোলায় চ'ড়ে বিয়ে করতে চললো, সেই দৃশ্য আশ্চর্য। ইংরেজী বাজনা চলেছে আগে আগে, আগে আগে চলেছে মাদ্রাজী ফ্লুট। দুধার দিয়ে চলেছে পদাতিক গ্যাসলাইটের সারি হাতে নিয়ে। যাকে দেখেছি অতি পরিচিত ঘরকন্নায় অত্যন্ত আপন মানুষের জায়গায়,—সে আজ সরে দাঁড়ালো সকল সম্পর্কের বাইরে জনসাধারণের মাঝখানে। আলোয়, আমোদে, আনন্দে, কোলাহলে যখন সমস্ত বাড়ীটা মুখর, —আমাকে কে যেন নিয়ে যেতো লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত নিভৃতে,— যেখানে আলো পেঁছিয় না, যেখান থেকে কলরব কোলাহলের রেশ শোনা যায় মাত্র। আমি কিছু একটা ভাবতুম,—সে ভাবনাটা বিচ্ছেদের কি বেদনার, ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত শরীরে সেইখানেই ঘুম আসতো।

তারুদিদি যেদিন কপালে সিঁদুর মেখে প্রবাসী বরের সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো, সেদিন মামা বললেন, যাক্, ঘরের বেড়াল বিদেয় হোলো। বাড়ীটা ঠাণ্ডা।

দিদিমা হেঁকে উঠলেন, কি বললি তুই?

মামা বললেন, বলবো আবার কি! ডালিম গাছের ফুল কাকে নিয়ে গেল। ঢাকি সুদ্ধ বিসর্জন।

আ মর, হেঁয়ালী করতে এলো। যা, গাঁজায় দম দিগে যা।

মামা মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, নাতি নাৎনীদের যে শাঁসসুদ্ধ চেটে খাওয়ালে। দুটো টাকা চাইছি বিয়ের আগের থেকে। সাতশো রাক্কুসির ঘর পেরিয়ে আমার হাতে আর এসে পেঁছয় না।

সাতশো রাক্কুসি তুই কা'কে বললি, ড্যাকরা?

বলছি তোমার গুষ্টিকে।

আমার গুষ্টি। ধোয়া ছাতারে ধুয়ে যাক্ তোর সব। এক কুন্‌কে চালের ভাত ছমাস খা। দুটি চক্ষের মাথা খা।

মামা গর্জন ক'রে বললেন, আমি কিন্তু আবার ছুরিতে শান্ দেবো! ফল্‌না ভট্‌চার্যির টাকায় নাৎনীর বে' হোলো, আমি কি জানিনে কিছু! টাকা আমার চাই, নইলে হাইকোর্ট।

ঘুমের মধ্যে তারুদিদি আসে আমার পাশে। আর আসে সত্যনারাণ চতুর্দোলায় চড়ে। মাথায় টোপর, লাল মখমলের সজ্জা, গলায় গ'ড়ের মালা, কপালে বরচন্দন। তারুদিদিকে সে বিয়ে ক'রে নিয়ে যায় আমার ঘুমের মধ্যে। নিয়ে যায় দূরে,—অনেক দূরে—সকল কোলাহলের বাইরে তা'রা ছুটে যায় ধুলো উড়িয়ে। সামনের পথটা ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার। ঘুমের দেশের দিগন্তে আমার দৃষ্টি আর পেঁছয় না।

ভোরে ঘুম ভাঙলে উঠে যেতুম ছাদে একা একা। কচিদের বাড়ীর ওপারে তখনও সূর্যের আভা দেখা দেয়নি। তখনও কেউ ওঠেনি, এই ছিল কৌতুক। চেয়ে দেখতুম ঠাণ্ডা আকাশে—সেখানে ঊর্মিশ্রেণীর মতো মেঘ,—সেই মেঘ রঙীন হোতো আমার চোখের ওপরে। সূর্য ওঠার আগে নেমে আসতুম।

আগুনের ফিন্‌কি ফুটতো মামার দৈনন্দিন ব্যবহারে। কিন্তু এক একবার জ্বলে উঠতো দাবানল। তাঁর দানবীয় দাপাদাপিতে সপরিবারে গিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আমাদের আশ্রয় নিতে হোতো। সেদিন একবেলা হাঁড়িচড়া বন্ধ। খবর দেওয়া হোতো অক্রুর চাটুয্যেকে।

অক্রুর চাটুয্যের ছিল পিছন দিকে লম্বা শাদা চুলের রাশি, সামনের দিকে পাকা দাড়ি। কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, চোখে চশমা,—স্বাস্থ্যবান দীর্ঘকায় দেহ। চোখ দুটো ভয়াবহ। তিনি এসে হাঁক দিতেন, ভট্‌চায?

মামা অমনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিতেন, হুজুরে হাজির।

চাটুয্যে বললেন, তুই নাকি সেজখুড়িকে আবার জ্বালাচ্ছিস?

মামা বললেন, আর আমি যে জ্বলে পুড়ে গেলুম?

চাটুয্যে হেসে বললেন, কল্‌কের আগুনে পুড়ছিস নাকি? বুড়ো হ'তে চললি, এখনও টাকার জন্যে মা'র সঙ্গে ঝগড়া? হতভাগা, যা আর অশান্তি বাধাসনে। টাকা পাবি!

অক্রুর চাটুয্যের পর আসে গোঁসাইকলু। গোঁসাইকলু আসছে শুনলেই আমরা সবাই লুকিয়ে পড়তুম। তা'র শরীরের ওজন নাকি সাড়ে চার মণ। বয়স কত তা'র আমরা কেউ জানতুম না। একটা পাঁঠা নাকি সে খায় একা,—আটটা মুরগী তা'র জলযোগ। পাঁচসের খাঁটি দুধ। সেই অনুপাতে আর সব খাদ্য। তা'র মাথায় চুল গজায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গে তামাটে রংয়ের লোম। তার গায়ের বর্ণ আর চোয়াল দেখলেই মনে পড়ে জলহস্তীর কথা। এককালে সে নাকি কুস্তির পালোয়ান ছিল। তাকে আসতে দেখলেই পাড়ার কুকুরগুলো ভয়ানক ডাকাডাকি করতো,—যেমন ডাকাডাকি করতো কাবুলীওয়ালাকে দেখে। গুণ্ডা সর্দার গোঁসাইকলুকে সবাই চিনতো।

তার গলার আওয়াজে একপ্রকার ভগ্নস্বর শোনা যেতো। দরজার কাছে এসে গোঁসাইকলু ডাকতো, সেজখুড়ি?

দিদিমা বেরিয়ে আসতেন। অভ্যর্থনা ক'রে বলতেন, এসো বাবা এসো। শরীর ভালো ত?

দিদিমার পিছন দিকে একটি নেংটি ইঁদুর—সে আমি। আমি গোঁসাই কলুর শরীরের দিকে তাকাতুম,—সে দেহের আদি অন্ত নেই। কোথাও কিছু

ঘা, কোথাও হাজা, কোথাও বা কোনো আঁচড়ের দাগ। গালের উপর একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন। কবে নাকি কা'র ছুরির ফলা ঢুকেছিল ওই গালে। বাঁ-পায়ে ছেঁড়াচুলের সঙ্গে কড়ি বাঁধা। সর্বাঙ্গ তেলা-তেলা।

গোঁসাইকলু বললে, শরীর ভালো থাকবে কেমন ক'রে বলো, সেজখুড়ি? খাবার জিনিস কী আক্রা। মানুষ বাঁচবে কি খেয়ে? তিন টাকা মণ চাল, সাড়ে তিন টাকা মণ ডাল। মাংস সাত আনা, দশ পয়সা দুধ, চোদ্দ পয়সা সরষের তেল! একসের ঘি কিনতে গেলে বারো গণ্ডা পয়সা লাগে—খাবো কি?

তোমার শরীর এবার একটু কাহিল দেখছি বাবা।

ডেকেছ কেন, সেজখুড়ি?

দিদিমা কেঁদে বললেন, দস্যিকে নিয়ে আর ত' পারিনে বাবা। প্রাণে মরতে বসেছি।

গোঁসাইকলুর চোখ লাল হয়ে উঠলো। বললে, তুমি দস্যির ভয়ে প্রাণে মরবে, আর আমি বেঁচে থাকবো, সেজখুড়ি? তোমার কর্তার অন্নজল এখনও আমার পেটে আছে তা জানো? কই ডাকো দেখি তোমার সুপুত্তুরকে। ভাবলুম খাঁদাকে পাঠাই, কিন্তু তুমি ডেকেছ,—আমি নিজে না এলে চলবে কেন?

মামা এসে দাঁড়ালেন অন্যদিক থেকে। গোঁসাইকলু বললে, তুমি ভেতরে যাও, সেজখুড়ি—রান্নাবান্না করোগে। আজ দুটি পেসাদ খেয়ে যাবো।

দিদিমা চ'লে গেলেন আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে। আমি তখনও উঁকি মারছি দেখে জলহস্তী করাল চক্ষে একবার আমার দিকে কটাক্ষ করলো। নেংটি ইঁদুর অমনি পালালো ফুড়ুক ক'রে।

মাঝের দরজার ফুটো দিয়ে চেয়ে আছি ওদের দুজনের দিকে। আমাদের নিশ্বাস-রুদ্ধ দৃষ্টি। দেখতে পাচ্ছি মামা গম্ভীর মুখে ভক্ত শিষ্যের মতো ব'সে রয়েছেন গোঁসাইকলুর পায়ের কাছে। একসময়ে গোঁসাইকলু একটি কাগজের মোড়ক বার ক'রে দিয়ে বললে, সাজ এক হাত, ছিলিম আছে?

কোটের পকেট থেকে মামা একটি সরু কল্‌কে বা'র করেন। কাগজের মোড়কে শিকড়সুদ্ধ শুকনো একটা জট। তাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কল্‌কেয় ভ'রে আগুন ধরানো। ময়লা একটুকরো ন্যাকড়া কল্‌কের তলায় জড়িয়ে নিয়ে

আগে গোঁসাইকল্‌ সুদীর্ঘ টান দিল। সেই ধোঁয়া আর সহজে বেরোয় না। সে-ধোঁয়া যেন সেই বিশাল দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য পথ হারালো,—তারপর ঘুরে বেরিয়ে এলো নাকের ভিতর দিয়ে।

মামা টানলেন তারপর। তাঁরও সেই একই ইতিবৃত্ত। এক সময় দপ্‌ ক'রে কল্‌কের মাথাটা জ্ব'লে উঠলো।

গোঁসাইকলু বললে, ভটচায, তোমার দাড়ি পাকলো, এখনও আক্কেল হোলো না?

মামা বললেন, তোমার দিব্যি, মাইরি—আমার কোনো দোষ নেই।

তবে সেজখুড়ি কাঁদেন কেন?

মামা বললেন, জামাই মরেছে তাই কাঁদে।

তুই ঝগড়া করিস?

রাম বলো!—মামা আবার কল্‌কেয় টান দেন্‌। তাঁর কণ্ঠে যেন মাধুর্য ফুটে ওঠে।

গোঁসাইকলু বলে, ঘড়ির কাজ করিস! কত পাস?

আট দশ টাকা হয়।

তবে আবার ঝগড়া কিসের? বেশ ত' চলে!

মামা বললেন, দশ টাকায় কি হয় আজকাল?

না হয় আমাদের কাছে নিবি। মাকে জ্বালাস কেন?

মামা যেন এবার একটু সহাস্য মুখে বলেন, অল্পে সুখ নেই, ভাইরে!

গোঁসাইকলু বললে, বেশী পেলেও সুখ নেই। তুই ত' বড়লোকের ছেলে ছিলি। পাঁচটা মেয়েছেলে রেখে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারতিস। লেখাপড়া শিখতে গিয়েই ত' মাটি করলি,—যত কুবুদ্ধি ঢুকলো মাথায়।—এই নে, টাকা পাঁচটা রেখে দে। আপিঙের চেয়ে গাঁজা ভালো, মনে রাখিস। আর ঝগড়া করবি?

মামা বললেন, না।

আর আমাকে আসতে হবে না ত?

না।

নে, হাতখানা ধর—উঠে দাঁড়াই।

মামার সাহায্যে গোঁসাইকল্ম সেদিনকার মতো উঠে দাঁড়ালো। আমরা বুঝে নিলুম, আগামী মাস-খানেকের জন্য এবাড়ীতে শান্তি বিরাজ করবে।

পথে নেমে গোঁসাইকলু বললে, সেজখুড়ির পাতের চারটি পেসাদ আমাকে পোঁছে দিবি। জগৎজননী মা আমার! খবরদার ভট্চায, এবার বাঁদরামি করলে তোকে আর আস্ত রাখবো না।

মামা আপাতত বললেন, যে আজ্ঞে।

সরলার কাহিনীটুকু কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি।—

পায়রাটুনি নামক পল্লীটি নাকি কলকাতার কোন্ পূর্ব প্রান্তে। বাগমারী আর কাঁকুড়গাছি ছাড়িয়ে নাকি সেই বস্তি। আমরা সেখানে কখনো যাইনি, কিন্তু সেখানে সেই বস্তির ধারে কোন্ সরকারী জলের কলের পাশ দিয়ে আর নর্দমার ধার দিয়ে গেলে পাওয়া যেতো সরলার শ্বশুরবাড়ী। দুখানা করোগেটের ঘরে নাকি থাকতো লক্ষ্মীবাবু, আর কাজ করতো উল্টোডিঙির তেলের কলে। মাইনে ছিল পঁচিশ টাকা। দুটাকা যেতো ঘর ভাড়া আর একটাকা লক্ষ্মীবাবুর পকেট খরচা। বাকি বাইশ টাকায় পাঁচটি ছেলেমেয়ে সুদ্ধ পরিবার নিয়ে দিব্যি সংসার চ'লে যেতো। ধার দেনা ছিল না।

সেই সরলা হঠাৎ আবার একদিন বিধবা হয়ে দিদিমার সামনে এসে দাঁড়ালো। কোলের সেই দেড় বছরের মেয়েটাকে সে সঙ্গে এনেছে, ওপরের ছেলেমেয়েগুলোকে রেখে এসেছে দেওরের কাছে। দেওর নাকি নিঃসন্তান। সরলার মস্ত বড় দাঁতের পাটিটা প্রায়ই থাকে মুখের বাইরে, এবং জিবটা একটু বেশী রকম লম্বা ব'লে বাইরে বেরিয়ে আসে। তাকে দেখলে কালীঘাটের করালবদনী কালীকে মনে পড়ে যেতো।

এ বাড়ীতে সরলার পূর্ব পরিচয়টা খুব গৌরবের ছিল না, সেই জন্য সে যখন সদ্য বিধবা হয়ে এসে দাঁড়ালো, তখন অল্পস্বল্প চোখের জল ফেললো এ বাড়ীর বিধবারা। আর সবাই এদিক ওদিক মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে আড়ালে আবডালে স'রে গেল। দিদিমা মিনিট খানেকের জন্য কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু কান্নার চেয়ে তাঁর গলার আওয়াজটা ছিল বড়, এবং আন্তরিকতার চেয়ে লৌকিকতা ছিল বেশী। তিনি ক্ষেদোক্তি ক'রে একবার বললেন,

আবাগি, নাৎজামাইটাকে খেয়ে এলি, শাঁখা সিঁদুর নিয়ে নিজে তুই যেতে পারলিনে?

সরলার সেই পূর্বপরিচিত ঝঙ্কার শোনা গেল,—তোমরা বাপু সবাই মিলে বড্ড আমার মরণ ডাকো! মরেছে তা আমি কি করবো? আমি মেরেছি? দুটো পয়সা মুড়কি খেতে চাইলে হাত তুলে দেয়নি কখনো! অমন মানুষ থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি?

মামা চীৎকার ক'রে বললেন, আমি পারবো না! পাঁচ ছ'টাকা যা আমার রোজগার তা'তে আমারই চলে না। আমি পারবো না বিধবা পুষতে!

দিদিমা হুঙ্কার দিলেন, গরুবাছুর তবে কি আমার গোয়ালে ঢুকলো? তোদের মতলবটা কি শুনি?

আর সবাই চুপ। সরলা ঢুকলো দিদিমার হেঁসেলে। কোলের মেয়েটার নাম বুনি। সে খায় যত, কাঁদে তার চেয়ে অনেক বেশী। মাথায় তখনও চুল হয়নি, দেড় বছরের জীবনে আজও জামা ওঠেনি গায়ে। চেহারাটা কদাকার, চোখ দুটো ছোট ছোট।

সরলার দাদা বললে, চোদ্দটি টাকা আমার মাইনে। আমি এর থেকে দেবো কেমন ক'রে? একখানা থান কাপড়ের দাম দশ বারো আনা—দেবো কোত্থেকে?

দিদিমা বললেন, কেউ কিছু না দিলে ওকি ভিক্ষে করতে বেরোবে?

দাদা বললে, চাষাভুষোরা ভিক্ষে করে না, বামুন কায়েতের বিধবারাই হাত পাতে! যাক্ না কেন আনন্দময়ীতলায়, সেখানে আঁচল পেতে বসুকগে।

পিছন থেকে সরলা চেঁচিয়ে ওঠে, মুখ সামলে কথা বলিস! তোর খাই না পরি? বোন ব'লে দুটো মিষ্টি হাতে দিয়েছিস কখনো? বিধবা হয়ে এলুম, একবেলা হবিষ্যি করতে ডেকেছিস?

দাদা গা ঢাকা দেয়।

দিদিমাই অবশেষে সরলার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বললেন, ঘরকন্নায় এসে ঢুকেছ, বেশ—খেটে খাও। কুট্‌নো বাট্‌না, বাসন মাজা, ঘর ধোয়া, কাপড় কাচা—আজ থেকে সব করবি। একবেলা দুটি ক'রে খাবি আর ওই বারান্দায় প'ড়ে থাকবি। বছরের চার খানা কাপড় আর একখানা গামছা!

মামা বললেন, কোলের মেয়েটার কি দশা হবে?

দিদিমা বললেন, পাত কুড়িয়ে এঁটো কাঁটা খেয়ে মানুষ হবে। আর আমি কি করবো?

নীচের তলায় হঠাৎ দুমদুম ক'রে শব্দ আরম্ভ হোলো। ঠিক তারই সঙ্গে সরলার চীৎকার।—মর্ না, মর্ না তুই, তোর জন্যেই ত' হাড়ে-নাড়ে জ্ব'লে পু'ড়ে যাচ্ছি! মর, ওলাউঠোয় মর্!

শিশুসন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের শাসন সেটা নয়—সে যেন ভিন্ন চেহারা। প্রহারের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে কেউ কেউ নীচে কলতলায় এসে উঁকি মারতো। কলতলায় থৈ থৈকার এঁটোকাঁটা আর নোংরা বাসনের মাঝখানে বুনি ব'সে ব'সে কি যেন মুখে তুলছে, এবং সরলা বিনা নোটিশে মেয়েটার বিনা অপরাধে হঠাৎ তা'র ওপর হিংস্র প্রহার আরম্ভ করেছে। আঘাত খেতো সে বাইরের থেকে, বিক্ষোভ দাহন জমে উঠতো তা'র মনে—আর সুবিধামতো তারই প্রতিশোধ তোলে মেয়েটার ওপর। মেয়েটাও তেমনি। মার খেয়ে সহজে আর কাঁদেনা, মুখের একপ্রকার শব্দ করে। কেন্নোর গায়ে টোক্কা মারলে সেটা যেমন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, মেয়েটাও ঠিক সেই ভঙ্গীতে গুটিয়ে থাকে। যত মারো লাগে না তার। মাঝে মাঝে আমরা ওই মেয়েটার ছোট ছোট চোখ দুটোর ভিতর চেয়ে দেখতুম। শিশু-মেয়ে বটে, কিন্তু চোখ দুটোর বয়স যেন অনেক বেশী। ও যেন সব জানে, শুধু কথা বলে না। ও যেন মানুষের নোংরামি, ধূর্ততা, অসাধুতা—সব বোঝে। কিন্তু কথা বললে পাছে সবাই ভয় পায়, তাই চোখ দিয়ে কথা বলে। সবাই বলতো পেঁচোয় পাওয়া মেয়ে—ওর কাছে কেউ একলা থাকে না যেন। কেউ কেউ বলে, মেয়েটা একলা থাকলে নিজের মনে ফিস ফিস ক'রে কা'র সঙ্গে যেন কথা কয়, ও নাকি অন্ধকারে মাঝের সিঁড়িতে নেমে ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে ও-বাড়ীর জনশূন্য কলতলাটার দিকে চেয়ে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা ছমছমিয়ে আসে। বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা ওকে দেখলেই পালায়।

একাদশীর কাছাকাছি তিথি এলেই বাড়ীতে কেমন একপ্রকার আড়ষ্টতা দেখা দিত। একদশীর দিন সরলা কোনো কাজ করতে চাইতো না, এবং তাই নিয়ে দেখা দিত অশান্তি। বেলতলার ছাদের এক কোণে গিয়ে সরলা বুনিকে

সামনে বসিয়ে নিজে ব'সে থাকতো গুম হয়ে। কা'রো কথা বলবার সাহস হোতো না। আশ্চর্য করতো ওই বুনি—ওই দেড় বছরের মেয়েটা। ওই মেয়েটাও একাদশী করতে বাধ্য হোতো মায়ের সঙ্গে। সরলা অপেক্ষা করতো মেয়েটা কাঁদবে কতক্ষণে। মেয়েটা সহজে কাঁদতো না, কেননা সে জানে কাঁদলেই তা'র ওপর মায়ের অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ। সে-আক্রমণ বাৎসল্য অথবা স্নেহের কোনো তোয়াক্কা রাখতো না, সেই আক্রমণে সন্তানের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যেতো না। বাইশ চব্বিশ বছরের নারীর বলিষ্ঠ বাহুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটা কাঁদতো না, ঠকঠক ক'রে কাঁপতো। মেয়েটার মুখে ভাষা নেই, চোখে কান্না নেই—কিন্তু তা'র আচরণে থাকতো কেমন একটা আবেদন, সে-আবেদন ক্ষুধার আর তৃষ্ণার। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হয়ে যেতো—বুনি ব'সে আছে সরলার পায়ের কাছে। কখনো ঘুমিয়ে পড়েছে, কখনো বা জেগে নেড়ি কুকুরের মতো মাথা ঘষছে ধুলোয়। ক্ষুধাটাকে জানানো চাই, জানানো চাই মনুষ্যত্বের দরবারে মৃদু অভিযোগ।

অভিযোগ! দড়াম ক'রে এক চাপড় পড়তো বুনির পিঠের ওপর। লুকিয়ে দেখে আসতুম, কচি পিঠের ওপর পাঁচটি আঙুলের দাগ। সরলা সবাইকে শুনিয়ে গলা উঁচিয়ে বলতো, মলো যা—রাত-দিন ক্ষিধে! কে আছে তোর যে, পেটপুরে খাওয়াবে? মর্, পা চাটছে দেখো তখন থেকে!

মেয়েটা অমনি কুঁকড়ে প'ড়ে থাকতো পায়ের তলায়।

অপরাহ্ণের দিকটায় অসহ্য হোতো সকলের। দিদিমা বেরিয়ে এসে বলতেন, এক বাড়ী লোক থাকতে তুই কি স্ত্রীহত্যে করবি, আবাগি?

এই সুযোগটাই সরলার দরকার ছিল। নিস্তব্ধ বাড়ীটা তা'র কণ্ঠস্বরের ঝনঝনানিতে কেঁপে উঠতো। বলতো, ওই ওর জাতের স্বভাব, কেবল খাবো! হাড় খাবো, মাস খাবো! কে খাওয়াবে শুনি? তার চেয়ে ম'রে যাক্ না!

তাই ব'লে তুই ওকে খেতে দিবিনে, হতভাগি?

কথায় কথায় বিবাদটা প্রচণ্ড চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। মেয়েপুরুষ ছুটে আসে। কেউ আনে লাঠিঠ্যাঙা, তামাকের টিকে ধরাবার চিম্‌টে হাতে নিয়ে মামা আসরে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আর সরলা ছুটে গিয়ে মাছ কোটার বঁটিখানা তু'লে নিয়ে আসে। বাড়ী কম্পমান, পাড়াঘরের দরজা জানালা খুলে যায়।

আকাশের দেবতারা ভয়াকুল, রণরঙ্গিনীর নাচনের দাপাদাপিতে সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যাবে। এই অবসরে কে যেন হঠাৎ পিছন থেকে এসে বুনিটাকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে পালায়। মেয়েটার সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, তেলাতেলা, অথচ কালোর ওপরে কেমন চিক্কন, পিচ্ছিল। গায়ে হাত দিলে হাতখানা ধুয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। মেয়েটা কথা বলতে শেখেনি, হাসতেও শেখেনি। কেবল আছে তা'র চাহনি, সে চাহনি অর্থপূর্ণ।

কিন্তু মায়ের হাত থেকে নিয়ে কতদূরে পালানো যায়? আঁসবঁটি হাতে নিয়ে সরলা তখনই ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, আমার মেয়ে কই! কোথায় আমার মেয়ে? শিগগির ফিরিয়ে দাও বলছি—নৈলে—

অস্ত্র হাতে নিয়ে রক্ত চক্ষে সরলা এদিক ওদিক তাকায়। অবশেষে দাদা এসে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে বঁটিখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। মামী এসে দিয়ে যায় বুনিকে ওর পায়ের কাছে। তার পরের দৃশ্যটা বীভৎস। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে বুনির ওপর। বুনি মুখের শব্দ করে আর কাঁপে। সরলা তাকে ওপরের সিঁড়ি থেকে নীচের দিকে লাথি মেরে গড়িয়ে দেয়। এক তাল জীবন্ত মাংসপিণ্ড সিঁড়ির ধাপে ধাপে চোট খেয়ে খেয়ে মাঝের বড় সিঁড়িতে গিয়ে পড়ে। বড় সিঁড়িতে প'ড়ে বুনি কাঁদে না, উপর দিকে তাকায়। মাথাটা বা'র বা'র ঠুকেছে বটে, কিন্তু এটুকুতে তা'র কিছু হয় না!

দিদিমা সমস্তটা লক্ষ্য ক'রে বললেন, হুঁ। বুঝতে পেরেছি সব। পাপ-পুণ্যি যা হয় ওর হবে, আমার কি? সরলাকে এখন থেকে আর একাদশীর উপবাস করতে হবে না!

সেই দিনই সন্ধ্যার পর দেখা গেল, বেলতলার ছাদের অন্ধকারে এক কাঁসি ভাত নিয়ে বসেছে সরলা এবং মায়ের পাশে ব'সে বুনিও টাউ টাউ ক'রে পান্তাভাত আর নুন গিলছে।

শ্রাবণের বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ঘিরে। বেলাবেলি কাজ সেরে সবাই উঠেছে ঘরে। কিন্তু সরলা কোথায়? তা'কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? অবশেষে কে যেন তেতলার ছাদে গিয়ে আড়াল থেকে দেখলো, সরলা নুন দিয়ে পাকা তেঁতুলের গাঁট চুষছে অসীম তৃপ্তিতে আর ছোট মেয়েটা ছাদের ঠিক মাঝখানটিতে ব'সে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় হাবুডুবু খাচ্ছে। মেয়েটোর

আপত্তি নেই, প্রতিবাদ নেই, কোন কাতরোক্তি নেই,—সে জানে, এমনি ক'রে জলে ভেজাটাই হোলো তা'র মায়ের ইচ্ছা।—তারও হাতের মুঠোর মধ্যে তেঁতুলের একটা গাঁট। তবু ত' খাদ্য, তবু ত' এটা তা'র মায়ের বদান্যতা! মেয়েটা বোধ হয় ওতেই খুশী।

সেজমাসিমা বলেন, ডাইনী আবার তাকায় কেমন ক'রে দ্যাখো মা। শ্যাওড়া গাছের তলায় বসিয়ে দিয়ে এলেই হয়। মেয়েটা জাত স্যায়না।

শ্যাওড়া গাছ পাড়ায় কোথাও ছিল না। কিন্তু সরলা ওকে নিয়ে গিয়ে বসায় তেশূন্যে—যেখানে খোলা আকাশ। কার্তিক মাসের রাত্রে হিম পড়ছে—সেই ঠাণ্ডায় সরলা ওকে খোলা জায়গায় ঘুম পাড়ায়। প্রহারের আতঙ্কে বুনি সেই অন্ধকার ছাদের মেঝের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ে। নিজে গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে সরলা সেখান থেকে উঠে আসে। খানিক রাতে যদি কখনো মেয়েটার খোঁজ পড়ে, অমনি ফোঁস ক'রে ওঠে সরলা,—তোমাদের অত মাথা-ব্যথা কেন বলো দিকি? আমাকে না খোঁটা দিলে তোমাদের চলে না, কেমন?

কেউ হয়ত বললে, এই ঠাণ্ডায় মেয়েটাকে কোথায় শোয়ালি বল্ না কেন?

সরলা পাড়া মাথায় ক'রে বলে, ভারি দরদ! মা'র পোড়ে না পোড়ে মাসির,—তোমাদের ঘাড়ে ত' আর চাপাইনি। আমার ছাগল আমি ল্যাজে কাটবো।

আর কেউ কথা বলতে সাহস করে না। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে সরলা নিজেই উঠে পা টিপে টিপে গিয়ে পূবদিকের ছাদে উঁকি মারে। রাত জেগে আমরা দেখতুম সরলার গতিবিধি। মেয়েটা ঠাণ্ডায় জমে চর্বির ডেলার মতো উঠে অন্ধকারে ব'সে ঢুলছে। সেই দৃশ্য দেখে সরলা হঠাৎ আগুন হয়ে উঠতো। কাছে গিয়ে সে কি করতো দেখতে পেতুম না, কিন্তু বুনি ডুক্‌রে কেঁদে উঠে ছটফট করতো। তখন চীৎকার পাড়তো সরলা,— এক ফোঁটা ঘুমোতে দেবে না এমন হারামজাদি মেয়ে। সেই থেকে শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর! কোত্থেকে ওকে সারারাত খেতে দিই বলো দিকি তোমরা? মর মর—নিপাত যা—

বেদম প্রহারে মেয়েটার বোধ হয় ভালোই হোতো। গরম হয়ে উঠতো তাঁ'র ছোট্ট দেহটুকু। ঢুলতে ঢুলতেই মেয়েটা মুখের শব্দ করে। দিদিমা আর থাকতে না পেরে এক সময়ে বলেন, দুখানা রুটি আছে কুলুঙ্গিতে, মেয়েটাকে খাওয়াবি না?—এই নে দেশালাই, পিদিমটা আগে জ্বাল্!

সরলা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বলে, আলো আর দরকার নেই, দেখে নিতে পারবো।—এই ব'লে মেয়েটাকে নিয়ে সে ছোট ঘরের দিকে চ'লে যায়। কুলুঙ্গি থেকে রুটি বা'র করতে তা'র এক মুহূর্তও দেরী লাগে না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে মেয়েটাকে নিয়ে আবার ফিরে আসে। সবাই তখন নিদ্রিত। দিদিমা প্রশ্ন করেন, খাওয়ালি?

অসীম তৃপ্তির সঙ্গে সরলা বলে, সে আর বলতে? রুটি ছিঁড়তে তর সয়না,—বলবো কি, একেবারে টাউ টাউ ক'রে খেলে! সাতজন্মে যেন খায়নি কিছু! একটু তরকারি থাকলে চেটে খেতো!

বুনি তখনো মুখের শব্দ করছে। দিদিমা বললেন, পেট ভ'রে খেয়ে আবার কাঁদে কেন তবে?

সরলা ঠনাৎ ক'রে মেয়েটার কপালে এক ঘা মারলো। তারপর বললে, শুয়োরের পেট যে, ওতে কি আর ভরে? বলে, জাতস্বভাবে কাড়ে রা!

মেয়েটা কথা বলতে শেখেনি, তাই মুখের শব্দ করে মাত্র। তা'র সেই অন্তর্ভেদী আওয়াজ অন্ধকারে আমাদের কানে যেতো। আমরা নিশ্চেতন পাথরের মতো প'ড়ে থাকতুম।

মামীর ঘর ছিল এক কোণে। কিন্তু তাঁর চোখ কান ছিল অত্যন্ত প্রখর। রাত্রে ইঁদুরের পায়ের শব্দও তিনি টের পেতেন। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে তিনি ধড়মড় ক'রে উঠে এলেন। পৌষ মাসের প্রচণ্ড শীতে সবাই লেপের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মামী হাউমাউ ক'রে উঠলেন, তোমরা সবাই ওঠো, সবাই শোনো—সরলার মতলব কিন্তু ভালো নয়!

ভীত ত্রস্ত হয়ে সবাই উঠে পড়লো। রাত তখনো ভোর হয়নি। মামী কাঁপতে কাঁপতে বললেন, নীচে গিয়ে দ্যাখোগে, মেয়েটাকে গলা অবধি চৌবাচ্ছার জলে ডুবিয়ে রেখেছে—তোমরা পুলিশ ডেকে আনো! পেটের মেয়েকে এমনি ক'রে মারবে আর কেউ কিছু বলবে না? শেষকালে সকলের হাতে দড়ি পড়বে যে!

রাত শেষ হবার আগেই সেদিন বাড়ীতে আগুন জ্ব'লে উঠলো।

*

সেই আগুনের লেলিহান শিখা অনেকদিন পর্যন্ত দাউ দাউ ক'রে জ্বলেছিল। সেই আগুনে পুড়েছে নারীধর্ম, পুড়েছে বৈধব্যের বিধি নিষেধ, পুড়েছে নিষ্ঠা ও সংস্কার। অবশেষে সেই আগুন থেকে যে-চিতা রচনা করা হয়েছিল সেই চিতায় পুড়েছিল সরলা। সরলা মারা গিয়েছিল ওলাউঠায়!

আর বুনি? মায়ের মৃত্যুর পরেও সে বেঁচেছিল কিছুকাল। তা'কে পায়রাটুনির বাড়ীতে রেখে আসা হয়েছিল। তা'র ভাষা ছিল না, ছিল মুখের শব্দ। সে নাকি ব'সে থাকতো কলতলায়, শুধু জল খেতো। কতদিন ধ'রে জল খেয়েও তা'র তৃষ্ণা মেটেনি, বলা কঠিন। কেউ বলে, তাকে নাকি শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। হয়ত খবরটা সত্য, কেন না হত্যা ছাড়া আর কোনো উপায়ে তা'র মৃত্যু ছিল না।

*

ভটচার্যি বাগানের ওই পাড়ার চাটুয্যে গিন্নি যেদিন কপালে সিঁদুর এবং হাতের নোয়া নিয়ে মারা গেলেন, কেবলমাত্র সেইদিনই জানতে পারলুম তিনি পুণ্যবতী, দানশীলা এবং ধর্মপরায়ণ মহিলা ছিলেন।

আমি তখন নিতান্তই নাবালক। চাটুয্যেদের বাড়ীতে একটি সমবয়সী বালক ছিল আমার খেলার সাথী। কিন্তু ও-বাড়ীর গিন্নির হাঁকডাক, কর্কশ চেহারা এবং অতিশয় কলহ-কোলাহলের জন্য চাটুয্যেবাড়ীর জানালা দিয়ে ভিতর দিকে উঁকি মারারও সাহস আমার হোতো না। তাঁর মুখের ভাষা ছিল নোংরা, এবং তারও চেয়ে নোংরা ছিল বাড়ীর ঝি চাকরের প্রতি তাঁর আচরণ। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে আমাকে অনেক সময়ে অতি সন্তর্পণে এবং অতি দ্রুত আনাগোনা করতে হোতো।

চাটুয্যে গিন্নির মারা যাবার দিন পাড়ায় পাড়ায় অশ্রুর বন্যা বইতে লাগলো। তিনি পুণ্যবতী—কেননা নিরীহ স্বামীটি তাঁর আঁচলে বাঁধা ছিল; অর্থাৎ সাতচড়েও স্বামীর রা ছিল না মুখে। তিনি দানশীলা—যেহেতু উচ্চকণ্ঠে ভিখারীদের বাপান্ত না ক'রে একমুঠো ভিক্ষা দিতেন না। তাঁর দরজায় ভিখারী এলেই হাঁকডাকে পাড়ার লোক হোতো তটস্থ। এ ছাড়াও নাকি তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। তা'র মানে কপালে চওড়া সিঁদুর মেখে

কস্তাপেড়ে শাড়ী প'রে কমণ্ডল্ু হাতে ক'রে পাড়ার ঠানদি আর রাঙগাদিকে সঙেগ নিয়ে গঙগাস্নানে যেতেন নিমতলার ঘাটে। পথে আনন্দময়ীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে ঠন্ ক'রে সকলের মাঝখান দিয়ে আনি-দ্ু'য়ানি ফেলে দিতেন শ্বেত-পাথরের মেঝের উপর, সেটা অহঙকারের ট্ুকরোর মতো গড়িয়ে যেতো মা আনন্দময়ীর পায়ের কাছে। সবাই ম্ুখ চাওয়াচায়ি করে বলতো, আহা, তা হবে না? বড় ঘরের বউ যে!

এ হেন চাট্ুয্যে গিন্নির গঙগাযাত্রা দেখে আমি পর্যন্ত কেঁদে ভাসাল্ুম। কান্না হোলো ছোঁয়াচে। সেকালের মাতৃভক্ত ছেলে অথবা পত্নীভক্ত স্বামীরা মৃতদেহকে শ্মশানে শ্ুইয়ে এত ফটোও তুলতো না, অথবা জ্বালানি কাঠ কেনা ম্ুলতুবী রেখে খবরের কাগজে খবরটি ছাপতেও ছ্ুটতো না। মৃতব্যক্তির স্ুখ্যাতিটা পাড়ার সমাজের মধ্যে কিছ্ুকাল চাল্ু থাকলেই সবাই স্ুখী হোতো।

যাই হোক, মৃত্যুর পরে দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন চললো। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মণ বোষ্টমকে দ্ুহাতে দান, অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের সেবা,—পাড়ায় পাড়ায় ল্ুব্ধ ব্যক্তিরা ওৎ পেতে বসে রইলো। সকালে সভারোহন, কীর্তন, পাঁচালী আর কথকতার আসর। স্ুন্দরী সালঙকারা বেদানাবালা দাসী এলেন মহাসমারোহে। চিকের আড়ালে সব পাড়ার বৌঝিরা ব'সে গেল। ও পাড়ার অথর্ব বিহারী ভটচার্যি এলেন পাল্কীতে চ'ড়ে। মস্ত ঘটা চাট্ুয্যে বাড়ীতে। পাড়ায় পাড়ায় ধন্য ধন্য রব।

সকল পর্ব শেষ হবার পর বাকি রইলো কাঙগালী ভোজন। কাঙগালী ভোজন সেই প্রথম দেখল্ুম। চাট্ুয্যেরা নাকি বেশী পারবে না—মাত্র দ্ু'হাজার কাঙগালী-ভোজন করাবে। দ্ুই হাজার সংখ্যাটা কত, সেদিন অতটা ব্ুঝিনি। কিন্তু মনে হয়েছিল অনেক। শোনা গেল কাঙগালীদের সর্দার যেন কোথায় থাকে, তাকে খবর দিলেই অম্ুক তারিখে অত সংখ্যক কাঙগালীকে পাওয়া যাবে। কলকাতায় দেখতুম ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ,—কেউ তা'রা মধ্যবিত্ত, কেউ স্বল্পবিত্ত,—কেউ বা ধনী। কিন্তু কাঙগালীরা থাকে কোথায় জানতুম না; এও জানতুম না খবর পাবামাত্রই তা'রা কোন্ গহ্বর থেকে পিল পিল ক'রে পিপীলিকার মতো বেরিয়ে আসে! তা'রা কে, কোন্ জাতি, কোন্ সমাজের

লোক, কী ভাষা তাদের, কেমন তাদের জীবনযাত্রা,—সব মিলিয়ে আমার ছিল অসীম কৌতূহল। প্রথম তাদের দেখলুম ওই চাটুয্যে গিন্নির শ্রাদ্ধোপলক্ষে। যে-পথ দিয়ে তা'রা আসছে সেই পথের দুধারের দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। তা'রা নাকি নোংরা, তা'রা নাকি ঘৃণ্য। চেয়ে দেখলুম প্রথম শত শত কাঙগালীকে। অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙগ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কদাকার পুরুষের দল—সকল বয়সের। কারো পরণে লেংটি, কারো ছিন্ন-ভিন্ন নোংরা কাপড়ের টুকরো, কারো কম্বলের চিল্‌তে, কেউ বা কোমরে জড়িয়ে রয়েছে ছেঁড়া ময়লা জামা। কারো চোখ নেশায় লাল, কারো মাথায় বন্যচুলের রাশ, কেউ বা সর্বহারা। আর মেয়েছেলেরা? ওরা কি লজ্জা পাচ্ছে না নিরাবরণ দেহ নিয়ে? ওদের কোলে কাঁকালে উলঙগ শিশুর পাল। কুরূপা, বীভৎসা, নীতিভ্রষ্টা শত শত মেয়েছেলে। এরা নাকি সবাই কাঙগালী। সেদিনের কাঙগালী-ভোজন আজও আছে, তবে ভিন্ন নামে,—আজ এর নাম হয়েছে দরিদ্রনারায়ণ সেবা!

কাঙগালীদের মধ্যে শালপাতা আর মাটির গেলাস বিতরণ আরম্ভ হোলো। তখন কলকাতার পথঘাট খোয়া-পাথরের, ধুলো-বালির। তারই ওপর এক এক সারে শতশত শালপাতা আর গেলাস প'ড়ে গেল। ভাত দিলেই ডাল দিতে হয়, এবং ডালের সঙ্গে তরকারি। তা'র খরচ বেশী। ফ্যান্ গাল্‌তে গেলে চালের পরিমাণও বেশী লাগে। সুতরাং খিচুড়ীই সব দিক থেকে সুবিধাজনক। তা'র সঙ্গে শাকসব্জির কিছু একটা ঘাঁট। কুটনোর খোসা, শাকের গোড়া, পচা আলুর টুকরো, বেগুন কাঁচকলার বোঁটা, তা'র মধ্যে দু চারতাল হলুদ আর লঙ্কাবাটা,—এইসব নিয়ে সেই ঘাঁট। খিচুড়ীর মধ্যে খুদ আছে, ধান আছে, বুক্‌ড়ি চাল আছে, ভুসিসুদ্ধ ডাল আছে,—সব মিলিয়ে গরু মহিষের খাদ্য। কিন্তু ওই খাদ্য খাবার জন্য কাঙগালী সমাজের কী লালায়িত লালসার আকুলি বিকুলি! আমি স্তব্ধ কৌতূহল নিয়ে পথের একান্তে দাঁড়িয়ে রইলুম।

খিচুড়ীর সেই বিরাট সমারোহের পর এক একটি পাই পয়সা অথবা আধলা ছিল বকশিস,—অবশ্য এটা ছিল বিশেষ ধনীসমাজের রেওয়াজ। তাই পাবার জন্য কাঙগালীদের কী কাড়াকাড়ি আর মারামারি!

তুচ্ছ

অন্ধকার রাত্রে নাবালকের তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের সামনে দিয়ে ছবির মতো ভেসে যেতো ওই ক্ষুধিত বঞ্চিত নরপালের দৃশ্য। বুকের ভিতরে কোথায় কন্‌কন্‌ করতো,—কেন করতো বুঝতে পারতুম না। ওরা কোন্‌ দেশের, কোন্‌ কালের? ওরা কি চিরকালের? যখন শ্রাদ্ধ কিংবা বিবাহ থাকে না,—ওরা খায় কি? যায় কোথা?—দেখেছি নিজের চোখে,—ভিখারিরাও ওদেরকে ঘৃণা করে, কেননা ওরা কাঙ্গালী। ওদের ঘর নেই,—ওরা ভেসে বেড়ায়, খেয়ে বেড়ায়,—ওদের জন্মমৃত্যু হলো পথে পথে।

সহসা নিজের মনেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতুম। ইচ্ছা হতো সেই রাত্রে বাড়ীর দরজা খুলে পথে বেরিয়ে একাই চীৎকার ক'রে বলি, না, মিথ্যে কথা, চাটুয্যে-গিন্নীর স্বর্গলাভ হয়নি! এটা স্বর্গলাভের পথ নয়! ধানের সঙ্গে বুক্‌ড়ি চাল আর ভুসিডাল সিদ্ধ—ওটাকে কিছুতেই খিচুড়ি বলতে পারবো না, কুট্‌নোর খোসায় আর বেগুনের বোঁটায় আর শাকের গোড়ায় যা সিদ্ধ হয়েছে তাকে বলতে পারবো না তরকারী! ওটা মিথ্যে, ওটা ফাঁকি, ওটা চাটুয্যেগিন্নী নিজেও খেতে পারতো না!

উঁচু থেকে হাত বাড়িয়ে নীচের দিকে জঞ্জালে ফেলে দেওয়া—এটাকে কি দানপুণ্য বলবে? এ যে ভয়ানক প্রবঞ্চনা! বিষম ফাঁকি! ক্ষুধাতুর কাঙ্গালীদের ক্ষুধার দিকে তোমার চোখ ছিল না, শ্রদ্ধা ছিল না তাদের মানবত্বের প্রতি,—তুমি শুধু প্রকাশ করেছ তোমার সম্পদের আত্মাভিমানকে। কেন খাওয়ালে ওদের? কেন ওই অখাদ্য বিতরণ ক'রে ওদের সবাইকে অমন অপমান করলে? তোমার ওই নির্লজ্জ অন্ন খুঁটে-খুঁটে খাবার আগে ওদের মৃত্যু হোলো না কেন? মিথ্যে কথা, চাটুয্যে গিন্নীর কিছুতেই স্বর্গলাভ হয়নি!

বালকের চক্ষু জ্বালা ক'রে জল এসে পড়তো। কাঙ্গালীরা সেদিন যদি চাটুয্যেবাড়ী লুটতরাজ ক'রে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যেতো তবে বোধ হয় আমি একটু খুশীই হতুম।—

*

ভিতরে বিদ্রোহ ছিল, কিন্তু বাইরেটায় শান্ত হয়ে লেখাপড়ায় মন দিতে হোতো।—

"সত্য বটে রাজা রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরাদি বড় বড় রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব ক'রে গিয়েছিলেন! তাঁরা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সত্য-পালনের জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরেছিলেন। তাঁদের আমলে চোর ডাকাত জন্মায়নি, সেজন্য প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় সেই সব রাজাদের রাজত্বকালে এ দেশের লোকেরা কতকটা ধার্মিক ছিল বটে কিন্তু সভ্য ছিল না। একথা সকলেই স্বীকার করবেন, এ দেশে প্রথম সভ্যতা আনলো ইংরেজ। আগে ছিল শুধু ধর্ম, কিন্তু ইংরেজ শাসন-কর্তারাই এ দেশে প্রথম আনলেন ন্যায়ধর্ম!"

স্কুলপাঠ্য এই বইখানার দাম তখন ছিল তিন আনা। বইখানার লেখক ছিলেন স্বয়ং আমাদের খৃষ্টান হেড মাষ্টার। এই অবশ্যপাঠ্য বইখানি অনেককে বিনামূল্যেও দেওয়া হোতো। এখানা মুখস্থ না থাকলে সেদিন ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে যেতো। কানমলা খেয়ে বেঞ্চের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হোতো।

রাজা রামচন্দ্রের আমলে রেলগাড়ী ছিল কি? রাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে টরে-টক্কা টরে-টক্কা টেলিগ্রামে খবর আসতো কি? আগে না হয় জলে ভেলা ভাসতো, কিন্তু কলের জাহাজে চ'ড়ে বিলেতে যাওয়া যেতো কি? চোর ডাকাতে দেশ ভরা ছিল, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঠগরা যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত—নিশ্চিন্ত শান্তিতে লোকের বসবাস করবার উপায় ছিল না,—এমন সময়ে এলো ইংরেজ। সত্যি বলতে কি, রাম-রাজত্বের পরেই বৃটিশ রাজত্ব। মাঝখানের ইতিহাসে অনেক ভুল আছে কে না জানে! ভারতবাসীর উন্নতির জন্যেই ইংরেজ অন্ধকূপে দম আটকে মরেছে!

মিশনারী ইস্কুলের নীচের ক্লাসে বসে আমরা মুগ্ধ হয়ে বক্তৃতা শুনতুম, আর বাইবেল মুখস্থ ক'রে সমস্বরে গান ধরতুম—'প্রভু যীশু নাম, অশেষ গুণধাম, প্রণিপাত করি তব চরণে!'

ম্যাকলীন সাহেবের বাবুর্চির ছেলে আলতাবুদ্দিন আমাদের সঙ্গে পড়তো,

সে মুখে হাত চাপা দিয়ে বলতো, "যীসু পরম দয়ালু সীতকালে খায় সাঁকালু—"

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবতার এবং প্রিয়তম পুত্র যীশুখৃষ্ট শীতকালে শাঁকালু খেতেন কিনা, একথা বাইবেলে সেদিন ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আচম্‌কা আমার গালে এক থাপ্পড় দিতেন বাইবেলের মাষ্টার। আমি নাকি আলতাবুদ্দিনকে ওই কবিতাটি শিখিয়েছি।

মার খেয়ে কাঁদবার হুকুম ছিল না। ওতে নাকি স্কুলের নিয়মানুগত্য নষ্ট হয়। যীশুখৃষ্ট মার খেয়েছেন, কিন্তু কাঁদেননি। বরং যারা অপরাধ করেছে, তাদের জন্য তিনি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলতেন, হে ঈশ্বর, তুমি ওদের ক্ষমা করো। ওরা জানেনা ওরা কি করলো।

বাড়ী ফিরে গালের ওপর থাপ্পড়ের দাগটা দেখে ছোট বোন পরম পুলকে চীৎকার ক'রে সবাইকে জানিয়ে দিত। বুঝতে পারতুম রাস্তার কলের জল অনেকবার গালে বুলিয়েও দাগটা মিলোয়নি। হে পরম পিতা, পরের দুঃখে ছোট বোন মজা পেয়েছে, তুমি ওকে ক্ষমা করো, প্রভু!

বাইবেলের কথাগুলি দিনরাত আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতো।

তেলে ভাজা বেগুনি আর এক ঘটি জল খেয়ে যেদিন পেট গরম হোতো, সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখতুম, জ্যোতির্ময় পুরুষ দশ আজ্ঞা বিতরণ ক'রে বলছেন, লোভ করিয়ো না, চুরি করিয়ো না!—কিন্তু পরদিন চুরিকরা মার্বেলের গুলি কটা মালিকের কাছে ফেরৎ দিতে হাত কাঁপতো। কেননা সে ব্যক্তির বাইবেল পড়া ছিল না। ক্ষমা যদি সে না করে? ইংরেজের মতন ন্যায় বিচার করতে গিয়ে সে যদি অপরাধীকে শাস্তি দেয়? থাক্, অত সাধু সেজে কাজ নেই।

তামাকের গড়গড়ার থেকে মুখ সরিয়ে মামা মুখ খিঁচিয়ে বলতেন, লেখাপড়া না গুষ্টির মাথা! ঘর জামায়ের গুষ্টি—ওদের সাত পুরুষে প্রথম ভাগ ধরেনি! তালুকদারের ঘরে বে থা' করবি—খাবি দাবি—ঘুরে বেড়াবি! লেখাপড়া কিসের? কিছু না পারিস, আমার মতন শিষ্য জোটাবি! বছরে মাথা পিছু এক টাকা—দশ হাজার শিষ্য! পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাবি।

দিদিমা বলতেন, আ মর, কুমন্তরণা দিচ্ছে দেখো! যমের অরুচি!—

কথাগুলো দিদিমা দাঁতে দাঁতে ঘষতেন, তাই মামা সঠিক শুনতে পেতেন না।

এবাড়ীর দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তর দিকে চ'লে গিয়েছে সরু গলি পথ। লালার দোকান পেরিয়ে শেতলদের বস্তি ছাড়িয়ে শীলেদের বাড়ী বাঁ দিকে রেখে সোজা গেলেই বড় রাস্তা। নদী গিয়ে পড়ে যেমন সমুদ্রে—যেমন ভূগোলের মাষ্টার শেখাতেন—তেমনি বাল্যকালের ওই গলি গিয়ে মিশে যেতো মস্ত চওড়া পথে—যেখানে অবারিত মুক্তির আস্বাদ। হাতে এক রাশ বই, পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো—জামাকাপড় অনেক জায়গায় ভিন্ন রংয়ের সুতোয় শেলাই করা। ফিতে বাঁধা জুতো—মানে, চটিজুতো পরার জো ছিল না। পথে বার হতে গিয়ে যদি চটিজুতো ছট্‌কে যায়? যদি সেই মুহূর্তে গাড়ী এসে পড়ে? সুতরাং চটিজুতো প'রে ইস্কুলে যাবার রেওয়াজ ছিল না সেদিন! বর্ষায় ভিজে যেতে হবে—ছাতা নেওয়া চলবে না। শ্রাবণের মুষলধারা, চৈত্র আর বৈশাখের টা টা রোদ—মাথা বেয়ে জল পড়ুক, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরুক,—ওতে বরং ছেলে বাঁচবে, কিন্তু ছাতার আড়াল দিয়ে ত' আর গাড়ী এসে চাপা দেবে না!

দুর্গা দুর্গা,—ওরে গাড়ী ঘোড়া দেখে যাস—ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলিস। এদিক ওদিক দেখে তবে রাস্তা পার হোস।

প্রতিদিনকার এই উপদেশ যেন যেতো আমার পিছনে পিছনে। পিছনের শাসনের চক্ষু আমার সামনের পথ বেঁধে দিত। যতক্ষণ না বড় রাস্তায় প'ড়ে একটু বাঁ দিকে বেঁকতুম ততক্ষণ অবধি সাহস হোতো না পিছন দিকে ফিরবার। হয়ত ছোট বোনের গোয়েন্দা চক্ষু, আর নয়ত ছোড়দা আসছে পিছনে পিছনে। গ্রেপ্তারের আগে পুলিশ যেমন কতকটা পথ পলাতক অপরাধীকে অনুসরণ ক'রে আসে,— ওদের লক্ষ্য ছিল ঠিক তেমনি। ওরা ওৎ পেতে থাকতো কতক্ষণে আমি একটা অপরাধ করবো; ওরা কান পেতে থাকতো পড়তে ব'সে ঠিক কখন্ আমি একটা ভুল উচ্চারণ করবো, কখন্ বা পড়তে পড়তে ক্লান্তিতে আমার চোখ ঢুলে আসবে। ওদের সতর্ক চোখ-কান সর্বদা পাহারায় থাকতো।

কিন্তু ইস্কুল যাবার ওই পথটাই ছিল আমার মুক্তির নিশ্বাস। রায়

বাগানের গলি দিয়ে মিশনারী ইস্কুলে গিয়ে পোঁছবার নির্দেশ থাকতো আমার ওপর। গলিতে-গলিতে যাওয়া—যে-পথে ভয় কম। মিনিট দুই সময় যদি বেশী লাগে লাগুক—কিন্তু গরীবের অনাথ ছেলের দাম অনেক বেশী। কোনোমতে একটা পাস করলে তবে এনে খাওয়াতে পারবে। আর যদি সদাগরী অপিসে একটুখানি বসবার জায়গা পায় তবে ত' পাথরে পাঁচ কীল। দুর্গা—দুর্গা,—ওরে, ফুটপাথ ধ'রে যাবি। এদিক ওদিক দেখে তবে রাস্তা পার হবি। দুর্গা—দুর্গা—

দুর্গা নাম করতে গিয়ে মায়ের গলার আওয়াজ কেমন কাঁপতো। সেই কাঁপন ছুঁয়ে থাকতো আমারও গলার মধ্যে। সাবধানে পথ চেয়ে চলতুম। কোনোমতে একটা পাস করা, তার পরেই একটা যেমন-তেমন চাকরী!

কিন্তু গলি পেরিয়ে হঠাৎ যেন এসে পড়তুম সমুদ্রের ধারে। হেদুয়ার ফুটপাথে উঠে দেখতুম, পৃথিবী অনেক বড়। বিশাল জলাশয়, তার যেন এপার ওপার নেই। ওপারে দেবদারু গাছের সারি—তা'র নীচে দিয়ে চ'লে গেছে ট্রাম রাস্তা। সে-রাস্তা গেছে কতদূর—আমি তা'র খোঁজ জানিনে। কতক্ষণ পরে পিছন ফিরে দেখতুম। না, শাসন কোথাও নেই, কোনও সতর্ক চক্ষু আমাকে অনুসরণ করছে না। তখন থমকে দাঁড়িয়ে দেখতুম চারিদিকে। আমি একা। আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মতো ডাইনে-বাঁয়ে কেউ নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ থেকে ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়তুম পশ্চিম দিকে—সেটা হেদুয়ার জলের মধ্যে গিয়ে পড়তো। লোহার রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে যাবার সময় মালীকে লুকিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা জবা ফুল তুলে নিয়ে যেতুম। শাসনের চাপে দুরন্তপনাটা থাকতো শেকলে বাঁধা, সুযোগ পাবামাত্র সেটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতো।

মিশনারী ইস্কুলে সাড়ে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ হয়ে যেতো। তারপর যদি কোনো বালক ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হোতো, তার কপালে কী লাঞ্ছনা সেদিন! বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হোতো কতক্ষণ, কিংবা তা'রো চেয়ে সাংঘাতিক,—দশ মিনিট ধ'রে পুরনো পড়া মুখস্থ ব'লে যাও। যদি একটি ভুল যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ব্ল্যাক্-বুকে নাম উঠবে—সাবধান!

প্রহারের ভয় অপেক্ষা পুরনো পড়ার ভয় ছিল বেশী। চুরির দায়ে ধরা

পড়লে সব চেয়ে কঠিন শাস্তি ছিল পুরনো পড়া মুখস্থ বলা। এবং সেই মুখস্থটা ফার্স্ট বুক থেকে হওয়া চাই। ছোট বেলাকার সব চেয়ে বড় শত্রু ছিল ওই তিন আনা দামের সাংঘাতিক ইংরেজি বইখানা। চোখের জলে, তাড়নায়, অপমানে, অনাচারে—ওই বইখানা ধরতে হোতো। ওর মধ্যে উদ্ভট উচ্চারণ, জটিল বানানের কায়দা, একই শব্দের বিভিন্ন অলিগলি। মুখস্থ বলতে গেলেই মন আর বুদ্ধি পথ হারায়। তখন আর রক্ষা নেই,—ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, তারপর মুসলধারে বর্ষণ।

ঘরের ভিতর থেকে হাঁক দিয়ে মামা বলেন, গুষ্টির মাথা শিখছে! বাপ-দাদা কত ইংরেজি শিখেছিল? গুয়োটা, প্রথম দুপাতা প'ড়ে রাখ্—আমি মন্মথ মাষ্টারকে ব'লে তোকে ক্লাসে উঠিয়ে দেবো। সে আমার এক কেলাসের ইয়ার।

দিদিমা এক পাশ থেকে ফোঁস করে উঠতেন, থাম, ভারি মুরোদ তোর! বলে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তা'র মাইনে চোদ্দ সিকে! লেখাপড়া না শিখলে খেতে দেবে কে? তুই দিবি?

মুখখানা বিকৃত ক'রে মামা আগুন হয়ে বলেন, আমি না দিলে দিচ্ছে কে? মাতামহ গুষ্টির খেয়ে ওরা মানুষ হচ্ছে না?

দিদিমা দপ ক'রে জ্বলে ওঠেন, তোর পয়সায় মানুষ হচ্ছে?

আমার বাপ ফল্না ভট্চার্যির পয়সায়!

কি দিয়ে প্রমাণ করবি?

মামা লাফিয়ে উঠে চীৎকার করেন, প্রমাণ? প্রমাণ হাইকোর্ট, প্রমাণ তোমার ওই জাল-উইলের ধাপ্পাবাজি। ওই স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তির ফক্কিকারি!

দিদিমাও হাঁক দেন্—হাইকোর্টে যাবার খরচ নেই? কোন্ 'তেরোজরির' ঘর থেকে টাকা পাবি?

দিদিমার মুখ থেকে এই ইংরেজি শব্দটা শুনলেই মামা ক্ষেপে ওঠেন, এবং সেই ক্ষিপ্তোন্মত্ত অবস্থায় একটা সুবিধা হয় এই যে, ফার্স্ট বুকখানা বন্ধ ক'রে সকলের অলক্ষ্যে গা ঢাকা দিতে পারি। মনে মনে মামার প্রতি শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

তুচ্ছ

হঠাৎ একদিন মামা ডাকেন, ওরে ওই গুয়োটা, এদিকে আয়।

ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। প্রহ্লাদ যেমন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল হিরণ্যকশিপুর সামনে। মামার ভয়ানক মুখখানার ওপর যেন দুটো রক্ত চোখ বসানো। করাল সেই চক্ষে একটু আদরের আভাস এনে মামা বলেন, লেখাপড়া শিখবি, না দোকান ক'রে খাবি? দোকানে কিন্তু কাঁচা পয়সা!

দোকানের ওপর আমার চিরদিনের সখ। মনের মধ্যে খুশী চেপে রেখে বললুম, দোকান করতে টাকা লাগে যে?

টাকা লাগে!—মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, আমি জানিনে সে কথা? টাকার ভাবনা আমার, তুই শুধু দোকানে বসবি! বেনে মসলার দোকান। দু হাতে লুটবি! রাজি আছিস? ওরে গুয়োটা, মুখের দিকে তাকাস কি? কাবলীঅলা থাকতে আবার টাকার ভাবনা? কত টাকা চাস?

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলুম, দেবে?

মামা এক প্রকার হাসলেন। কথামালার খেঁকশিয়ালের একখানা ছবি মনে প'ড়ে গেল। তারপর বললেন, এই যে দাড়ি রেখেছি মুখে, কেন বল্ দিকি, আবাগের বেটা? তবে শোন্। হাওড়ায় গাঁজা আফিংয়ের দোকান দেবো ব'লে তিনশো টাকা নিয়েছিলুম কাবলীঅলার কাছ থেকে। হাওড়ায় না গিয়ে সোজা গেলুম দার্জিলিংয়ে! দুবচ্ছর গায়েব! তারপর সেই কাবলী এসে একদিন আমাকেই জিজ্ঞেস করে, লোগিন বাবু কোথায়! বেটাকে সেদিন নিমতলার শ্মশান দেখিয়ে দিয়েছিলুম! এসব কাজ যদি পারিস তবেই আমার মতন লেখাপড়া শেখ্।

ক্ষণজন্মা মাতুলের এই আত্মগৌরবে আমার বুকের ছাতি যেন চওড়া হয়ে উঠতো। জীবনের একটিমাত্র কামনা নিজের অন্তরেই উপলব্ধি করতুম, মাতুলের আদর্শেই যেন আমার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে ওঠে। টাকা ধার ক'রে দোকান দেওয়া ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারতুম না।

এক বেঞ্চিতে বসতুম বীরেন আর আমি। বীরেন বড়লোক কোন্ এক ব্যারিস্টারের ছেলে। দুজনে ভাব ছিল ব'লেই তর্ক ছিল। ছবির লড়াই করছিলুম গোপনে, প্রিয়নাথ বাবু তখন ইংরেজি সেকেণ্ড রীডার পড়াচ্ছিলেন। বড়লোকরা লড়াইতে হেরে গেলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বীরেন তার ছুঁচলো

পেন্সিল দিয়ে আমার নাকের ওপর আঘাত করলো। আঘাত অতটা গুরুতর হবে, সেও জানতো না,—দরদরিয়ে রক্ত গড়াতে লাগলো। আশপাশে চাপা হৈ চৈ। ছুটে এলেন প্রিয় মাষ্টার। অপরাধটা আমার—এই বিচার করলেন তিনি। বীরেনের পেন্সিলের শিষটা ভেঙে গিয়েছিল, প্রিয়বাবু নিজের হাতে সেই পেন্সিল ছুলে দিলেন। কান ধ'রে তিনি আমাকে পাঠালেন কলতলায়। বাড়ীতে এসে সেই ক্ষত গোপন করতে গিয়ে অনেক লাঞ্ছনা পিঠের ওপর দিয়ে গিয়েছিল।

সুধীরের মতন ভালো ছাত্র ছিলুম না, কেন না ইংরেজি সে জানে ভালো। ইংরেজি ব্যাকরণ তার চেয়েও ভালো বোঝে। সুনীলের মতন ছিলুম না, কেননা অঙ্কে সে প্রখর। বাইবেলে অমৃত, ইতিহাসে নবকৃষ্ণ। ছিল আর একটা বিষয়—যেটার নাম ভূগোল। ভূগোলে ছিল কল্পনা। চোখ বুজে দেখতুম, ভল্‌গা নদী নেমে গেছে ভীম গর্জনে উরল্‌ পর্বতের থেকে—দেখতুম গঙ্গাকে গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগরে। মধ্য এশিয়ার মরুলোকে জলের জন্যে হাহাকার ক'রে বেড়াতুম; আর যেতুম ঘুমের ঘোরে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে, যেখানে আজও নরখাদকের দেখা মেলে। কোন্‌ দেশে আছে হিংস্র জানোয়ার আর গহন অরণ্য—খুঁজে বেড়াতুম। হিমালয়ের দুর্গম কোন গহ্বরে থাকে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, দক্ষিণ শাখালীনে মাছ ধরে জাপানীরা, এস্কিমোরা বরফের ঘরে থাকে, আর লিভিংস্টোন্‌ সিংহের জঙ্গল পেরিয়ে ভিক্‌টোরিয়া জল প্রপাতের দিকে যান্‌,—আমি যাই তাঁর পিছু পিছু। আমি থাকি চেরাপুঞ্জীর বৃষ্টিতে, উত্তমাশা অন্তরীপে, মরু সাগরের জলে, স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ার শীর্ষে উত্তর মেরুতে—যেখানে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত,—যেখানে মাঝ রাত্রে সূর্য ওঠে। আবীরের রং গলে-গলে পড়ে যেখানকার আকাশ-কোণে!

আবীরের রং? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল দোল পূর্ণিমার পরের দিন ইস্কুলে রং খেলা। আগের দিনের রং লাগা জামা কাপড় কেচে প'রে গেছি ইস্কুলে, কিন্তু দাগ রয়েছে তখনো। কারা যেন রং নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছে উঁচু ক্লাসে। আমি ভিন্ন ক্লাসের ছাত্র। কিন্তু চেঁচামেচি শুনে টিফিনের এক ফাঁকে গিয়েছিলুম সেখানে উঁকি মারতে। হয়ত আমার মাথাতেও আগের

দিনের আবীরের চিহ্ন কিছু ছিল। চোখ পড়লো হেড মাষ্টারের। বেত হাতে নিয়ে তিনি উন্মত্ত হয়ে আমার উপর চড়াও হলেন। সেই সুদীর্ঘ বিশেষ বেত্রদণ্ডটি তাঁর আপিসেই সংরক্ষিত থাকতো। সেই বেত সশব্দে পড়েছিল আমার সর্বাঙ্গে একুশ বার। তাঁর স্নেহ ছিল চাপা, শাসন ছিল প্রকট। কিন্তু আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সেদিন বন্ধুরা যে আত্মরক্ষা করেছিল এটুকু হেড মাষ্টার মশায় উত্তেজনার মধ্যে বিচার ক'রে দেখেন নি। পরবর্তীকালে সেই খৃষ্টান হেডমাষ্টার 'রায়সাহেব' উপাধি পাওয়ায় আমাদের ইস্কুলে উৎসব হয়েছিল। ফিরে এসে বাইবেলের ক্লাসে ব'সে ব'সে কাঁপছিলুম। পিঠের দিকে আর জামার হাতায় রক্তের দাগ ফুটে উঠেছিল। বাইবেলের শিক্ষক তখন আবেগ ভরে খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের মূল কথাটি বোঝাচ্ছিলেন,—জগতের সকল ধর্মে আছে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, একমাত্র বাইবেলে আছে সকল অপরাধের মার্জনা। প্রভু ক্ষমা করেন, তাই তাঁর স্নেহের আশ্রয় এমন বিরাট। তাই তাঁকে আমরা পিতা বলি!

কিন্তু মাতা কি পিতার চেয়েও বড় নয়? বাৎসরিক পরীক্ষার কালে রাত্রে মা ঘুমোতেন না। শেষরাত্রে উঠে কনকনে শীতের মধ্যে রেড়ির তেলের আলো জ্বালিয়ে পড়তে বসতুম। ছেঁড়া লেপের একটা অংশ মা আমার গায়ে তুলে দিতেন। পিদিমে তেল ফুরোতো, আর মুখ তুলে উত্তর দিকের নিম-গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতুম, ভোর হয়েছে—কিন্তু কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কাক ডেকে উঠেছে সেই নতুন পৃথিবীতে। এই বুকচাপা অবরোধের থেকে বাইরে, এই অঙ্ক-ব্যাকরণ জ্যামিতির থেকে অনেক দূরে—একটা স্নিগ্ধ শীতল মুক্তির ইশারা। হিমালয়ের হিমের হাওয়া যেন এসে লাগতো মুখে চোখে। পিদিমের শুকনো শল্‌তেটা নিভে আসতো ধীরে ধীরে। রাঙ্গা রোদ এসে ছুঁতো নিমগাছের আগডালে। প্রভাতের পাখীরা ডেকে যেতো।

পরীক্ষার ফল বাহির হবার পর আবার সেই নতুন বইয়ের সমস্যা। সেই পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়ানো, সেই ধনী আত্মীয়র দরবারে আবেদন জানানো। আছে কি কোনো শিক্ষা বইয়ের বাইরে? এমন কোনো বিদ্যে, যা বইতে নেই? বন্ধুসমাজের মধ্যে বলাবলি হয়, কেউ যাবে বিলেত, কেউ আমেরিকা,—কেউ বা হবে ইঞ্জিনীয়র। কারো মামা পড়াবে ডাক্তারি, কারো

বাবা ওকালতি। কারো কাকা অমুক সাহেবের বন্ধু, কারো দাদামশাই হাইকোর্টের এটর্নী। তুই কি করবি?

ঢোক গিলে বলতুম, আমি? আমার মামা মস্ত ব্যবসায়ী। আমি জাহাজ কিনে আদা চালান দেবো বিলেতে। নয়ত হনলুলুতে।

ছেঁড়া জামার দিকে তাকিয়ে আমাদের ধনী প্রতিবেশীর ছেলে সুবোধ বলতো, তোর মামাকে ত' চিনি। জাহাজ কেনার আগে একটা জামা কিনিস।

আমার অকিঞ্চন মুখখানার দিকে চেয়ে বন্ধুমহলে হাসাহাসি প'ড়ে যেতো।

কেউ বা অপরকে প্রশ্ন করতো, তুই পাস ক'রে বেরিয়ে কি করবি?

খৃষ্টান বন্ধু যতীন জবাব দিত, আমি পালাবো।

কোথায়?

জাহাজের কুলি সেজে পালাবো দেশ ছেড়ে। যে দেশে খুশি!

সবাই সাগ্রহে শুনতো ওর কল্পনার দৌড়টা। যতীন বলতো, মুসলমান সেজে যাবো। আগে হবো কুলি, তারপর খালাসী। নতুন দেশে নেমে হবো ফেরার। হোটেলে চাকরি নেবো, নয়ত বেচবো খবরের কাগজ। কিছু না করতে পারি, হাত দেখে ভাগ্য ব'লে দেবো—কত খদ্দের জুটবে। এমনি ক'রে টাকা জমিয়ে যাবো বিলেত থেকে কালিফর্ণিয়া।

তারপর?

তারপর সেখান থেকে প্যাসিফিক্ পেরিয়ে জাপান। জাপান থেকে সাইবেরিয়া। তারপর বেরিং পেরিয়ে আলাস্কা। প্যাসিফিক পেরিয়ে অষ্ট্রেলিয়া!

তারপর কিন্তু সে আর জবাব দিত না। বন্ধুরা সবাই অনেকটা পরাজয় স্বীকার ক'রে যে যার পথে চ'লে যেতো। হেদুয়ার উপর নেমে আসতো সন্ধ্যা। যতীনের ওই হাতখানা ধ'রে চলবার জন্য আমি মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠতুম।

*

গোলা পায়রারা বাসা বেঁধেছিল ওদিকের শূন্য মহলে। ছাদের নীচে কার্নিশ—তারই তলায় তলায়। সন্ধ্যের পর ওদের চোখ কানা হয়, সেই সময়

মই রেখে উঠতে পারলে ঠিক ধরে আনা যায়! অনেকদিন ধরে এই মতলব এ'টেছিলুম মনে মনে। পায়রারা উড়ে যায় যখন আকাশ নীল থাকে, আর থাকে রোদ্দুর, আর থাকে সুন্দর মিষ্টি হাওয়া,—উধাও শূন্যে ওরা উড়ে যায়,—আর ডোমটার নীচে দাঁড়িয়ে কচিদের বাড়ীর থেকে নীচের ঠোঁট টিপে "সিটি" দেয়। ছোট বোন বলে, ওরা যে সুখের পায়রা—জানিসনে বুঝি? বিষ্টিবাদল দেখলেই ওরা কোটরে ঢুকে বক্‌বকম্‌ করে।

কথাটা সত্যি! কিন্তু জিজ্ঞেস করতুম, কেন রে?

প্রশ্ন শুনে মুখ বে'কিয়ে ঠুক্‌রে যেতো ভাইবোনেরা—কেন কেন করিসনে। হ্যাংলা কোথাকার! ওরা যে মটরের দানা গিলে খায়, তাই ওরা ডিম পাড়ে।

প্রশ্নের জবাব পেতুম না। জিজ্ঞাসা জমতো মনে মনে, উত্তর পাইনি কোনোদিন। শরৎকালে পুজো আসে কেন, পুজোর সময় বৃষ্টি থামে কেন, টিকটিকিরা দিনেরবেলা ঘুমোয় কেন, আর বর কেন আসে বিয়ে করতে, আর কাবুলীওলার হাতে লাঠি থাকে কেন—এসব কথার জবাব ছিল না।

বর আসছে বামুন পাড়ায়,—অমনি বাড়িময় সোরগোল, আর শাঁখ বেজে ওঠা। মামীমার মুখে উলুধ্বনি শুনতে বেশ লাগে। অমনি সকলের ছুটোছুটি, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে গেল বাড়িসুদ্ধ সবাই সদর দরজার দিকে। হঠাৎ এদিকটা জনশূন্য মনে হচ্ছে। সমস্তটাই যেন সর্বস্বান্ত, এমহল-ওমহল তিনতলা—যেখানে চেয়ে দেখি, মায়া নেই, মোহ নেই। একজন আসছে বামুন পাড়ার পথ দিয়ে, তার হাতে সর্বস্ব তুলে দেবার জন্য ছুটে গেছে সবাই—পিছনে কিছু রেখে যায়নি।

পায়রারা অন্ধকারে বক্‌বকম্‌ করে উঠছে ওমহলের কার্নিশের নীচে, এখান থেকে উজ্জ্বল য়্যাসিটিলিন্‌ আলোতেও ওদের দেখা যাচ্ছে না। ওদের সুখের মধ্যেও স্বস্তি নেই, মায়ের বুকের পাশে শুয়েও ওদের তৃপ্তি নেই। চারিদিকে এত মানুষের এত কোলাহল, আর ওরা ভাবছে ওদের কেউ আদর করলে না। আর সুখের পায়রাই যদি হবে তবে উড়ে যায় কেন অত দূর শূন্যে? কী আছে সেখানে? বাসা নেই, সীমা নেই, সান্ত্বনা নেই, সঙ্গ নেই,—আকাশের টানে ছুটে গেলে কোথা সুখ?

ভালোবাসা শব্দটা আমাদের বাড়ির ভিতরে কোথাও শোনা যেতো না।

ওকথাটা নাকি শুনতে ভালো নয়। ভালো যে নয় তার প্রমাণ ছিল আমার চারিদিকে। মামার চোখ ছিল রক্তরাঙগা, ইস্কুলে হেড মাষ্টারের চোখ ছিল লাল, মামার কথায় দিদিমার চোখ হোতো রাঙগা, পাশের বস্তির দীপু—নেশা করলেই তার চোখ দুটো হোতো লাল, গোঁসাই কলু এসে দাঁড়াতো রাঙগা চোখে, আর ওই দীপুর বস্তিতে থাকতো ক্যাওরা বুড়ি আর হরার মা,—ওরা পাড়ার লোকের বিরুদ্ধে দিদিমার কাছে নালিশ জানাতো লাল চোখ নিয়ে। রক্ত ফেটে পড়তো ওদের চোখে।

ছোটবোন বলতো, ভালোবাসার তুই কি বুঝিস? তোর না দশ বছর বয়েস? এ‘চোড়ে পেকেছিস, না? বাসর ঘরে যেতে তোর লজ্জা করে না? মেনিমুখো!

বাসরঘরের ভিতরটায় উজ্জ্বল আলো, বাইরেটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উ‘কি দিচ্ছে সবাই ভিতর দিকে জানলার ফাঁক দিয়ে। বাড়ির মেয়েরা ছাড়া জুটেছে পাড়ার মেয়েমহল। ওরা জানে ওরা কী দেখছে! ওদের চোখের পাতা পড়ছে না—কেননা যা দেখলে খুশী হয় তা দেখতে পাচ্ছে না কিছুতেই। শ্রাবণ মাসের বিয়ে। বৃষ্টির ছাট লাগছে, মশা কামড়াচ্ছে, ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ, ক্লান্তিতে ভেঙেগ আসছে পা,—তবু ওদের দেখা চাই ভিতরে। বিধবারা যাবে না ওদিকে, কেননা অলক্ষণ! গিন্নিরা যাবে না ওখানে, কারণ ওটা ছেলেমানুষি। ছেলেরা যাবে না, কারণ অসভ্যতা। কর্তারা যাবে না, কেননা যেতে নেই ওখানে!

তবে ওখানে কী?

তারুদিদি বললে, বুঝলিনে, ওদের যে প্রথম ভালোবাসার দিন! ছি, ওখানে গিয়ে উ‘কি মারতে নেই। যা তুই ঘুমোগে যা।

বিছানায় গিয়ে ঢুকলুম একা একা। ঠাণ্ডা দরিদ্র বিছানা শুধু নয়, বিয়েবাড়ির হট্টগোলে ওটার কোনো প্রাধান্য নেই। অনাদরে একধারে কুণ্ডলী পাকানো ছিল, তাতে লেগেছে বৃষ্টির ছাট। অন্ধকারে ওটাই আশ্রয়, ওটার মধ্যেই সমস্ত জিজ্ঞাসাগুলো ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে পাঁজরের কোণটা একটু গরম হয়ে ওঠে—তবু সুখের পায়রা মাঝরাত্তিরেও কে‘দে ওঠে বক্‌বকম্‌ করে। সুখে ওদের স্বস্তি নেই, যেমন আমার চোখে ঘুম নেই।

ভালোবাসা! আমার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে জেগে ওঠে সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি ছাড়িয়ে। সেই যে সেই হানাবাড়ির গল্পটা শুনেছিলুম! সেখানে এক সাহেব পুষেছিল একটা বাঘের ছানা,—সেই ছানাটা তার ধারালো জিব দিয়ে একদিন রাত্তিরে সেই সাহেবটার পা চাটছিল। পায়ের ওপর রক্ত ফুটে উঠলো, আর সেই ছানাটা সেই রক্ত চাটতে চাটতে এক সময়ে লাল চোখে সাহেবের দিকে জ্বলজ্বল করে তাকালো। সাহেব বুঝতে পারলো, বাঘের বাচ্চাটা রক্তের স্বাদ পেয়েছে!

ভালোবাসা,—ওই শব্দটা আমি সারারাত ধরে সেই বাঘের বাচ্চাটার মতন চাটতে লাগলুম। ওটার স্বাদ হয়ত ওই প্রথম জানলুম। বাড়ির মধ্যে ওটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না বলেই ওটা যেন হঠাৎ নতুন খবর নিয়ে এলো। খবরটা মনে মনে চেপে রাখতুম—যেমন চেপে রাখতে হোতো পৃথিবীর সব জিজ্ঞাসাগুলো।

বাড়ি থেকে ইস্কুলের সমস্ত পথটাই প্রায় একা একা। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু আশ্চর্য ওই জলদাঁড়ানো আঁকাবাঁকা গলিপথটা। শুধু-পায়ে কেবল যে জল ঠেলে যাই তাই নয়—কোঁচার খুঁটের নীচে বইখাতা সযত্নে নিয়ে দারিদ্র্যটাকেও ঠেলে ঠেলে যাই। খাওয়া হয়নি কিছু সকাল থেকে। আশা আছে ভিজে কাপড়জামা দেখলে ছুটি পাওয়া যেতে পারে। পথটা নির্জন। নীচের দিকে থৈ থৈ জল আর উপর দিকে বিষণ্ণ মেঘ,—বড় দরিদ্র পৃথিবী, বড় দরিদ্র জীবন। পাখীরা ওড়ে না—গির্জার বাগানে গাছের ডালে ওরা ভিজে ডানায় চুপ করে বসে থাকে, আর ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ে। আর ওই গাছের ছায়ার মধ্যে কেমন যেন কান্না জড়ানো, হেদুয়ার অথৈ জলেও যেন আকাশ জোড়া বিষাদের ছায়া নেমেছে। ইস্কুল যাবার পথে একা একা আমার কান্না পেয়ে যেতো। সামনে কেউ নেই, পিছনে কেউ নেই—শ্রাবণের এই শোকাচ্ছন্ন দিনে কেউ কোথাও নেই আমার!

আবার হঠাৎ একদিন সূর্যের আলো হেসে ওঠে। মেঘেরা সরে যায়, আকাশ থেকে নেমে আসে রোদ। ডানা ঝাড়া দিয়ে পায়রারা বেরিয়ে পড়ে ছাদের পাঁচিলে, আজ ওরা আবার সুখের খবর পেয়েছে আকাশ থেকে। আমিও আমার পোষা বাচ্চা কুকুরটিকে নিয়ে ছাদে যাই রোদের আলোয়। শাদার সঙ্গে

বেগনী আভা কুকুরটার গায়ে। মারলে মুখ বুজে মার খায়, তাই ওর নাম রেখেছিলুম গাধা! গাধাকে চোখ রাঙিগয়ে ধমক দিলে ভয়ে ল্যাজ নাড়তো, এবং একটু আস্কারা দিলে হাত-পায়ের তলায় ঢুকে আদর জানাতো। আর যদি কিছু না বলতুম তবে এক সময়ে গায়ে গা ছুঁইয়ে শুয়ে থাকতো শান্ত হয়ে, খেলা করতো আঙগুলগুলো নিয়ে। হঠাৎ মনে হোতো, এটা কী? গাধার কি প্রাণ আছে? আছে কি মন? আত্মা আছে?

ওকে খেতে দেয় ছোটবোন! বেড়াতে নিয়ে যায় ভাগ্নে! রাত্রে শুয়ে থাকে এক কোণে। অনাদরে ও সরে থাকে, অবহেলা নিয়ে থাকে একপাশে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি পথের নেড়িকুকুরের আর প্রাপ্য কিছু নেই। ও যেদিন থাকবে না, জানবে না কেউ—শুনবে না কেউ কান পেতে। কিন্তু তার আগে আমার পাঁজরের কোণ ছুঁয়ে একটুখানি দাগ রেখে যেতে চায়। আমার মন যে একা একা ও জানে। সমস্ত বাড়ির ঝগড়াঝাঁটি, গন্ডগোল, গালমন্দ আর বিষবাষ্পের বাইরে এসে ও আমাকে ছুঁয়ে বোধহয় জানাতে চায়, আমি আছি তোমার পাশে। তুমি না ডাকলেও আছি, তুমি মারলেও আছি, তাড়ালেও আছি।

গাধাকে একদিন কে যেন কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলো। অনেক খুঁজেছিলুম, কিন্তু আর তাকে দেখতে পাইনি। ওর জন্যে নাকি আমার পড়ায় মন বসছিল না। মন বসবে কেমন করে? অনেক রাত পর্যন্ত রেড়ির তেলের পিদিমের সামনে বসে পড়া করতে হোতো, আর বাইরের অন্ধকারে নামতো বর্ষা—আর কান পেতে শুনতুম বাড়ির আনাচে-কানাচে কেঁদে বেড়াচ্ছে নেড়িকুকুর,—চারিদিককার জলের মধ্যে ওর আশ্রয় কোথাও জুটছে না! আমাদের সেই গাধা নাকি? কিন্তু উঠে গিয়ে খোঁজ নেবার সাহস নেই। নেড়িকুকুর কেঁদে বেড়াচ্ছে অবিরাম। হঠাৎ সেই কান্নাটা মিলে যেতো আমার মনের সঙ্গে। আমি চেঁচিয়ে পড়ছি, না নেড়িকুকুরটা আমার বুকের অতল তল থেকে কেঁদে কেঁদে উঠছে? ওকে যত শান্ত করো, যত সান্ত্বনা দাও, যত সুখের সন্ধান বলো—ওর একঘেয়ে কাতর কান্না কিছুতেই থামবে না!

ওই যেখানে মেসবাড়ি উঠেছে আজকাল, ওখানে ছিল বস্তি। ওই বস্তির মেটেগলির মধ্যে ঢুকে যেতো আমার নতুন বেড়ালটা। বেড়ালটাকে খুঁজে না

পেয়ে ফিরে আসতুম, আর চিরঞ্জীলাল মুদি আমার হায়রানি দেখে আমোদ পেতো। হেসে বলতো, পেলিনে খুঁজে?

না—বলে দাঁড়াতুম ডানহাত পেতে। বলতুম, দাও?

চিরঞ্জী লোহার হাতা নিয়ে আমাকে তাড়া করতো, কিন্তু আমি নড়তুম না। মার খাওয়া সইবে, কিন্তু একখানা বাতাসা আমার পাওয়া চাই। চিরঞ্জী হার মানতো, এবং শেষকালে ওই লোহার হাতার মধ্যে একখানা বাতাসা দিয়ে বাড়িয়ে ধরতো আমার দিকে। আমি ওই বাতাসার সঙ্গে উপরি পেতুম একটি পয়সা। প্রথমটি হোলো বকশিস আর দ্বিতীয়টি হোলো স্নেহের দান। সবাই বলতো, লালারা ওজনে ঠকায়, দাম বেশি নেয়, আধপয়সায় মরে বাঁচে; আর আমি দেখতুম চিরঞ্জীর মুখে চোখে স্নেহের আভা, হাসির মধ্যে মাধুর্য,—আমি দেখতুম ওর চেয়ে বন্ধু কেউ নেই। ওই দাগটুকু রেখে দিয়ে চিরঞ্জীলাল একদিন মরে গেল।

কিন্তু ওই নতুন বিড়ালটা রইলো আমার সামনে। একরাশি শাদা লোম ওর গায়ে, মাঝে মাঝে কালো ছাপ। কাছে এসে দুধ খেয়ে যায়, মাছের ছিবড়ে নিয়ে পালায়—অথচ ওর ধরাছোঁওয়া পাইনে। আমাকে ছোটায় পিছু পিছু, ওটাতেই ওর আনন্দ। ডাকলে কাছে আসে না, নিজের খুশিতে নিজের থেকেই আসে। যতক্ষণ খেতে পাবে, যতক্ষণ আদর পাবে—ঠিক ততক্ষণই সে বাধ্য,—তারপর সে উদাসীন, চিনবেও না তোমাকে। অনেক বাড়ীতে তার অনেক কাজ—তোমাকে নিয়ে শুধু থাকলে তার চলবে না। ওর মন পাইনি কোনোদিন, যেমন অনেকেরই পাইনি! ওর জন্যে সারাদিন ঘুরেছি আনাচে-কানাচে, ওকে ডাকতে ডাকতে বুক চিরে কান্না বেরিয়ে এসেছে, দু'হাত বাড়িয়ে কাছে গেছি কোলে নেবার জন্যে, কিন্তু একটিবারও গ্রাহ্য করেনি, মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে পাঁচিলের ধার দিয়ে পগার পেরিয়ে গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে। আমার মন ছুটেছে ওর পিছু পিছু, আমার চোখ ছুটেছে ওর পায়ে পায়ে।

ভালোবাসা! ভালোবাসা কি কাঁদায়? ভালোবাসা কি কেবল আঘাত সয়? আমাদের ইস্কুলে ছিল চন্দর মাষ্টার। লোকটা পান খায় যখন তখন, কিন্তু মেজাজ তাঁর অত্যন্ত কড়া। হাতে তার বেত থাকে, যতক্ষণ থাকে ইস্কুলে। পড়া না বলতে পারলে অনেকেই মারে, কিন্তু ওই লোকটা পিঠের ওপর বেত

মেরে জিজ্ঞেস করতো, পড়া হয়েছে কি না। আমার কাছে এসে হঠাৎ ওই বেতগাছটা থেমে যেতো। হয়ত সে ভাবতো মরা মানুষের পিঠে বেত মারলে সবাই হেসে উঠবে। বোধ হয় আমার চোখ দুটোয় মৃত্যুর ছায়া ছিল; মারলে হয়ত আঘাত পাবো না, নালিশ জানাবো না! কিম্বা যত মারই খাই, আমার শোধরাবার সম্ভবনা নেই। কিন্তু আমি দেখতুম চন্দর মাষ্টারের চোখের মধ্যে সন্তানের পিতাকে। লোকটা মাইনে পায় আঠারো টাকা, চার-পাঁচটি ছেলেপুলে —ভগ্নিপতির বাড়ীর নীচের তলায় থাকে। সমস্ত বছর ধরে ছাইরংয়ের একটা কোট গায়ে দেয়—তার এত নীচে ঝুল যে, ছেঁড়া কাপড়খানা ঢেকে রাখা যায়। বেতগাছটা নিয়ে আমাকে মারতে এসে থেমে যেতো। বলতো, মুখে মুখে বলে যাচ্ছি, পড়া টুকে নে তুই!

ভালোবাসা! চন্দর মাষ্টারের ওই ছাইরঙা কোটের নীচে কোথাও একবিন্দু স্নেহ ধুকধুক করছে, একথা আমি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু আমি আবিষ্কার করতুম, ওর ওই ছোট ছোট চোখ দুটোয় এক রকমের কোমল ছায়া পড়তো—যে-আভাটুকু আমি একদিন শরৎকালের রৌদ্রে আমার সেই পোষা কুকুরটির চোখে দেখতে পেয়েছিলুম—সমস্ত অপমান আর উৎপীড়নের মধ্যেও যে আমার বুকের কোণটি পরমাত্মীয়র মতন ছুঁয়ে থাকতো।

কিছু একটা চাইতুম বৈ কি, কিন্তু তার নাম জানতুম না—অথচ না পেলেই মনটা যেন আব্দার ধরে থাকতো। নিজের মনে কান্না নিলে আসবে কি কেউ কাছে? কিন্তু ভর্তু এসে দাঁড়াতো সামনে। ভর্তু ছিল দিদিমার বাড়ীর মিতুয়া, নর্দমায় সে ঝাড়ু দিয়ে যেতো। সে ছিল সাঁওতাল দেশের লোক। এই পাট্টা কালো চেহারা, এই এতখানি বুকের ছাতি, মাথায় মিশ কালো বাব্রি চুল পিছনে ওল্টানো, কানে বালা আর লাল ফুল, আর মুখে মহিষাসুরের মতন গোঁফ। ভর্তুর গলার আওয়াজ শুনলে সবাই যেতো পালিয়ে। কেউ বলতো ডাকাত, কেউ বলতো পিশাচ। কোথা থেকে স্নান করে এসে সে হাঁক দিয়ে ডাকতো, ভাত দিয়ে যাও, বুড়িমা।

দিদিমা ভাত দিয়ে যেতেন, আমি আসতুম আঁচলের পিছনে পিছনে। হঠাৎ সে তুলে নিত আমাকে। ঈগল পাখী যেমন ছোঁ মেরে নিয়ে যায় নেংটি ইঁদুরকে—আমার বইতে সেই ছবি ছিল। ওর ছোঁয়ার মধ্যে খুঁজে পেতুম,

যা কোথাও খ‍্‍ুঁজে পেতুম না। ওর সঙ্গে যেন চলে যেতুম বন্য সাঁওতালির জগতে—সেখানে অরণ্য, সেখানে স্বাধীনতা দুর্বার, সেখানকার মাঠে মাঠে মুক্তি, সেখানে জন্তু-জানোয়ার আর মানুষ থাকে পাশাপাশি। ভর্তু কত গল্পই না বলে যেতো যাবার আগে।

আর দিদিমার বাড়ীর থেকে যাবার আগে আমারও একটা সাধ মিটেছিল। ছাদের কার্নিশের নীচে মই বেয়ে উঠে গোলা পায়রা আমাকে ধরতে হয়নি। অনেকদিন ধরে ওদেরকে ডেকেছিলুম বুকফাটা চীৎকার করে। এক জোড়া পায়রা একদিন নেমে এলো। পায়রা মটর জোগাড় করেছিলুম ওদের জন্যে। ওরা কাছে আসে না, দূরের থেকে খেয়ে পালায়। কিন্তু কাছে এলো একদিন—অনেক দিনের পর। তখন থেকে হাতের তালু থেকে খুঁটে খেতে লাগলো মটরের দানা। সেদিন আমি পেয়ে গেলুম, যা খুঁজছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়ে গেলুম।

সে কি ভালোবাসা! জিজ্ঞাসা করেছি নিজেকে অনেকবার। পাখী কি ভালোবাসে? ভালোবাসে কি ভর্তু আর চন্দর মাষ্টার? ভালোবাসতো কি চিরঞ্জীলাল আর সেই নেড়ি কুকুরটা? আমি কি ভালোবাসি ওই কাবুলী বিড়ালটাকে—কিছুতেই যার মন পেলুম না? কিন্তু এসব কথার জবাব চাইতে যাবো কার কাছে? চাইতে গেলে কপালে যে অনেক লাঞ্ছনা জুটবে!

গলি পেরিয়ে চলে যেতুম বড় রাস্তায়! রাস্তায় কি এর জবাব আছে? যদি এই পথ ধরে চলে যাই—যদি পিছন থেকে আর কেউ না ডাকে, যদি পিছনে আর চেয়ে না দেখি—সোজা চলে যাই যেদিকে কখনও যাইনি, যে-জগৎটাকে কখনো দেখিনি,—সেখানে গেলে কেউ বলতে পারে?

কিন্তু ফিরে আসতুম ঠিক সন্ধ্যাবেলা। বাড়ীতে বিকালের পাট হয়ে গেছে। ভাইবোনেরা ঘরে উঠেছে। আর সেদিন হোলো একাদশীর উপবাস। মা বসেছেন মাঝখানে রামায়ণ হাতে নিয়ে। সরযূর তীরে সীতাকে রেখে লক্ষ্মণ বিদায় নিচ্ছেন। সীতার অশ্রুজলে সরযূর প্রবাহ ফুলে উঠেছে। সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে আমার ক্লান্ত চোখে ঘুম এসেছে। পুঁটে ময়রা আমার হাতে দিয়েছিল ছোট একটি আমসন্দেশ, কিন্তু সেটি আর খাওয়া হয়নি। হাতের মুঠোর মধ্যে সেটি নরম হয়ে গলে পড়েছে। যেখানে কারো কোনো

প্রত্যাশা নেই সেখান থেকে বুকভরা কিছু পেলে কেউ বিশ্বাস করে না, এও জেনেছি।

পরদিন মা-দিদিমার দ্বাদশী। সকলের ছোট আমি, আমি সামনে এসে না দাঁড়ালে নির্জলা একাদশীর উপবাস ভঙ্গ হয় না। মায়ের কাছে এসে দাঁড়াতুম। পেয়ে যেতুম শরবতের অবশেষটুকু। শালপাতার ঠোঙ্গায় থাকতো দুটি গুঁজিয়া, তার থেকে একটি মা তুলে দিতেন আমার হাতে! হ্যাঁ, ওটার মধ্যেই ভালোবাসার পরম অভিব্যক্তি খুঁজে পেতুম। ওই গুঁজিয়াটির মধ্যে সকল জিজ্ঞাসার শেষ জবাব। নেড়ি কুকুরের চিরদিনের কান্না ওখানে এসে শান্ত হোতো; সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ওখানে পেয়ে যেতো!

*

বেলতলার ছাদের আল্‌সের উপর ছিল মামার দরুণ টিনের কানেস্তারায় একটি শিশু ডালিম গাছ, তা'র ডালে ডালে ধরেছে লাল রংয়ের ফুল—আর ফুলের নীচে ছোট ছোট ফলের গুটি। ফল কোনোদিন বড় হয় না—ফুলের সঙ্গেই প্রায় কোনো একদিন অলক্ষ্যে ঝ'রে পড়ে। টিনের কানেস্তারায় মাটি যেটুকু ধরে; এবং ওইটুকু মাটির রসে ওই গাছটির যতটুকু বাড়-বাড়ন্ত হওয়া সম্ভব,—কিন্তু ওর বেশী গাছও এগোয় না, ফলেও পাক ধরে না। বেলতলার ছাদের ঠিক মাঝখানে,—বেলগাছের একটা ডাল যেখানে ঝুঁকে পড়েছে—সেই পাঁচিলের একটি পিল্‌পের ওপর বসানো রয়েছে ওই ডালিম গাছের কানেস্তারা। ওটা দূরের থেকে দেখতে পারো, কিন্তু কাছে যাবার হুকুম নেই। কোথা থেকে যমদূতের মতন মামা আসবেন তেড়ে। দূরের থেকে গাছটার দিকে যদি কেউ তাকিয়ে থাকে, মামা আসবেন হুমকিয়ে,—কাছে গিয়েছিলি কেন? কাছাকাছি কেউ যদি যায় তবে দাঁত খিঁচিয়ে তিনি বলবেন, তোর বাবার গাছ? গাছে যে হাত দিলি? আর যদি ডালিম গাছের গোণাগুণতি ফুলের থেকে একটি কখনো অদৃশ্য হয়, তাহ'লেই সর্বনাশ! বাড়ীতে লাগলো আগুন, পাড়াময় হৈ চৈ, মাথার উপরে কাক-চিল ওড়ে, বাড়ীসুদ্ধ মেয়ে-পুরুষের হৃৎকম্প, সৃষ্টি যায় রসাতলে,—ত্রাহি মধুসূদন!

সুতরাং অশান্তির থেকে বাঁচবার জন্য সবাই মিলে ওই ডালিম গাছটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিল। ওই গাছের ডালে মধ্যে মাঝে চড়াই পাখী এসে বসে, কাক-কোকিল এসে গুটিফল ঠুক্‌রে যায়, লগি-বাঁশ টানতে গিয়ে হয়ত কোনো ডালে আঘাত লাগে,—আর অমনি সবাই ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকে। মামা বুঝি এইবার তাঁর ছুরিতে শাণ দেবেন।

ইহলোকে মামার দ্বিতীয় আকর্ষণ হোলো, একটি ধূসর বর্ণের বিড়াল। যতক্ষণ মামা বাড়ীতে থাকেন ততক্ষণ সেই জন্তুটি তাঁর আশেপাশে ঘোরে। চোখ দুটো তা'র কটা আর শান্ত। মামা বাড়ীতে আছেন, আর বিড়ালটাকে তুমি লোভ দেখাও,—সে ফিরে তাকাবে না। মাছের কাঁটা দেখাও, দুধের বাটি দাও, থালার উচ্ছিষ্ট বাড়াও,—গ্রাহ্যও করবে না। হয়ত একবার ফিরে তাকাবে,—কিন্তু তা'র তপস্বীর মতো দুই চোখ। সেই চোখ জরা, হিংসা, লোভ, মোহ—সমস্তর অতীত। বুঝতে পারা যায়, মনিব ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির মায়া-মমতায় তা'র বিশ্বাস নেই। বিড়ালটার নাম হোলো পুষি!

আয় পুষি, আয়!—মামার ডাকে পুষি কোথা থেকে ছুটে এলো পায়ের কাছে। মামা তাঁর কোঁচার খুঁট দিয়ে পুষির মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে বললেন, নাকে দাগ কেন রে? ওই গুয়োটারা কেউ তোকে বুঝি মেরেছে?—যা, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়!

বিড়ালটা মামার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন করুণ কণ্ঠে ডাকে। উভয়ের চারিটি চোখ, চারিটিই কপিশবর্ণ। মামা বলেন, পারবিনে, কেমন? তবে যা, মাগিকে ডেকে দে'। বলি, কোথায়?

মামীকে তিনি 'কোথায়' ব'লে ডাকেন। 'কোথায়' শব্দটা শোনামাত্র পুষি যায় ঘর থেকে বেরিয়ে। কিন্তু আমাদের এ তল্লাটে আসে না, কেননা জন্তুটা হোলো অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক। জানলা পেরিয়ে সে নামে বারান্দায়, সেখান থেকে খোলার বস্তির চালে, সেখান থেকে আঁস্তাকুড়ের ধারে,—আবার সেখান থেকে লাফিয়ে ওঠে মামীর রান্নাঘরের জানলার গরাদে। সেখান থেকেই ডাকে,—ম্যা...ও!

মরণ আর কি! দেবো অমনি খুন্তির বাড়ী দু'খানা ক'রে!—মামী অমনি খুন্তি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ান্। কিন্তু পুষি জানে, খুঁটিটা তা'র শক্ত। সুতরাং

মামীর শাসনে সে কেবল চোখ বুজে থাকে। যেন মামীর কণ্ঠসংগীতে সে একেবারে মুগ্ধ।

কোথায়?—উপর থেকে হাঁক আসে।

মামী ছুটে বেরিয়ে চ'লে যান। ততক্ষণে উপরতলা থেকে পুনরায় ডাক আসে, তামাক দিয়ে যাও!

তাড়াতাড়ি তামাক ধরিয়ে কল্‌কেটা হাতে নিয়ে মামী যখন ঘরে গিয়ে দাঁড়ান্—মামা ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, পুষির নাকে দাগ কেন?

মামী বিরক্তকণ্ঠে বলেন, ওকেই জিজ্ঞেস করো না?

হ্যাঁ করবো, তা'র আগে বাড়ীসুদ্ধ নিব্বংশ করবো! দাঁড়াও, ছুরিখানা আগে শানিয়ে নিই।

এমন সময় বিড়ালটা আসে জান্‌লা টপকিয়ে। মামা তাকে কাছে নিয়ে বলেন, কে মেরেছে তোকে?

ম্যাও!

আচ্ছা, বুঝলুম। কি করেছিলি তুই?

ম্যা....ও!

কিচ্ছু করিসনি, তবু মারলো? কে কে মেরেছিল?

মামা রাগে ফুলছিলেন, আর পুষি তাঁর কোলে নিরাপদ আবাস পেয়ে চোখ বুজে খরখর ক'রে নাক ডাকছিল! মামী বললেন, লোকে মারবে না কেন? একটা পোষা পায়রাকে খুন ক'রে এলো, তিনটে চড়াই পাখী খেলে সারাদিনে! ওদের ঘরে দুধের বাটি রাখার জো নেই, রান্নাঘরে একখানি মাছ খুঁজে পায় না ওরা—মার খাবে না?

থাম্!—মামা ধমক দিলেন,—তোর মতন ছিঁচকে চোর? পোষা বেড়াল চুরি ক'রে খায়? মায়ের কথা মাসিকে শেখাচ্ছিস? ওর কি জন্মের দোষ আছে?

ম্যাও!—কোলের ভিতর থেকে বিড়ালটা মামার অভিমতকে সমর্থন ক'রে উঠলো।

মুখে আগুন কথার!—ব'লে মামী সেখান থেকে চ'লে গেলেন হনহনিয়ে। মামা তামাক টানতে টানতে এক সময় চেঁচিয়ে বললেন, পাঁচ জনকে যদি খুন করি, তবে একবারের বেশী ফাঁসী হয় না! একথা হাইকোর্টের জজেও জানে!

হঠাৎ এধার থেকে দিদিমা হাঁক দিয়ে ওঠেন, তুই কা'কে খুন করার ভয় দেখাস র‍্যা?

মামা অধিকতরো উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করেন, তোমার গুষ্টিকে!

আমার গুষ্টি তুই ন'স? নিজের গলা কাট্ তুই আগে! নৈলে এখনই তোকে গো-টে-হেল্ করবো!

তামাক ফেলে মামা এগিয়ে আসেন। বলেন, ভোঁতা ছুরি দিয়ে আগে সবাইকে কাটবো কুচিয়ে, তারপর ফাঁসী যাবো!

ওঃ, লম্বা লম্বা কথা!—দিদিমা হেঁকে ওঠেন, আণ্টনী সাহেবের দপদপা! দেশে থানা-পুলিশ নেই, উকীল-মোক্তার নেই—?

আছে, সাক্ষীও আছে! একজোড়া ক'রে চটিজুতো কিনে দিলে দশজন সাক্ষী পাবো! বলবো, হুজুর, ধর্মাবতার—আমার বাপের নাম ফল্না ভটচার্যি! ধুঁতরো বিচি খাইয়ে এই মাগি তাকে পাগল ক'রে জাল-উইল সই করিয়ে নেয়। হুজুর, এ মাগি আমার কেউ নয়!

দিদিমা চীৎকার করলেন, মুখ সামলে কথা ক'স! এ আমার স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তি,—এক কড়া দাবি-দাওয়া নেই তোর! যদি বেশী কিছু করিস তবে তোকে পথের 'বেগার' ক'রে ছাড়বো!

হাইকোর্ট, হাইকোর্ট,—মামা বিদীর্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, হাইকোর্টে সব নিয়ে ফেলবো! এক দড়িতে বেঁধে নিয়ে যাবে সব! ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো! ওই তোমার এটর্নী, যারা সই করেছে জাল উইলের সাক্ষী হয়ে—ওদের বাপের নাম ভোলাবো।

যা, যা তুই—যা খুশি করগে! তোর ভারি খ্যামোতা! টিকে ধরাতে জামিন লাগে, তুই যাবি হাইকোর্টে! মরগে যা—

যাবো, তা'র আগে তোর গুষ্টিকে হাঁসপাতালসই ক'রে যাবো! বলে, যার ধন তা'র ধন নয়, নেপোয় মারে দই!

মামা ঘরে গিয়ে ঢোকেন, দিদিমা যান আহ্নিকের ঘরে।

ডালিম গাছ, বিড়াল, জাল-উইল আর হাইকোর্ট,—এ ছাড়া মামার প্রাত্যহিক

জীবনে আর একটা বিতর্ক ছিল। সে হোলো মামীর চরিত্র রক্ষার জন্য সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা!

কোথায়?

মামীর কোনো সাড়া নেই। মামা তৎক্ষণাৎ গড়গড়ার লম্বা চিম্‌টেটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। আবার হেঁকে ওঠেন, খুন করবো! বলি, কোথায়?

পড়ি ত' মরি ক'রে মামী ভিজা কাপড়ে ছুটতে ছুটতে আসেন। মুখ বিকৃত ক'রে মামা বলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

চুলোয়! দেখতে পাচ্ছ না কাপড় কাচতে গিয়েছিলুম? চোখের মাথা খেয়েছ?

হুঁ, কাপড় কাচতে! কলতলার ঘুলঘুলি দিয়ে ভাড়াটে বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিলিনে? ও-বাড়ীতে কে আছে তোর?

মামী হাত নাড়া দিয়ে বলেন, যম আছে!

যম নয়! সে তোর—

মামা একটি প্রাদেশিক শব্দ প্রয়োগ করেন—যেটি বাড়ীর পাশের খোলার বস্তিতে প্রচলিত। পুনরায় বললেন, জানি, সব জানি,—হাতে নাতে যেদিন ধরবো, সেদিন একেবারে কচুকাটা! ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে কোথায় যাস বল্ দেখি তামাকের আগুন ছুঁয়ে?

আ মর,—মামী মুখখানা ঝট্‌কা দিয়ে সরিয়ে নেন। বলেন, বুড়ো হয়ে মরতো চললো, কথা দেখো! নিত্যি অপমান, নিত্যি নিত্যি সন্দ'! বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! দুবছর হতে চললো একখান কাপড় দেয় না, এক পয়সার সাবান কিনে কাপড় কাচবার মুরোদ নেই!

মামা আবার চীৎকার করেন, পকেট মেরে পয়সা নিসনে? কা'র হাত দিয়ে পয়সা পাচার করিস? দুপুর বেলা কোথায় গিয়ে দেখা হয় তোদের? আমি কি জানিনে কিছু?

মামী কাপড় ছাড়তে ছাড়তে একেবারে জ্বলে ওঠেন,—মুখ প'চে যাবে, ধোয়া ছাতারে ধুয়ে যাবে! দশ বছরের মেয়ে এসেছি তোমাদের ঘরে, ভদ্দর নোকের ঘর দেখে বাপে বে' দিয়েছিল,—তারপর থেকে নিত্যি কেলেঙ্কার!

তামাক টানতে টানতে মামা বলেন, দোষ ক'রে ফের গজর গজর কচ্ছিস?

কিসের দোষ আমার? বলো, আজ বলতে হবে—নৈলে এখানে স্ত্রীহত্যে হবো! আজ এসপার-ওসপার হোক।

এঃ এসপার-ওসপার!—মামা মুখ খিঁচিয়ে বলেন, সতীপনা বাজিয়ে বেড়াস সবার সামনে! আমি জানিনে ইঁদুর-বেড়ালের লুকোচুরি খেলা? চুল এলিয়ে ছাদে কাপড় শুকোতো যাস,—রাস্তা থেকে দেখিনে?

মুখে আগুন তোমার।—মামী তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যান্।

অন্ধকারে মামীকে ব'সে থাকতে দেখলে মামা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে ওঠেন; আর যদি দেখা যায় মামী আপন মনে কাঁথা সেলাই করছেন—তবে ত সোনায় সোহাগা। অমনি মামা বলতে থাকেন, হুঃ। মতলব আঁটা হচ্ছে মনে মনে, কেমন? নীচের তলায় একা গিয়েছিলি কি করতে? আজ বুঝি দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি?

দেখা-সাক্ষাৎ—! মামী অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকান্। বলেন, কার সঙ্গে?

মামা আগুন হয়ে বলেন, কা'র সঙ্গে! আমার মুখ দিয়ে না শুনলে বুঝি মিষ্টি লাগে না? ঘরের দেয়ালের কান আছে তা জানিস? সেদিন কলতলায় কা'র পায়ের দাগ পড়েছিল? মাঝ রাত্তিরে জানলায় টোকা দিয়েছিল কে? আমার মাথার পাশের জানলা আধখানা ভেজানো ছিল কেন?

মামী হতাশ হয়ে বলেন, নাঃ এ একেবারে ভিমরতি! আজ একটা কেলেঙ্কার বাধিয়ে তবে ছাড়বে!

মামা তাঁর কপিশ চোখ দুটো ঘুরিয়ে বলেন, বলবো তবে? হাটে হাঁড়ি ভাঙবো দেখবি? সেদিন ভোরবেলা চান্ ক'রে এলি কেন? মনে করেছিস বুঝি আফিঙ খাই তাই ভোরবেলা ঝিমোই?

মামী আর রাগ সামলাতে পারেন না। ব'লে ওঠেন, ভোরবেলা গিয়ে চান্ করতে হয় কেন জানো না? কচি খোকা? বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, এখন ধম্ম তুলে খোঁটা দাও?

দেবো না? তোর আবার ধম্ম কি? আমার পঞ্চান্ন, আর তোর পঁয়তাল্লিশ,—এই ত' তোর খারাপ হবার সময়! তুই নাতি কোলে করলেও তোকে বিশ্বাস করবো না তা জানিস? 'মরবে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই!'

মামী ব'সে ব'সে মেঝের উপর আঙ্গুল দিয়ে দাগ টেনে বললেন, আমিও ব'লে রাখলুম একবার যদি কেষ্টনগরে যেতে পারি, তবে আর কোনো জন্মে পা দেবো না এই ভটচায্যি বাগানে! সৎমা আমার আজও বেঁচে আছে, আজও ভাই আছে দেশে!

মামা চেঁচিয়ে বলেন, বল্ কবে যাবি তুই, সেদিন গোবর জল ছড়া দেবো।

মামী বলেন, যাবার সময় হলেই যাবো! কা'রো তক্কা রাখবো না। পায়ের দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়বো।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে মামী শ্বশুরবাড়ী এসেছিলেন বিয়ের কনে। তারপর থেকে বাপের বাড়ী আর তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

হঠাৎ সন্ধ্যার পর মামা একদিন ফিরে এসে ডাকেন, কোথায়?

মামী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তামাক সেজে দেবার আয়োজন করতে থাকেন। মামা বলেন, কোথা ছিলি গা ঢাকা দিয়ে?

টিকে ধরিয়ে পাখার বাতাস দিয়ে মামী বলেন, বেলতলার ছাদে।

বেলতলার ছাদে? দখ্নে হাওয়া গায়ে লাগানো হচ্ছিল বুঝি? কা'র জন্যে পথ চেয়ে ছিলি?

মামী বলেন, আ মর, কথার ছিরি দেখো! একাদশীর দিনে একটু মহাভারত শুনছিলুম, তা'তেও সন্দ'!

মামা ঘাড় বেঁকিয়ে বলেন, মহাভারত শোনা হচ্ছিল, না দ্রৌপদীর সতীপনায় মজা পাচ্ছিলি? তুই ঘুরিস ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়, তা জানিস? ঘরে এত পুরুষ্টু গন্ধ কেন? কে এসেছিল ঘরে?

মামী দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠেন। বলেন, মুখখানা আঁস্তাকুড়েতে গিয়ে ঘ'ষে এসো,—যদি পরিষ্কার হয়! বলে, দরবারে মুখ না পায়, ঘরে এসে মাগ ঠ্যাঙায়! গাঁজায় দম দিয়ে এলে বুঝি?

কল্কেটা ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে মামী গড়গড়ার মাথার উপর বসিয়ে দেন্। মামা এবার একটু গুছিয়ে ব'সে তামাক টানেন। দেখতে দেখতে পুষি বিড়ালটা এসে তাঁর কাছ ঘেঁষে বসে।

মামা একসময় বলেন, ঘরে কেউ আসেনি বলতে চাস? তাহলে ওই গেলাসটা চিৎ করা কেন? কে জল খেয়েছিল? ঘরে মাদুর পাতলে কে?

দেশালাইয়ের কাঠি প'ড়ে রয়েছে কেন? বল্ দেখি পুষির মাথায় হাত দিয়ে তোর ক্যারেক্টার ঠিক আছে কি না?

মামী ঘৃণায় পিছন ফিরে ব'সে থাকেন, কোনো কথার জবাব দেন না। স্বামীর দিকে মুখ তুলে কথা কইতে তাঁকে কখনই দেখা যায়নি; এর মুখ উত্তরে, ওর মুখ দক্ষিণে। এক সময় মামী উঠে আবার বেলতলার ছাদের দিকে চ'লে যান্। মামা মুখ ফিরিয়ে বলেন, হুঁ, আর দেরি নেই! থলের মধ্যে পুরে মুখ বেঁধে বেড়াল বিদেয় করবো। রাত্তিরে ঘরে ঢুকলে হয়,—সতীপনা ঘোচাবো।

ম্যা...ও!—বিড়ালটা হঠাৎ একবার ডেকে ওঠে।

পুষির দিকে তাকিয়ে মামা বলেন, কি বললি?

পুষি আর কোনো জবাব দেয় না। মামার মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাকেন, কোথায়?

কণ্ঠস্বরের কঠোরতায় বাড়ীসুদ্ধ লোক চমকে ওঠে। সুতরাং মামী হন্তদন্ত হয়ে আবার এসে দাঁড়ান। বলেন, আবার কোন্ ছাদ্দের জন্যে ডাক পড়লো?

কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মামা বলেন, ডালিমগাছের ফুল তিনটে আছে কিনা দেখে আয়।

তিনটে আবার কোথায়? দুটো ফুল দেখলুম ত' বিকেলে!

দুটো! বেরোবার সময় তিন-তিনটে দেখে গেলুম, আর তুই বলিস দুটো? চোখে ধুঁতরো ফুল ফোটাবো! শিগ্গির দেখে আয়।—আচ্ছা চল্, আমিই যাচ্ছি—আলো ধর—

কেরোসিনের ডিবেটা হাতে নিয়ে মামী চললেন আগে আগে। বেলতলার ছাদে মহাভারতের আসর তখন ভেঙেগ গেছে। বিধবারা এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে সারাদিন ধ'রে শুকিয়ে। আলোটা উঁচুতে ধ'রে দেখা গেল, একটামাত্র ফুল আছে ডালিমগাছে, আর নীচের দিকে প'ড়ে আছে দুটো। মামা বললেন, কে ফেলেছে ফুল ছিঁড়ে? কা'র বাবার গাছ?

আসন্ন ঝড়ের আভাস পেয়ে এদিকে দিদিমা উঠে বসলেন। সারাদিনের নির্জলা উপবাস সত্ত্বেও তিনি প্রস্তুত। আমরা সবাই যে-যার গর্তে গিয়ে

ঢুকে মুখ বাড়িয়ে রইলুম। সকলের বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপন। আগুনের ফিন্‌কি কখন আসে ছুটে! অগ্নিকাণ্ডের আর দেরি নেই।

কিন্তু সন্ধ্যার পরে মামার চোখ দুটো থাকে মাদকের রসে নিমীলিত, চেঁচামেচিতে হয়ত বা মৌজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তিনি এবার দাঁত কিটিয়ে বললেন, আচ্ছা, আজ যেমন আছে থাক্‌। কাল সকালে উঠে পাখীর বাসা ভাঙবো!

তিনি তাঁর ডালিমগাছের দুরবস্থার চিন্তা আজকের মতন স্থগিত রেখে সেখান থেকে স'রে আসেন। কিন্তু ওই কেরোসিনের ডিবের আলোয় মুখ ফিরিয়ে দেখতে পান, দিদিমা ব'সে আছেন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মতন। তাঁকে দেখেই মামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, এই হোলো তোমার গুষ্টির বদমায়েসী। কাল সকালে একেবারে ঢাকিসুদ্ধ বিসর্জন দেবো!

দিদিমা প্রশ্ন করেন, তুই দেবার কে?

মামা বলেন, ফল্‌না ভটচার্যির বাড়ী—আমি তা'র ওয়ারিশ—

বটে! আর আমি যদি গোসাঁই কলুকে ডেকে কাল তোকে গলাধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রে দিই?

বেশ, দিয়ো। কিন্তু যাবার আগে তোমার গুষ্টিকে সাবাড় ক'রে তবে বাড়ী থেকে বেরোবো। লাঠিতে তেল মাখানো আছে, ছুরিতেও শান দিয়ে রেখেছি!

মামী কোনোমতে মামাকে টেনে-টুনে ঘরের দিকে নিয়ে চ'লে যান্‌। দিদিমা সেইখানে ব'সে রুদ্ধ আক্রোশে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকেন। আজ রাত্রের মতো ঝড়ের আশঙ্কাটা কমলো, কিন্তু মেঘের ঘনঘটা রয়ে গেল। কাল সকালে কি-হয় কি-হয়!

সেদিন রাত্রে কে যেন জানলার ধারে ওৎ পেতে শুনে এলো, মামী ফিস ফিস ক'রে অনেক কথা মামাকে শুনিয়ে চলেছেন।

হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় মামী চীৎকার ক'রে উঠলেন,—দেখো, দেখো তোমরা, সবাই মিলে দেখো,—আমাকে মেরে ফেললে, রক্তগঙ্গা করলে। দেখো তোমরা সবাই।

বাড়ীময় হুলস্থুল প'ড়ে গেল। যেখানে যে ছিল, চারিদিক থেকে ছুটে এলো। মামী হাউমাউ ক'রে কাঁদছেন,—বিনাদোষে মারলে! সকালবেলা বাসি মুখে উঠে কাজ করতে নেমেছি, মুখে একটি রা কাড়িনি! খুন করলে আমাকে, রক্তগঙ্গা করলে! তোমরা পুলিশ ডাকো, থানায় খবর দাও,—ডাকাতকে ধ'রে গারদে নিয়ে যাক্। ওগো আমার মা গো, ওগো কে কোথায় আছো গো! ওগো আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছে গো—

ব্যাপারটা জানাজানি হ'তে আর বাকি রইলো না। মামার নাকি হুকুম ছিল ভোরবেলা তাঁকে না জানিয়ে মামী যেন শয্যাত্যাগ না করেন। তবুও মামীর অবাধ্যতার জন্য মামা নিজের পৈতার গোছায় মামীর আঁচলের খুঁট বেঁধে রাখেন। কিন্তু মামার মাদকজনিত নিদ্রা ভাঙ্গতে একটু দেরী থাকার দরুণ মামী অতি সন্তর্পণে আঁচলের গেরোটি খুলে বাইরে চ'লে যান্। কতক্ষণ পরে ছাঁৎ ক'রে মামার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং পাশে শূন্য শয্যা দেখে তিনি চিম্‌টেটা হাতে নিয়ে ধাওয়া করেন।

কী কান্না মামীর! ডুকরে-ডুকরে কান্না, প'য়ত্রিশ বছর ধ'রে জীবনের ব্যর্থতায় কান্না!—ওগো তোমরা এর হেস্তনেস্ত করো, নৈলে আমি নিজে থানায় যাবো। পুলিশ ডাকো, বাড়ী ঘেরাও করো, খানাতল্লাসী হোক, আসামীকে বাঁধুক...

মাসিমারা এলেন, দীপু এলো ছুটে, ভাড়াতে বাড়ীর রাঙ্গাবৌ এলো, মিত্তিরদের বরদা ঝি এলো, এলো কার্তিক স্যাকরা আর বেহারীবুড়োর ছেলেরা, এলো নলিতবাবুর বউ। আমাদের হাঁড়িচড়া বন্ধ। দিদিমা এলেন, মা এলেন, এলো সবাই। বাড়ীর বাইরে লোক দাঁড়িয়ে গেল। পাড়ায় পাড়ায় খবর রটারটি।

লোহার চিম্‌টে দিয়ে মামীর মাথার ওপর এক ঘা মেরেছেন মামা। সেজ-মাসিমা সকলের আগে মামীর মাথায় জল ঢাললেন। বললেন, রক্ত কই, বউ?

মামী ফুঁপিয়ে বললেন, রক্ত কি আর আছে মিলির মা,—প'য়ত্রিশ বছরে সব রক্ত চুষে খেয়েছে ওই ডাকাত—

চুলের রাশির মধ্যে অনেক খোঁজাখুজি ক'রে সত্যই পাওয়া গেল একটুখানি ক্ষত, এবং এও সত্য—সেই ক্ষতে রক্তের আভাস রয়েছে। তবে কিনা চীৎকারের

'পরিমাণ একটু বেশী হয়ে গিয়েছে বটে। আর এত যে লোক জড়ো হয়েছে চারিদিকে, তাদের চোখে মুখে যেন কতকটা কৌতুকের ছায়া। মামী একটু যেন বাড়াবাড়িই ক'রে ফেলেছেন ; রক্তগঙ্গা অথবা খুনজখম—কোনোটাই নয়। ওটা চিমটের একটা খোঁচামাত্র। থানা পুলিশ, খানাতল্লাসী, আসামীকে গ্রেপ্তার—এসব কথা ওঠে কি?

পাড়ার লোকেরা একে একে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। মামী তখন বলতে আরম্ভ করলেন, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে কোম্পানীর রাজত্বে পাঁচ বছর জেল্। আমি ওকে জেলে পাঠাবো।

দিদিমা এবার বললেন, আচ্ছা, থাম্ এখন, অনেক কেলেঙ্কারী হয়েছে! তিলকে আর তাল করিসনে!

মামী হৈ চৈ ক'রে উঠলেন, কেন করবো না? স্ত্রীহত্যে দেখলে কি তোমাদের মন খুশী হোতো? আমি কিছুতেই অল্পে ছাড়বো না!

কি করতে চাস?

সকলের সামনে তোমার ছেলে ঘাট মানুক। তারপর একজোড়া শাড়ী এনে দিক্, একপো নারকেল তেল, একখানা গামছা, দুখানা সাবান! নৈলে এই ঘা আমি শুকোতে দেবো না,—খোঁচা দিয়ে জিইয়ে রাখবো। পাড়াসুদ্ধু লোককে দেখাবো!

এইবার মামা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি বিগত রাত্রির ঘটনার সূত্র ধ'রে বলেন, মাঝরাত্তিরে কে তোকে ডাকছিল ইসারায়, সত্যি কথা বল্।

সেজমাসিমা বললেন, দুর্গা দুর্গা...যত নোংরা সব কথা! যাও, ঘরে যাও!

মামী বলেন, ডাকছিল তোমার যম!

মামা পুনরায় বলেন, আমি সাড়া দিয়ে বললুম, কে রে? কোন্ আবাগের বেটা? মাগি আমাকে বোঝায়, ও হোলো টিকটিকি! টিকটিকি কি রে মাগি? একান্নটা টিকটিকি ম'রে তবে আমার মতন একটা তক্ষপ হয়, তা জানিস? আমি তখনি বললুম, দাঁড়া গুয়োটা,—ছুরিখানা আগে ধারি বাগিয়ে! অমনি ব্যস—তক্ষপের ভয়ে টিকটিকি একেবারে গাঁ ছাড়া! ধরেছিলুম প্রায় একেবারে হাতে নাতে! সতীপনা দেখে নিত পাড়ার লোকে!

অতঃপর স্ত্রীর চরিত্ররক্ষার চেষ্টায় মামা একদা স্থির করলেন, এ পাড়া ছেড়ে তিনি এমন এক স্থানে যাবেন, যেখানে গেলে দুষ্ট ব্যক্তিরা মামীর কোনো খোঁজ পাবে না। তাছাড়া মামীর পক্ষেও ধর্মে মতি থাকা এ বয়সে দরকার বৈ কি।

খড়দায় আছেন শ্যামসুন্দর, তাঁর মন্দিরের চারিদিকে পাড়া পল্লী। কাছাকাছি গঙ্গা, শ্যামসুন্দরের ঘাট। সামনেই সুখচর। মামা গিয়ে শ্যামসুন্দরের পল্লীর কাছে কোথাও একখানা ঘর ভাড়া ক'রে এলেন। ভাড়া নাকি তিন টাকা। তিনি নেশাপত্র ছাড়বেন, এবং বাকি জীবন গঙ্গাস্নান ক'রে কাটাবেন। শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরে ব'সে সকাল-সন্ধ্যা তপশ্চর্যা করবেন।

একখানা গরুর গাড়ী ডেকে এনে মামা তাঁর লটবহর তুললেন, এবং বিদায় নেবার আগে সকলকে একচোট গালমন্দ করলেন। গরুর গাড়ীর আগায় গাড়োয়ানের পাশে বসলেন মামা, মাঝখানে পুষি বিড়াল, এবং গাড়ীর ল্যাজের দিকে বসলেন মামী। জোড়াতালি দেওয়া পুরনো ছাতিটা খুলে মামা ধরলেন নিজের মাথার ওপর। গাড়ী ছেড়ে দেবার পর তিনি বললেন, হাইকোর্টে নালিশ করবো, জাল-উইল ধরিয়ে দেবো, তারপর গুষ্টিসুদ্ধকে পথে বসিয়ে একদিন এসে ফল্‌না ভট্‌চায্যির সম্পত্তি দখল করবো।

কিন্তু আরেকটা কারণ ছিল, সেটা মামা আর চেঁচিয়ে বলতে সাহস করেননি। ভাগ্নেরা নাকি সাবালক হয়েছে, তাদের কারো কারো আঠারো বছর পেরিয়ে গেছে,—সুতরাং এ বাড়ীতে মামীকে নিরাপদে রাখা আর সম্ভব নয়। লাঠি এবং ছুরির দ্বারা হয়ত সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, কিন্তু মামীর চরিত্ররক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—কোনো যুগের মামীরা নাকি বিশ্বাসযোগ্য নয়—এই হোলো মামার ধারণা! দেখতে দেখতে গরুর গাড়ীটি অলিগলি পেরিয়ে চোখের আড়ালে চ'লে গেল। গাড়ীর মাঝখানটিতে শান্তভাবে বসে ছিল পুষি—সেও কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে তীর্থযাত্রা করলো।

বর্ষাকালের পর আশ্বিনের দুর্গাপুজো। কার্তিক মাসের হিম পড়লো খড়দায়। বাবা শ্যামসুন্দর ছাড়া আর সকলেই প্রায় ম্যালেরিয়া জ্বরে বিছানা নিল। মামা প্রচুর আফিঙ সেবন করেন। তাঁকে যদি সাপে কামড়ায়, তবে

সাপই মরবে—তাঁর কিছু হবে না! কিন্তু ম্যালেরিয়া সাপ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর—সুতরাং মামারও জ্বর হ'তে লাগলো। মামা বলতেন, মামী নাকি সাপের চেয়েও সাংঘাতিক, তাই ওর জ্বর হয়নি একটি বারও।

সে যাই হোক, মাস চারেক পরে অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে মলিদাখানা গায়ে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে মামা আবার একদিন এসে এ বাড়ীতে নামলেন গরুর গাড়ী থেকে। মালপত্রগুলো সবাই মিলে হাতাহাতি ক'রে ভিতরে নিয়ে এলো। মামার তখন জ্বর এসেছে, উবু হয়ে তিনি বসলেন দরজার পাশে। হাইকোর্টে নালিশটা আপাতত স্থগিত থাক্, কিন্তু গরুর গাড়ীর ভাড়াটা এখন না পেলেই চলবে না। দিদিমা গালমন্দ দিতে দিতে টাকা বা'র ক'রে দিলেন। কথা রইলো এই, ফল্না ভটচায্যির সম্পত্তিটা ফেরৎ পেলে এটাকা মামা শোধ ক'রে দেবেন!

মামা শয্যাগ্রহণ করলেন, এবং মামী হলেন তাঁর সেবাদাসী। কিন্তু যে-ব্যক্তির কখনো অসুখ করে না, সে-ব্যক্তি অসুস্থ হ'লে বড়ই উতলা হয়। সুতরাং মামা ধ'রে নিলেন, এ যাত্রা তিনি আর বাঁচবেন না। মামী সকলকে ডেকে বোঝাতে চাইলেন, ও ঠিক বাঁচবে, ও দস্যুর কিছুতেই মরণ নেই!

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বাঁচলে তোর ভারি সুবিধে, না? মাথার সিঁদুরটাও থাকে, সতীপনাও থাকে—কেমন?

সাগুর বাটি মুখের সামনে ধ'রে মামী বলেন, তুমি মরলে সব পুড়বে, মুখখানা শুধু পুড়বে না—এই ব'লে রাখলুম।

মামা বলেন, তোর জন্যে মুখ পুড়েছে চিরকাল, পোড়া মুখ আবার পুড়বে কেমন ক'রে?

মামী তাঁকে ওষুধ খাইয়ে গা মুছিয়ে গায়ে ঢাকা দেন্। তারপর একসময় বেরিয়ে যান্ নিজের কাজে।

সেজমাসিমা কাছে গিয়ে বসলে মামা তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে কথা তোলেন। সেজমাসিমা ব্যস্ত হয়ে বলেন, ছি ছি, ও সব কথা বলতে নেই... চুপ করো তুমি!

আরে শোনোই না,—ভারি মজার কথা,—মামা বলতে লাগলেন, খড়দার কথা বলছি! রোজ মাঝরাত্তিরে কেউ-না-কেউ এক বেটা ঠিক আসতো! টোকা

দিয়ে ডাকতো মাগিকে দরজার বাইরে থেকে। আমার জ্বর, উঠতে পারতুম না। কিন্তু ছুরিখানা ঠিক বাগিয়ে রাখতুম।

সেজমাসিমা মামার দিকে তাকালেন।—

মামা বললেন, বোঝো কাণ্ড! এপারে খড়দা, ওপারে হোলো এঁড়েদা—আর মধ্যিখানে আগড়পাড়া! এঁড়েদা শালা আগড় পেরিয়ে এসে খড়ের আটিতে টান্ মারবে,—আর আমি বরদাস্ত করবো! ধরতে পারলে বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়তুম!

জ্বরের ঘোরে মামার চোখে তন্দ্রা আসে; সেজমাসিমা উঠে চ'লে যান্।

বলা বাহুল্য, গাঁজা-আফিঙের গুণে সেবার মামার ম্যালেরিয়া পালিয়েছিল।

কিন্তু সংসারে অভাব অনটন কিছুতেই আর ঘোচে না। বাড়ী ভাড়া যা পাওয়া যায়, তা'তে দিন পনেরো কোনমতে আধ পেটা খেয়ে চলে, বাকি পনেরো দিন হরিমটর! চা'ল-ডাল যদি বা জোটে, কয়লার অভাবে রান্না চড়ে না; আর তেল-নুন যদি বা জোটে, পোস্ত কেনার পয়সা নেই। সুতরাং দিদিমা স্থির করলেন, এ বাড়ী বেশী টাকায় সম্পূর্ণ ভাড়া দিয়ে অন্য কোথাও সস্তায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা! নাবালকরা মানুষ না হ'লে সমস্যার আর কোনো প্রতিকার হবে না।

সস্তায় ঘর ভাড়া কোথা? তিন চারখানা ঘর নিতে গেলে পনেরো টাকার কম কোথাও হবে না। তা ছাড়া এ বাড়ির টেক্স-খাজনা আছে, ধারদেনা আছে, অসুখ-বিসুখে ডাক্তার-বদ্যিও আছে। কাঁসারীপাড়ার রায়েরা এবাড়ী ভাড়া নিতে চায় সত্তর টাকায়। সামনের মাসের দোসরা তারিখে তা'রা এবাড়িতে আসতে প্রস্তুত,—এই কথা শুনে দিদিমা রাজি হলেন। কিন্তু আমাদের নিজের জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে কোথায়?

সবাই মিলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে মামা এসে খবর দিলেন, বাঘমারীতে একখানা একতলা বাড়ী আছে, খানচারেক ঘর, ভাড়া দশ টাকা। তবে কিনা বাড়ীটি একটু পুরনো, আর কলের জল নিতে হবে রাস্তার থেকে।

তুচ্ছ

অনেক প্রকার বিচার-বিবেচনার পর বাড়ীটি ভাড়া নিতে দিদিমা রাজি হলেন। সেকালে মাণিকতলার খাল পেরিয়ে কোন্ দিকে গেলে যেন পাওয়া যেতো বাঘমারীর জঙ্গল। যতদূর যাওয়া যেতো তাল-তেঁতুল আর নারকেলের বনবাগান, আসসেওড়া আর গাব গাছের ঝোপ, চারিদিকে জলা বিল। সেখানে দিনমানে ঘুরে বেড়াতো মাছরাঙ্গা আর শঙ্খচিল। ওই জলা-বিলের মাঝপথ দিয়ে চলে গেছে রেলপথ, তা'র বাঁশী বেজে যেতো চৈত্র-বৈশাখের নির্জন দুপুরে,—ঘূর্ণীধুলোর হাওয়ার হাহাকারে সেই বাঁশীর সুর বহু দূর পর্যন্ত ভেসে চ'লে যেতো,—যেদিকে বিদ্যাধরী নদী জলের অভাবে বুকফাটা তৃষ্ণায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে। এখনকার অনেকেই জানে চল্লিশ বছর আগে বাঘ আসতো ওই বাঘমারীতে। ওখানকার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতো নাকি রঘু ডাকাত তা'র দলবল নিয়ে। তাদের চেহারা নাকি এই পাট্টাপালোয়ান, গোঁফে চাড়া দিত, আর তেল মাখা লাঠির ওপর চাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠতো দোতলায়,—যেখানে জমিদারের ঘর। পাইক-পেয়াদাদের সঙ্গে লেগে যেতো তাদের মল্লযুদ্ধ। কিন্তু শেষকালে জয় হোতো রঘু ডাকাতের। ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে তা'রা বীরদর্পে হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে চ'লে যেতো। সুতরাং বাঘের ভয় আর ডাকাতের ভয়ে বাঘমারীর দিকে যাবার কারো সাহস হোতো না। সেদিকে ডাঙ্গায় আছে অজগর সাপ, আর বিলের মধ্যে কুমীর।

এই সমস্ত ভয়-ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একদিন কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াতে হোলো। মামা দিন দুই আগে দু টাকা দিয়ে সেই বাড়ী বায়না ক'রে এলেন। আমরা এবাড়ী ছেড়ে দেবার পরের দিনই কাঁসারীপাড়ার রায়েরা এসে এই বাড়ী দখল করবে এইরূপ স্থির ছিল। সুতরাং একাদশীর দিন সবাই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা ক'রে নিল।

বাঘমারী! নামটা শুনে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা বললে, পাঁচ টাকার কম যাবো না। গোয়াবাগানের পাল্কীর বেহারারাও বললে, খালের ওপারে যেতে তা'রা অপারগ। অতএব সবাই মিলে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। কেবল মালপত্র বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য এলো তিন চারখানা গরু-মহিষের গাড়ী। গরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহস্থকে পায়ে হাঁটা পথেই

যেতে হবে। যাচ্ছি সেই কোন্ ডাকাতের দেশে। কা'র ভাগ্যে কি আছে বলা কঠিন। অনেকেই বলে, বাঘমারীর দিকে গেলে আর কেউ ফেরে না। সেখানে পিছন থেকে গলায় ফাঁস টেনে দেয়; দিন-দুপুরে নিরীহ পথচারীর কাটা মুণ্ডু পথের ধারে গড়াগড়ি যায়, ডাকাতে কালীর মন্দিরে তান্ত্রিকরা সেখানে নরবলি দেয় এবং শাঁকচুন্নিরা রাঙগা পাড় শাড়ী প'রে তেঁতুলতলায় আর সেওড়ার ঝোপে-ঝাড়ে অবাধে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। ঘোড়ার গাড়ী আর পাল্‌কি যে সে-তল্লাটে যাবে না, এত' জানা কথা।

একাদশীর দিন ভোর হ'তেই আমাদের বুকের মধ্যে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর সময়টা জানতে পারলে মানুষের মনের অবস্থা কেমন হয়? পিছনে প'ড়ে রইলো আমাদের যা কিছু। বেলতলার ছাদটার ওই কোণে পুতুল খেলার ঘর, এই চিরপরিচিত ভিটের ছোট ছোট আঁকবাঁক,—যেখানে আমাদের প্রাণের লীলাক্ষেত্র, রইলো উত্তর-পূবের ওই নিম গাছটা—যার দিকে চেয়ে-চেয়ে কত অন্য মনস্ক দিন কেটেছে; রইলো তেতলার ছাদ—যেখান থেকে শিশুর চক্ষু আপন জগতের বাইরে গিয়ে বিশ্বের দিগদিগন্তকে কতবার দেখে এসেছে। ওই আকাশ পথে আসতো ঝুলন-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আসতো বিজয়া দশমীর বিচ্ছেদের সুর, আসতো হেমন্তের প্রথম স্নিগ্ধ হাওয়া, আর শোনা যেতো দোলের রাত্রির ফাগুয়ার গান। এবার আমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে সব,—নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে না গিয়ে আমাদের আর কোনো উপায় নেই।'

যাবার আগে বাড়ীময় কেঁদে বেড়ালো প্রায় সবাই।

পায়ে হেঁটে সবাই চলেছে। চলেছি ঈশান কোণের দিকে। ঈশানীর ভ্রূকুটি-কুটিলতা আমাদের ভাগ্যকে যেন অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চলেছে। পথে যেতে যেতেও অনেকের চোখে জল গড়াচ্ছিল।

পুঁটিবাগান পেরিয়ে চারখানা সারবন্দী গরু-মহিষের গাড়ী চলেছে মাণিকতলার রাস্তার দিকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ্দুর, পথও অনেক দূর। কা'রো হাতে বাল্‌তি, কারো হাতে ডাল আর মসলার পুঁটলী, কেউ নিয়েছে ভিজা কাপড়ের বোঝা। গাড়ীগুলির সঙেগ সঙেগ সবাইকে হন্ হন্ ক'রে যেতে হচ্ছে। রঘু ডাকাতকে আজো আমরা দেখিনি, কিন্তু গরুর গাড়ীর

গাড়োয়ানগুলোকে দেখে আমরা রঘু ডাকাতের খানিকটা আঁচ পাচ্ছি। ওরা গাড়ীগুলোকে ছুটিয়ে যদি এই দুপুর রোদ্দুরে পালায়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথায়? ওদেরকে চোখে-চোখে রেখেছি বটে, কিন্তু ওরা যদি বাঘমারীতে গিয়ে সেই নির্জন জঙ্গলের প্রান্তে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রঘু ডাকাতের দলের সঙ্গে যোগ দেয়, তবে আমাদের চুলের টিকি ছাড়া আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকবে?

জলের ঘটি তুলে সবাই জল খেয়ে নিল।

বড়দাদা নিয়েছে হাতে এক গাছা লাঠি। অজগর সাপ আর বাঘের পক্ষে এই লাঠিই যথেষ্ট। মামার কাছে আছে মস্ত এক ছোরা, সেটি তিনি গোপনে রেখেছেন,—কেননা রঘু ডাকাত নাকি ছুরি-ছোরাকে ভীষণ ভয় করে। আমাদের মালপত্রাদি এবং চেহারা-চরিত্র লক্ষ্য করলে সেদিন পৃথিবীর কোনো ডাকাত যে লুট-তরাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারতো না, একথা আমাদের কারো মনে হয়নি। কিন্তু বাইরে কোথাও ভয় না থাক্, ভয়ে আছে মনে। দিদিমার বাক্সে আছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি,—তাতে আছে সিঁদুর মাখানো পাঁচটি টাকা আর শালগ্রামের সোনার পৈতে। এ ছাড়া মেয়েদের নাককানের নোলক আর মাকড়ি; বাবা তারকনাথের দরুণ সোনা বাঁধানো কবচ,—এ ছাড়া আছে বৈকি সব টুমটাম। বাড়ীর পাট্টা আছে, ঠিকুজি-কোষ্ঠি আছে, কুলজি আছে,—আরো সব কি কি। ডাকাত পড়লে আগে কাটবে গলা, তারপরে লুটপাট।

বাঘমারী অনেক দূর। ধূলোয়, রোদ্দুরে আর ঘামে সবাই শ্রান্ত। মাণিকতলার খাল পেরোতেই কলকাতার শহর শেষ হয়ে গেল। বনবাগান আর একটু-আধটু খোলার বস্তি। গরু চরছে কোথাও, কোথাও বা ভেড়া ছাগলের পাল চলেছে। পথ এবার নিরিবিলি। সকলের মুখে চোখে আসন্ন আতঙ্কের ছায়া। ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। গরুর গাড়ীরা চললো ঢালু খোয়ার রাস্তায় গড়গড়িয়ে।

মামা ছিলেন আমাদের প্রধান দলপতি। কবে যেন তাঁর একটি পুরনো ছাতা ছিল, এখন ছাতা নেই, আছে ছাতার বাঁট। সেই বাঁট এখন তাঁর লাঠির কাজ করে। বাঘমারীর পথে ঢুকে ভাড়াটে বাড়ীর কাছাকাছি এসে মামা হাঁক দিলেন, খবরদার! সকলের আগে আমি, মনে রাখিস।

সবাই উৎসুক হয়ে তাঁর দিকে তাকালো। মামা সেই বাঁট তুলে বললেন, যদি আসে তা'রা আমি এগিয়ে যাবো সকলের আগে। এই লাঠি,—অন্ততঃ তিনটেকে নিকেশ করবো ব'লে রাখছি।

অনেকে ডরিয়ে উঠলো মামার নির্ভীক চেহারার দিকে তাকিয়ে। মামা তাঁর করাল দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় বললেন, রঘু আমাকে চেনে, তা'র গাঁজার কল্‌কে অনেকবার এই হাতেই সেজে দিয়েছি! আর তা'র দলবল? আসুক না তা'রা একে একে? বাপের বেটা যদি হয়, তবে একে একে ল'ড়ে যাক্‌ দেখি? কিন্তু খবরদার, আমি সকলের আগে।

দিদিমা তাঁর একমাত্র পুত্রকে চিনতেন। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, একলা পারবি? ভয় নেই তোর?

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, আমি কি মেনিমুখো যে, ভয় পেয়ে আঁচলের আড়ালে ঢুকবো? পিঠের দিকে কাছা গুঁজলেই আর পুরুষ মানুষ হয় না, মনে রেখো।

মামা ছাড়া আরো পাঁচটি পুরুষ আমাদের দলে আছে। কিন্তু রঘু ডাকাতের দল অতর্কিতে আক্রমণ করলে এই পাঁচজনের মধ্যে কয়জন সক্রিয় থাকবে, এইটি ছিল প্রশ্ন। পাঁচটির মধ্যে তিনটি একেবারেই নাবালক। চতুর্থটির বয়স ষোল। যিনি পঞ্চম, তিনি ডাকাত পড়ার সংবাদ শোনামাত্র কোথায় থাকবেন, পূর্বাহ্নে বলা কঠিন। অতএব আমাদের মামাই হলেন একমাত্র ভরসাস্থল। খুঁটি হিসাবে তিনি বেশ মজবুত, তবে কিনা সেই খুঁটিকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখা চাই।

বড়দাদা তা'র লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো। বললে, ভয় কি! মামার পরে আমি!

তুমি?—দিদিমা বললেন, তুমি না সেদিন কাবলীঅলাকে রাস্তায় দেখে পেছন দিকে লাঠি লুকিয়েছিলে? তোমাকে আমি চিনি।

বড়দাদা একটু বিমর্ষভাবে অন্যত্র স'রে গেল।

জরাজীর্ণ একখানা একতলা বাড়ীর ধারে এসে গরুর গাড়ীরা থামলো। বেলা তখন প'ড়ে এসেছে। বাড়ীর সামনে কোনো আব্রু নেই, পাঁচিলগুলো ভেঙে পড়েছে, উঠোনের উপরে প্রাচীন ভিটের স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ। আশ-

পাশের নিরিবিলি অঞ্চল ঝোপ আর জঙ্গলে আকীর্ণ। কাছাকাছি পাড়া পল্লী বিশেষ নেই। পরম্পরায় শোনা গেল এদিকে সাপখোপের ভয়ে সন্ধ্যার আগেই লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা হাসাহাসি করছিল, দিদিমা সেটি লক্ষ্য করেছেন। এক সময় বললেন, অ-ছেনু, জিনিসপত্তর নামাবার আগে তোমাদের আঁস-বঁটিখানা আমার কাছে রেখে যেয়ো ত' মা?

কিন্তু রাশি রাশি ঘর-বসতি জিনিসপত্র নামতে লাগলো সেই ভগ্নস্তূপের জটলার আশেপাশে। ঘরগুলি দেখে সবাই আঁৎকে উঠলো। অন্ততঃ দশ বছর এই ঘরে মানুষের বসবাস নেই। মেঝের উপর গাছ উঠেছে, কড়িকাঠের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়, সমস্ত দেওয়ালে উইপোকার দড়ি নেমেছে। ঘরের কোণে-কোণে মস্ত-মস্ত গভীর গর্ত। সেখানে সাপ অথবা শিয়ালের বাসা থাকা বিচিত্র নয়। কোনো ঘরে জানলার কপাট নেই, কোনো ঘরের দরজা খুলে নিয়ে গেছে। একখানা ঘরে কোনো এক জন্তুর একটি ক্ষুদ্র কঙ্কাল দেখা গেল,—বোধ করি কুকুরে টেনে এনেছে। বড় বড় বাদুড় আছে সব ঘরে। যেটার নাম রান্নাঘর, সেটার কাছাকাছি গিয়ে উঁকি মেরে সবাই ভয়ে পালিয়ে এলো। কি যেন একটা নড়ছে সেই ঘরের বুকচাপা অন্ধকারে। তা'র পাশে কুয়ো, তা'র ভিতর দিকে তাকালে গা ছমছম করে। এই বাড়ীটি বাসের উপযোগী ক'রে তুলতে অন্তত পনেরো দিন লাগবে। কিন্তু অপরাহ্নের কুটিল আলোয় ভিতরে এসে দাঁড়াবার মতো বুকের পাটা কা'রো ছিল না। সমস্ত বাড়ীখানার মধ্যে কেমন একটা অতি প্রাচীন জীর্ণতার বন্য ভৌতিক সোঁদা গন্ধ।

কে একজন মেয়েছেলে যাচ্ছিল পথ পেরিয়ে। সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, এ ভিটেতে তোমরা কেন এলে, মা?

আমরা এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছি বাছা।

ভাড়া নিয়েছ? এ যে হানাবাড়ী মা? বিশ বছর হতে চললো এ বাড়ীতে মানুষ ঢোকেনি! মালিকরা সবাই মরেছে ওলাউঠোয়। এ বাড়ী কা'র কাছে ভাড়া নিলে?

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি যাও বাছা, পথ দেখো। আমাদের ঘর আমরাই গুছবো!

স্ত্রীলোকটি চ'লে গেল। মামা বললেন, বুঝতে পারলে কিছু? এরা হোলো রঘু ডাকাতের চর! খবর নিতে এসেছে।

দিদিমা মামাকে চিনতেন। এবার একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, দু' টাকা দিয়ে তুই কা'র কাছে এবাড়ীর বায়না করেছিলি?

ওই নাও! সাপের খোলস এবার ছাড়লো!—মামা হেঁকে উঠলেন, কারো ভালো করতে নেই! বায়নার টাকা না দিলে সস্তায় বাড়ী ভাড়া পেতে কোথায়?

দিদিমার কণ্ঠ মামা অপেক্ষা দুর্বল নয়। তিনি চীৎকার করলেন, টাকা তুই কা'র হাতে দিয়েছিস, তাই বল্? টাকার রসিদ কই, বা'র ক'রে দে।

রসিদ! দেবো কাল সকালে! রসিদ দিলেই ত' তুমি বলবে জাল রসিদ! ওই মাগির কথা শুনে তুমি আমাকে চোর ব'লে ঠাওরাতে চাও, কেমন?

দিদিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, কাল তোর আপিঙের পয়সা ছিল না বলছিলি, আজ আপিঙ পেলি কোত্থেকে?

জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে চারিদিকে ছড়ানো। রাত্রে ঘরে ওঠবার কোনো উপায় নেই। আহারাদির কোনো রকম আয়োজন করা সম্ভব নয়। সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এসেছে। পথে আর বিশেষ লোক চলাচল দেখা যাচ্ছে না। আমরা সবাই কুণ্ডলী পাকিয়ে এক জায়গায় ব'সে রইলুম। আকাশে মেঘ করেছে।

এটা বাড়ীর উঠোন বটে। কিন্তু পাঁচিল এবং সীমানা না থাকার জন্য সামনের মাঠ আর গলিপথের সঙ্গে এই উঠোন একাকার। আমরা পথে ব'সে আছি বললে ভুল হবে না। এমন সময় মামা গলা তুলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, চুপ। বলি, শুনতে পাচ্ছ কিছু?

কি?

জঙ্গলের ভেতরে ফিসফাস কানাকানি? গাড়োয়ানগুলো মাল খালাস করতে করতে হাসছে কেন, বুঝলে কিছু?

একটু আগে মামার প্রতি চৌর্যবৃত্তির বদনাম দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু এই নিদারুণ দুর্দিনে তিনি ছাড়া আর কে আমাদের ভরসা? আমরা কান পেতে

শুনলুম, জঙ্গলের মধ্যে কানাকানিই ত' বটে। গাড়োয়ানদের সঙ্গে যে ওই জঙ্গলের অলক্ষ্য সম্প্রদায়ের যোগসাজস আছে, এতে আর সন্দেহ কি?

জন দুই গাড়োয়ান যমদূতের মতো গুটিগুটি কাছে এগিয়ে এলো। মুখে তাদের হাসি। হাসি দেখে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের গা ঢোল হয়ে এলো। মামা তাদের সেই ভয়ানক স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে ফস ক'রে বললেন, আমি ওই জঙ্গলের দিকে পাহারা দিইগে, তোমরা এদের সামলাও।

মামা তাঁর ছাতার বাঁট নিয়ে ভগ্নস্তূপের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাকি রইলুম আমরা। গাড়োয়ানরা বললে, ডর লাগা, বুড়িমা?

খবরদার!—দিদিমা হাঁক দিলেন, আর এক পা মৎ আগাও। ওরে, আঁস-বঁটিখানা নিয়ে আয় ত?

গাড়োয়ানরা হাসছিল। বললে, রাগ করিয়েছে বুড়িমা। আচ্ছা, আচ্ছা, হাম লোককো ভাড়া দেও, হাম চল্ যায়েগা।

কত ভাড়া তোদের?

চার গাড়ী কো ছয় রুপিয়া!

দিদিমা প্রতিবাদ জানালেন। পাঁচসিকা ক'রে চারখানা গাড়ীর ভাড়া হোলো পাঁচ টাকা। ওরা এখন চাইছে ছয় টাকা। ওদের মতলব ভালো নয়। কিন্তু এই নিয়ে বচসা দেখা দিল। গাড়ী ভাড়া ছাড়াও ওরা চায় জলপানি আর মালখালাসীর মজুরি। পাঁচ টাকার উপর আরো অন্তত দুটো টাকা।

মস্ত সমস্যা দেখা দিল। এ বাড়ীতে কোনোমতেই থাকা সম্ভব নয়। আজ রাত্রি নিরাপদে কাটবে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু আসছে কাল ভোরে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। আমরা সবাই ব'সে আছি খোলা আকাশের তলায়, সকলের হাত-পা ভয়ে জড়োসড়ো। আসছে কাল কোথায় যাওয়া হবে কেউ জানে না। কাঁসারীপাড়ার রায়েরা কাল সকালে এসে দিদিমার বাড়ী দখল করবে, সুতরাং সেখানে আর ঠাঁই হবে না।

ময়লা হারিকেনটা জ্বালা হোলো। কিন্তু আলোটা যেন চারিদিকের আতঙ্কটাকে আরো বেশী বাড়িয়ে তুললো। আমরা বরং অন্ধকারেই ছিলুম ভালো। চারখানা গরুর গাড়ী বোঝাই মালপত্র—কোন্‌টা কোনদিকে প'ড়ে রয়েছে এখন আর ঠাহর করা যাচ্ছে না।

হারিকেনের কালিপড়া আলোটায় গাড়োয়ানের দলটাকে দেখলে মনে দুর্ভাবনা আসে। যতশীঘ্র সম্ভব ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। সুতরাং ওদের সঙ্গে আর বচসা না বাড়িয়ে দিদিমা তাঁর কোমরের ঘুনসীর থেকে বাক্সের চাবিটা খুলে কা'র হাতে যেন দিলেন। সাতটি টাকা নিয়ে ওরা এখনই দূর হয়ে যাক্।

আমরা যে ভয় পেয়েছি এবং এই হানাবাড়ীতে এসে যে ভুল করেছি, একথাটা গাড়োয়ানরাও বুঝতে পেরেছিল। ওরা টাকা নিয়ে যখন একটু দূরে স'রে গেল, মামা তখন ওধার দিয়ে ঘুরে সকলের চোখ এড়িয়ে ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্যটা কি, আমাদের পক্ষে জানা শক্ত। কারো দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর হ'লে সে বুঝতে পারতো, গাড়োয়ানরা মামার চেনা লোক,—ওরা থাকে পুঁটিবাগানের লোহাপটিতে।

কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্য। তারপরেই মামা আবার সেখান থেকে স'রে গেলেন। পাঁচ টাকার বদলে গাড়োয়ানরা সাত টাকা কেন আদায় ক'রে নিল এবং মামার সঙ্গে তাদের কোনো গোপন চুক্তি ছিল কিনা,—এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে চাইলো না। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সকলেই তখন অবসাদে আর হতাশায় আচ্ছন্ন।

আকাশে মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ। অজানা অঞ্চল, মাঝে মাঝে শৃগালের ডাক, আশপাশে বনভূমি, কচিৎ শকুনের ডানা ঝটাপটি, কখনো দূরের কুকুরের ডাক, হানাবাড়ীর ভিতর থেকে মধ্যে মাঝে অলৌকিক শব্দ সাড়া—সমস্তটা মিলিয়ে রাতটা যেন বড় দুর্যোগের মনে হচ্ছে। চারিদিকে রাশি-রাশি অনাবশ্যক জিনিসপত্রের জঞ্জাল, নিষ্প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অতি-বাহুল্য—যেন সমস্তটা আমাদের মোহবন্ধন দশার একটা ছবি। বুঝতে পারা যায়, আমাদের দলের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধকারে ব'সে কাঁদছে। হয়ত ভগ্নী, হয়ত মা, হয়ত বা মাসী। কেউ কাঁদছে আগামী গভীর রাত্রির ভয়ে, কেউ বা কাঁদছে আগামীকালের দুশ্চিন্তায়। এমন দুরবস্থার জন্যে দায়ী হলেন মামা, কিন্তু এই দুর্যোগের রাত্রে তাঁর সঙ্গে কেউ বিবাদ করতে প্রস্তুত নয়। আরও এক বিপদের কথা, গাড়োয়ানরা অদূরে গিয়ে এক গাছতলায় গাড়ীগুলোকে

রেখে গরুমহিষগুলোকে বেঁধে ব'সে রয়েছে। জন্তুগুলোকে ঘাস আর জল সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে।

ওদের মতলব কিছু একটা আছে নিশ্চয়, এই মনে ক'রে আমাদের মনে দুরু দুরু কাঁপন লাগছিল। দিদিমা শান্ত স্তব্ধভাবে এক পাশে ব'সেছিলেন। রাতটা নিরাপদে কাটবে ব'লে মনে হচ্ছে না। যদি বা নিরাপদে কেটে যায়, কাল সকালে জিনিসপত্র নিয়ে কোন্ দিকে যে যাওয়া হবে তারও কোনো ঠিক নেই।

দেখতে দেখতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কালিঝুলি পড়া হারিকেনটা তেলের অভাবে নিবে গেল। মাথার উপরে শুধু রইলো মেঘময় অন্ধকার আকাশ, আর তা'র নীচে বনময় ঝিল্লিঝঙ্কারভরা হানাবাড়ীর অঙ্গন। এদিকে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় অবসাদে সকলেই জিনিসপত্রগুলোর আশেপাশে ধুলায় আর অনাদরে নেতিয়ে পড়েছে। কত রাত কেউ জানে না। চারিদিকে নিঃঝুম অন্ধকার। প্রাণি-জগতের কোনো সাড়াশব্দ কোনো দিক থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। সেই অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে নিজের গলার আওয়াজ শুনলেও নিজেদের ভয় করে। অনেকেই হয়ত জেগে আছে, কিন্তু তা'রা নিশ্চল পাথর। ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে রয়েছে সবাই।

থেলো হুঁকোয় মামার তামাক টানার শব্দটাও শেষ হয়ে এলো। ওদিকে গাড়োয়ানরা ভূতের মতো সেই গাছতলায় পড়ে রয়েছে। সমস্ত রাতই তারা থাকবে এখানে, কিন্তু কেন যে থাকবে—একথা ভাবতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হচ্ছে।

হঠাৎ চাপাগলায় মামা সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, শুনতে পাচ্ছ? কানের মাথা খেয়েছ নাকি?

সাড়া দেবার সাহস কা'রো হোলো না। সেজ-মাসিমা কেবল চুপিসাড়ে প্রশ্ন করলেন, কি?

ফেউ ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ না? ওদিকে এলো যে!

সমস্ত শরীর হিম হয়ে এলো, শিরাউপশিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ। চোখ বুজে কেবল কম্পিত-কান্নার আওয়াজ শোনা গেল, বিপদতারণ মধুসূদন! দুর্গমে রক্ষা করো!

মামা যেন আরো চাপা গলায় বললেন, আঁসটে গন্ধ! তোমরা যেন সাড়া দিয়ো না। গা শুঁকে আবার চ'লে যাবে।—রঘু ডাকাতের দল আসবে শেষরাত্রে!—ওই শোনো জঙ্গলে ছাগলের লটাপটি, বোধ হয় কামড় বসিয়েছে! এবার লাফ দিয়ে এসে পড়বে এদিকে—মানুষের গন্ধ ওরা অনেক দূর থেকে টের পায়!

অন্ধকারে আঁসবঁটিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড়দাদার হাতে ছিল লাঠি,—কিন্তু সে নিদ্রিত কি জাগ্রত বলা কঠিন। কেউ ঢুকেছে মালপত্রের নীচে, কেউ মুণ্ডটা লুকিয়ে রেখেছে বিছানার পুঁটলীর মধ্যে, কেউ নিজের দেহটাকে ঢাকা দিয়ে পুঁটলী পাকিয়ে মড়ার মতো প'ড়ে রয়েছে, কেউ বা নিজের উপরে বাক্স-প্যাঁটরা চাপা দিয়েছে!

আবার নিঝুম নীরবতা। কতক্ষণ বলা কঠিন। ভয়ার্ত ত্রস্ত কয়েকটি অবসাদগ্রস্ত নরনারী মৃত্যুর মতো নিশ্চল ও হিমাঙ্গ। মামা ফিসফিস ক'রে এক সময়ে ব'লে দিলেন, যাই ঘটুক না কেন, সাড়া দিয়ো না—দিলেই মৃত্যু। তবে হ্যাঁ, যদি রঘুর দল আসে,—তবে সকলের আগে আমি!

মামার নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন করার জন্য আমরা সবাই নিঃসাড় হয়ে রইলুম। কারো বা এর মধ্যে নাকও ডেকে উঠলো। অনেকে গাঢ় ঘুমে এলিয়ে পড়ছিল।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ কড়াং ক'রে একটা আওয়াজ। আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে শব্দটা ভালো ক'রে কানে না যেতেই আবার ঠিক ওই রকম আর একটা শব্দ। ঠিক যেন বাক্স-প্যাঁটরার কলকব্জা ভাঙ্গার হঠাৎ আওয়াজ। কেউ কিছুমাত্র সাড়া দিল না। এমন কি দিদিমার মতো চিরনির্ভীক বৃদ্ধাও তাঁর সাহস হারিয়ে এতক্ষণ পাথরের মতো পড়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনিও চাপাস্বরে বললেন, কে?

অন্ধকার নিরুত্তর!

কোনো একটা দেহ—সম্ভবত সে-দেহ সেজমাসিমার—সরীসৃপের মতো দিদিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর ইষ্টমন্ত্রের মতো ফিস-ফিস ক'রে বললে, দাঁত দিয়ে মাথার খুলি ভাঙলো! হাড় চিবোচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ?

দিদিমা আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখ মেলে তাকাবার সাহস কা'রো ছিল না। কিন্তু কান খাড়া থাকলে শোনা যেতো আশেপাশে একটু আধটু পায়ের শব্দ; ছায়া-মূর্তির মতো একটু আধটু নড়াচড়া,—কাছাকাছি মানুষের সমাগম হ'লে গায়ের বাতাস যেমন ভারী হয়ে ওঠে। আমাদের সকলের ভয়-ব্যাকুল স্তব্ধতার চারিপাশে অতি সন্তর্পণে যেন কিছু একটা ঘ'টে যাচ্ছিল। কিন্তু সোজা হয়ে উঠে ব'সে হাঁক-ডাক করবার মতো প্রাণশক্তি কা'রো ছিল না।

মাঝখানে অল্পক্ষণের জন্য হাল্‌কা এক পশলা বৃষ্টি আমাদের মাথার উপরে হয়ে গেল, সমস্ত মালপত্রকে ভিজিয়ে গেল। কিন্তু তবু আমরা সাড়া দিইনি, কেন না শেষরাত্রে রঘু ডাকাতের দলবল এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। বৃষ্টির পরে আমরা সবাই ভোরের প্রতীক্ষা ক'রে রইলুম।

দারিদ্র্যের থেকে জন্ম কুসংস্কার আর নীতিবিনষ্টির; ভয়ের জন্ম অপৌরুষ এবং অশিক্ষার থেকে। চল্লিশ বছর আগে একথাটা বুঝতে পারেনি কেউ। ফলে, একটি সমগ্র ভয়ার্ত রাত অন্ধকারে জন্তুর মতো লুকিয়েছিলুম।

এমন সময় ভোর হোলো। কাক-কোকিল ডেকে উঠলো। ঊষার কনকচ্ছটার স্পর্শে আমরা প্রাণলাভ ক'রে চোখ মেলে তাকালুম। ভয় আর দুর্যোগের রাত অতি দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।

ওই মাণিকতলাতেই বল্‌দেপাড়ায় বাড়ীভাড়া খুঁজে পাওয়া গেল। নতুন বাড়ীতে এসে পেঁছিতে হোলো গত রাত্রির ওই গাড়োয়ানদেরই সাহায্যে। এবারেও তা'রা নিল সাত টাকা, এবারেও মামা গিয়ে তাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে মিটমাট করলেন।

দ্বাদশীর উপবাস-ভঙ্গের দিন ছিল। কিন্তু জল-গ্রহণ করার আগেই দিদিমা মামার উদ্দেশে চীৎকার ক'রে উঠলেন, বাঘের ভয় দেখিয়ে কাল রাত্তিরে তুই বাক্স-প্যাঁটরা ভেঙেছিলি? তোকে আমি পুলিশে দেবো!

মামা হাঁক দিলেন, বিপদ কাটিয়ে এবার বুঝি আমার ওপর ফণা তুলতে চাও?

মুখ সামলে তুই কথা বলিস—দিদিমা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুই চিরকেলে চোর-ডাকাত, তোর কোনো ধর্ম নেই! তুই ঠগ, তুই জোচ্চোর,—রঘু

ডাকাতের ভয় দেখিয়ে তুই গাড়োয়ানদের কাছে দালালি খেয়েছিস! আমি তোকে জেলে দেবো!

মামা দর্পভরে বললেন, আমিও তবে এই চললুম। কামার বাড়ী থেকে আগে ছুরিখানা শানিয়ে নিয়ে আসি! ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখোনি?

দিদিমা হাঁকলেন, শিগগির তুই সোনাদানা টাকাকড়ি ফেরৎ দে,—নৈলে এখনই পুলিশে যাবো!

মামা জবাব দিলেন, যাওগে তুমি পুলিশে,—আমি এই চললুম হাইকোর্টে।

বল্‌দেপাড়ার বাড়ী থেকে মামা আর মামী পুরনো তোরঙ্গ আর ময়লা বিছানার পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দিদিমা সর্বস্বান্ত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন।

পরে জানা গেল মামা কাঁসারীপাড়ার রায়েদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিজের বাড়ীতেই উঠেছেন। তিনিও হাইকোর্টে যাননি, দিদিমাও পুলিশে যাননি।

বাড়ী বদলের ব্যাপারে মামা কিঞ্চিৎ লাভবানই হয়েছিলেন।

বল্‌দে পাড়ায় আমরা ছিলুম মাস তিনেক, কিন্তু সেখানে প্লেগের হিড়িক দেখা দেয়। সুতরাং সেখান থেকে পালিয়ে এখানে ওখানে কিছুকাল ঘুরে আবার আমরা এলুম মানিকতলার গা ঘেঁষে পুঁটিবাগানের দিকে। পুঁটিবাগানের প্রান্তে সরু গলিটা ছিল চাল্‌তাবাগানের গায়ে-গায়ে। লোহাপটি পেরিয়ে যেতে হোতো পূবদিকে। দক্ষিণ অংশটার দুইদিকে কালোয়ারদের বস্তি। সেই বস্তির থেকে শোনা যেতো অবিরাম লোহাকাটার শব্দ। লোহার কড়ির উপরে চিমটে দিয়ে একজন ধরতো ছেনি, অপরজন হাতুড়ি পিটতো সেই ছেনির উপর। বহুক্ষণ ধ'রে এই কাজ চলতো। অবশেষে সেই লোহা কেটে দুখান হোতো।

ওই প্রবল আওয়াজের রূঢ়তাটা বায়ুতরঙ্গে ভেসে-ভেসে যখন এসে কানে বাজতো, তখন সেটা কোমল। সেই ধ্বনিতে থাকতো কেমন একটি সঙ্গীতের ঝণৎকার,—চৈত্রের দুপুরে সেই সুর যেন বৈরাগ্যে উদাসীন, বর্ষার জলে সেটা যেন কেঁদে উঠতো, আর শরতের সোনার রৌদ্রে ওর মধ্যেই পাওয়া যেতো

আগমনী গান,—জগজ্জননীর শূন্য কোলে ফিরে আসার জন্য চিরকালের মা-হারানো মেয়ে যেন ওই ধ্বনির মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠতো।

চাল্‌তা বাগানের ওই গলির ভিতরে ঢুকে ঠিক মাঝামাঝি যে বাড়িটির নীচের তলায় আমরা ভাড়া ছিলুম, সে-বাড়িটি পুরনো আমলের। ছিল বাহির-বাড়ি আর ভিতর-বাড়ি—এবং দুইয়ের মাঝখানে গলিপথ। কঙ্কালের খুলির থেকে যেমন দাঁতের পাটি বেরোয় তেমনি এই প্রাচীন ইমারতের বালুখসা ভগ্নতার থেকে পাতলা ইঁটের স্তরগুলো যেন আমাদের দিকে কুটিল কটাক্ষে চেয়ে থাকতো,—আমরা তা'র তলা দিয়ে ঝাপসা ছায়ান্ধকারে আনাগোনা করতুম। ঠিক-দুপুরে একা বেরুতুম না আমরা ঘরের বাইরে, কেন না বিনা নোটিসে কোন্‌ সময় হঠাৎ কোন্‌ দেওয়াল থেকে নোনাধরা বালুর চাপড়া পড়তো যেখানে সেখানে। একটা ভৌতিক এবং অশরীরি হাতের এই কারসাজি মনে ক'রে আমরা সবাই আঁৎকে উঠে পালাতুম দিক্‌বিদিকে। শ্যাওলা ধরা কলতলার বন্যগন্ধের পাশে আবছায়ায় ছিল চৌবাচ্ছাটা—ওর কানায় কানায় ভরা ছলছলে জলের মধ্যে আমরা দেখতে পেতুম প্রেতের কটাক্ষ,—আর ওর পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় কেরোসিনের কুপিটা যদি দমকা হাওয়ায় নিবে যেতো—তবে সেখানেই কোনো কোনো বোনের দাঁতি লেগে যেতো আতঙ্কে। আর রান্না ঘরের দিকটাতেও সেই দশা। আকাশ থাকতো দোতলার অনেক উপরে,—নীচের দিকে আলোবায়ু রোধ করা বুকচাপা অন্ধকার। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হোতো কোনো কোনো ঘরে। সেই ঘরে গলার আওয়াজ করলে যেন ভাঙগা হাঁড়ির ভিতর থেকে শব্দ উঠতো। দুরন্ত ছেলে সেদিকে একলা প'ড়ে গেলে তা'র গা আসতো ছমছমিয়ে।

উপরতলায় থাকতো বাড়ীওয়ালারা। তা'রা নাকি জেলেটোলার কোন্‌ বাড়ুয্যে বংশ—বনেদী ঘর। তাঁদের কর্তার চেহারাটা ছিল সুগৌরবর্ণ, শিশু-পাঠ্য বইয়ের রাজা শিবাজীর মতো কাঁচাপাকা দাড়ি আর টানা-টানা চোখ। দশাসই চেহারা। ব্যবহার তাঁর অতি অমায়িক, এবং স্বভাবটি নির্বিকার। অপরাহ্ণের দিকে তিনি এক সময়ে বেরিয়ে যেতেন, এবং ফিরতেন অনেক রাত্রে। নিশুতি পল্লী,—তখনও সেই পল্লীতে ইলেক্‌ট্রিকের আলোর রেওয়াজ হয়নি। গলির মুখে অনেক দূরে জ্বলতো গ্যাসের আলো,—অন্ধকারের থেকে সেই

আলোটার কেমন যেন করুণ শুভ্রতা চোখে পড়তো। আর সেই বাড়ির দরজায় হাত রেখে কর্তা ডাকতেন কোমলকণ্ঠে, বানু, মা আমার, দরজাটা খোলো ত' মা?

বানুর বয়স চার বছর, সে থাকতো উপরতলায়—অঘোরে ঘুমিয়ে। সম্ভবত আসতো তা'র মা আলো হাতে নিয়ে। তারপরে কতক্ষণ চুপ। তারপর সেই রাজা শিবাজী গুনগুনিয়ে একটি গান ধ'রে ভিতরকার আঁকাবাঁকা পথ ধরে উপরে উঠে যেতেন। হয়তো কোনো কোনো রাত্রে ছাঁৎ ক'রে ঘুম ভেঙেগে যেতো তাঁর গান শুনে। সেদিন ওই স্যাঁতসেতে মেঝের উপর দরিদ্র বিছানাটা আর যেন ভালো লাগতো না। সর্বশরীরে মশার মতো কামড়াতো একটা অস্বস্তি; মন ছুটে যেতো তাঁর গান ধ'রে বাড়ির বাইরে—চাল্‌তাবাগান পেরিয়ে রাজা রামমোহনের মস্ত বাগান বাড়ি ছাড়িয়ে—যেদিকে কোনদিন যাইনি সেইদিকে। সেইদিকে হয়ত কোথাও আছে অবারিত মুক্তি; দুর্বার দুরন্ত কোনো গতি,—শাসন-বাঁধন-কাঁদনের বাইরে যদি কোথাও কিছু থাকে একটা আস্বাদ, একটা আশ্বাস। এপাশ ওপাশ ফিরে কেবলই ঘুমোবার চেষ্টা করতুম, কেবলই নিজের অবাধ্যতাকে শান্ত করবার জন্য নিজেকে ভোলাতুম।

বনেদীবংশের লোকেরা অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। কর্তা উঠতেন তখন বেলা দশটা। উপর-তলায় যেতে বাধা ছিল না। গিয়ে পড়তুম ওদের সকলের মাঝখানে। ছেলেমেয়েদের অতি সুশ্রী রূপ দেখে কুণ্ঠা ও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকতুম এক পাশে। যে-মেয়েটি বড়, সে আমাদের সমবয়সী—তা'র নাম সুলতা। বানু ছোট। বাপের ফাইফরমাস নিয়ে আছে সুলতা। কর্তার চোখে মুখে নির্মল প্রসন্নতা। চৌকীর উপরে ব'সে তিনি স্নান করেন, সুগন্ধ সাবান আর তেল, নধর একখানা মোটা তোয়ালে। এদিকে কোঁচানো মিহি ধুতি আর গেঞ্জি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাঘ্‌রা পরা হাস্যমুখী সুলতা। লোকটার গায়ের-রং থেকে যেন গোলাপের আভা ফুটে ওঠে।

হঠাৎ একদিন আমাদের মাঝখানে গল্পের আসরে ব'সে সুলতা বললে, তোরা এত কালো কেন, ভাই?

আমরা কালো? অবাক কাণ্ড! মামার বাড়ির পাড়ায় সবাই যে বলে, আমরা নাকি ফুটফুটে? আর দেখোনি বুঝি আমাদের বড়দিদির ছেলে-

মেয়েকে? কী রং বড় জামাইবাবুর! আর সেই আমাদের টেঁপিকে দেখলে তোদের চোখ ঠিক্‌রে যাবে! দেখতে চাস আমাদের ভাগলপুরের পিসিমাকে? দেখেছিস শিশিরকাকাদের? আমাদের কালো ব'লে বুঝি তোরা ঘেন্না করিস?

অভিমানে বোনেরা একেবারে ফুলে-ফেঁপে উঠতো। সুলতা হাসিমুখে বলতো, আচ্ছা বেশ, তোরা না হয় ফর্সা! কিন্তু আমার মতন গানের খাতা আছে তোদের? পাতায় পাতায় কেমন সুন্দর জলছবি লাগিয়েছি! দেখবি?

অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই সুলতা ছুটে গিয়ে তা'র গানের খাতা নিয়ে আসে। কত গান লেখা সেই খাতায়। কোনো গানের সত্য অর্থ পাইনে, কোনোটার অর্থ বা ঝাপসা। কিন্তু সকলের মাঝখানে ব'সে হঠাৎ এক সময় মুখ তু'লে বলতুম, তুই বুঝি ফুলের তেল মেখেছিস?

ফুলের তেল!—সুলতা হেসে উঠতো, দূর, আমরা কলু না বেনে যে, তেল মাখবো?

বোনেরা আবার ফুঁসিয়ে উঠতো। বলতো, আমরা তেল মেখে নাইতে যাই, আমরা বুঝি কলু? তুই ভাই বড্ড ঝগড়া বাধাস! ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা তোর!

ওর কোথায় ব্যাঁকা কথা রে? তোরাই ত' ঝগড়া বাধাস,—বলতে বলতে আমি নিতুম সুলতার পক্ষ।

এক বোন চেঁচিয়ে উঠতো, তুই ফের এসেছিস মেয়েদের মধ্যে কথা কইতে? ব'লে দেবো মা'কে?

গা ঢাকা দিয়ে তখনকার মতন স'রে যেতুম বটে, কিন্তু ওই ফুলেল তেলের মতন গন্ধটা যেতো আমার সঙ্গে সঙ্গে। ও গন্ধটা নতুন, ওটার মধ্যে দারিদ্র্যের স্যাঁতাপড়া বিকার নেই,—ওটায় যেন অভিজাত বনেদীর একটা আমেজ থাকতো; থাকতো যেন কেমন দুরাশার নিশ্বাস। কিন্তু সেই দুরাশা কি—অনেক সময়ে ভাবতুম নিজের মনে। হঠাৎ মনে প'ড়ে যেত গল্প। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া,—রাজপুত্র যেন চলেছে কোন্ বনে মৃগয়ার অন্বেষণে, আর কোন্ সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের দেশে রাজকন্যা থাকতো সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে। সোনার কাঠির ছোঁয়া না পেলে কিছুতেই সে জাগবে না।

এমনি ক'রে কল্পনাটা ছুটিয়ে নিয়ে যেতো যেন কোন্ দিকে ওর ওই গায়ের গন্ধ,—কোন হদিস পেতুম না তার। এই নীচের তলাকার আবছা অন্ধকারের থেকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যেতো আমাকে নিরুদ্দেশ পথের দিকে। মুক্তি পেতুম কষ্টক্লিষ্ট জীবনের থেকে।

মনে প'ড়ে যেতো সেই নণ্টুকে। সেও কাছে এলে এমনি গন্ধ পেতুম। সে-মেয়েটা ছিল খাদ্যলোভী, স্বভাব নিষ্ঠুর—কিন্তু উদ্দাম! প্রবল অটুট স্বাস্থ্য তা'র—কিন্তু গায়ে ছিল তার বন্য মাংসের গন্ধ। নণ্টু কাছে এলে আড়ষ্ট হতুম, সুলতা এসে দাঁড়ালে আনন্দ পেতুম। কিসের আনন্দ—কে জানে! সুলতার চোখ দুটো বিড়ালের মতো কটা—যেন দুই বিন্দু আকাশের আভা। ওই দুই চোখে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেতুম।

হঠাৎ নীচে এসে দাঁড়ালো সুলতা। হাতে তা'র একগোছা বই। ডাকলো, মাসিমা?

মা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কেন মা?

আপনার ছোট ছেলে নতুন ক্লাসে উঠেছে, তাই বাবা ওকে এই বই ক'খানা কিনে দিলেন!

দোলাই গায়ে জড়িয়ে আমি পাশে দাঁড়িয়ে। মা কতক্ষণ শান্ত অপলক চক্ষে সুলতার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন, ওর হাতেই দাও, মা?

গঙ্গার ঘাট থেকে মা এনে দিলেন বানুর জন্য আহ্লাদী পুতুল। দুটি পরিবার দেখতে দেখতে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নীচের তলাকার ভাড়া হোলো নয় টাকা। কিন্তু মাস তিনেক পরে সুলতার মা বললেন, ছেলে যখন চাকরি করবে তখন বাড়ী-ভাড়ার টাকা দিয়ো—এখন থাক্।

মা বললেন, সে কি কথা? তোমার টাকার দরকার নেই?

মাসিমা বললেন, থাকলেই বা, চ'লে ত' যাচ্ছে? তোমাকে আজ বাদে কাল মেয়ের বে' দিতে হবে, মনে নেই?

মা চুপ ক'রে যান্। আমি তাকিয়ে দেখি, তাঁর চোখে যেন কান্না আসে। দরিদ্র ভাই বোন আমরা, কষ্টের সংসার, দুঃখের দিনযাত্রা। কিন্তু ওর মধ্যেই দেখি, নীচেকার রান্না-তরকারি উপরতলায় যায়, আর দ্বাদশী কি পূর্ণিমায় মিষ্টান্ন ইত্যাদি আসে উপর থেকে নীচে। চেয়ে দেখতুম একটা মস্ত বনেদী

বংশের শাখা ক্ষয় হতে-হতে এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে নীচের তলায়। কিন্তু চরিত্রের আভিজাত্যের গুণে আত্মাভিমান কোথাও জায়গা পায়নি। সুতরাং আমাদের সঙ্গে ওরা মিলে গিয়েছিল অতি সহজে।

রাত সেদিন অনেক। শীতের সেই রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। হু হু ক'রে বইছে উত্তরের বাতাস। আর সেই বাতাসের ধাক্কায় কোথায় একখানা করোগেটের টিন মাঝে মাঝে ঝনঝন ক'রে আওয়াজ করছিল। ওই আওয়াজে ছিল একটা ভয়—ওটা কেবলই যেন ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে। নিশুতি রাত্রের দুর্যোগের মধ্যে কে যেন কঠিন হাতে ওই করোগেটের ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিচ্ছিল। পাড়াপল্লীতে কোথাও কোন সাড়া নেই।

এমন সময় বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়লো। মেসোমশাই অতি মিষ্ট মিহি কণ্ঠে ডাকলেন, বানু, মা আমার, দরজাটা খোলো ত' মা?

বাতাস বইছে দুরন্ত বেগে। লেপ আর কাঁথার মধ্যে সবাই জড়োসড়ো। কেউ জেগে আছে এমন কোনো প্রমাণ ছিলনা। তবু উপর থেকে সাড়া এলো—যাই।

বানু ওঠেনা কোনোদিন, তবু বানুকে ডাকতে ওঁর ভালো লাগে। ওই নামটির মধ্যে আছে তাঁর হৃদয়ের সুর, বাৎসল্যের সঙ্গীত। দেখতে দেখতে এক সময় আলো হাতে নেমে এলেন মাসিমা।

বৃষ্টি হচ্ছে। তবু ওর মধ্যেই গুনগুনিয়ে গান ধরেছেন মেসোমশাই। কী মধু কণ্ঠে তাঁর, কী যে কান্না ফুঁপিয়ে উঠছে তাঁর বুকের ভিতর থেকে! জলধারার সঙ্গে যেন চোখের জলেও বুক ভিজে যাচ্ছে সেই গানের।—"ওগো কাঙ্গাল, আমারে কাঙ্গাল করেছ, আরো কি তোমার চাই"—

এ মেসোমশাইকে আমাদের জানা নেই। দিনের বেলা তাঁকে কখনো কেউ গান গাইতে শোনেনি। তিনি গম্ভীর, তিনি প্রসন্ন, তিনি স্বল্পবাক্। উপর-তলায় তাঁর অস্তিত্ব সারাদিনে টের পাওয়া যায় না! সারাদিন পড়াশুনো নিয়েই তিনি থাকেন। মোটা মোটা বই—যা সচরাচর চোখে পড়ে না। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাঙ্গলা,—তাঁর সমস্ত বিছানাটার ওপর বই ছড়ানো থাকে। চশমা চোখে দিয়ে তিনি যেন ডুবে যান বিদ্যার সমুদ্রে। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাঁর নেই। পান, তামাক, চুরুট,—কোনোটাই তিনি স্পর্শ করেন না। সুতরাং,

যাঁর গলার আওয়াজ কোন সময়ে শোনা যায় না,—অথচ নিশুতি রাত্রে তাঁর গান শোনা যায় এ আমাদের কাছে বিস্ময়।

গানের মধ্যে যেন তাঁর মর্মচ্ছেদী বেদনা প্রকাশ পায়, যেটা দিনমানে নিস্তব্ধ। হৃৎপিণ্ডের থেকে রক্তাক্ত ব্যাকুলতা বেরিয়ে আসে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমে অচেতন। বিগলিত মাধুর্যের কান্না কেঁদে ওঠেন তিনি—সে কান্না যখন কারো কানে পেঁছিবে না! তাই বড় লোভ ওঁর মুখের চেহারাটা দেখবো ওঁর গানের সময়।

বিছানাটা ছেড়ে পা টিপে টিপে এলুম জানলার ধারে। সামনের উঠোন দিয়ে ওঁকে পেরিয়ে যেতে হবে। কেরোসিনের ডিবে হাতে নিয়ে সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে মাসিমা পা টিপে টিপে দরজা খুলতে গেলেন। আমাদের ঘরের দিকে একবারটি তাকিয়ে যেন মাসিমার চোখে মুখে আড়ষ্টতা আর সঙ্কোচ দেখা গেল। অতি সন্তর্পণে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুট্ করে দরজাটা তিনি খুললেন।

কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই দেখি মাসিমার বাঁ হাতে আলো, আর ডান হাতখানা মেসোমশাইয়ের হাত ধরা। মেসোমশাই তখনো গাইছেন—"ওগো কাঙ্গাল, আমারে—"

'আঃ থামো—হয়েছে! শুনবে যে ওরা! লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বসেছ?'—মাসিমা চাপা গলায় ধমক দিলেন।

মেসোমশাইয়ের পা টলছিল। এলিয়ে পড়ছিলেন তিনি এপাশে ওপাশে। আলোটায় দেখলুম তাঁর দুই নিমীলিত টানা টানা চোখ। সেই চোখে নিবিড় স্নেহ উচ্ছলিত। বিগলিত দেহতত্ত্বের রসবিহ্বলতা যেন সেই সুন্দর মুখখানাকে অপরূপ করে তুলেছে। চিরকালের ভিখারী ভোলানাথ যেন চলেছেন সর্বস্বান্তের আনন্দ নিয়ে। এ গান সত্য হয়ে উঠেছে ওঁর ওই চেহারায়। মুগ্ধ চক্ষে আমি চেয়ে রইলুম। দূরের থেকে কেবল মাসিমার চাপা কণ্ঠস্বর কানে আসতে লাগলো, শীতের ঠাণ্ডা পেয়ে বুঝি আজ বেশী মাত্রায় চড়ানো হয়েছে? মরণ আর কি!

সঙ্গীতের সুরে তার জবাব পাওয়া গেল—"আরো কি তোমার চাই!"

তুচ্ছ

মেজবোনের বিয়ে হয়ে গেল ওই নীচের তলাটায়। নদীয়া জেলার এক চাষীগ্রাম থেকে এসেছে পাত্র। চেহারাটা গ্রামের সঙ্গে মেলানো, তার ওপর আছে কলকাতার বউবাজারের ছাপ। তেল না মাখলে টেরি কাটা যায় না। সাগর ছেঁচা মাণিক এলো ঘরে।

আসরের পাশে এসে দাঁড়ালো সুলতা। সেই সুলতা এ নয়। পরণে তা'র শাড়ী, গায়ে জামা। বেণী দোলানো সুলতা নয়; এলো খোঁপা পিছন দিকে। গতকাল পর্যন্ত যার দুরন্তপণা দেখেছি, আজ তা'কে দেখে সম্ভ্রম বোধ জাগে। বালিকারা চক্ষের পলকে বড় হয়ে যায়—আর হাফপ্যাণ্ট পরা সমবয়স্ক বালক নির্বোধ চক্ষু মেলে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। সুলতার কাছে যেন ছোট হয়ে গেলুম। প্রসন্ন হাস্যে মহীয়সীর চেহারা নিয়ে সে দাঁড়ালো আমার সামনে।

চোখে তার চঞ্চলতা নেই,—চলনটা শান্ত। বিয়ের ব্যাপারটা চুকে গেল দুদিনে, কিন্তু বদলে দিয়ে গেল সুলতাকে। সহাস্য শাসন ছিল সুলতার দুই চক্ষে, এখন এলো শান্ত স্নেহ। আগে সে আগেভাগে এসে নাবালকদের আসরে জায়গা জুড়ে বসতো, এখন সে জায়গা নিয়েছে বড়দের মহলে। স্নানের সময় সবাই মিলে আমরা জল ছোড়াছুড়ি করতুম, এখন সুলতা স্নান করতে যায় মেয়েদের দলে। মনের ভুলে যদি বা কখনো হঠাৎ ছিটকে আসে সামনে—কিছুক্ষণের পর হঠাৎ উঠে আবার চ'লে যায়। দূরে যাচ্ছে সে দিনে দিনে। কিন্তু কেন সে দূরে যাচ্ছে, কেনই বা দিনে দিনে এত ব্যবধান বেড়ে উঠছে, একথা কোন দিন জানতে পারতুম না। আমার সংশয়াচ্ছন্ন মন একাগ্রভাবে উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। মন কেঁদে উঠতো জিজ্ঞাসায়।

কালোয়ারি বস্তির আনাচে-কানাচে আছে কি আমার প্রশ্নের উত্তর? লোহার ছেনির সাহায্যে লোহার হাতুড়ি মেরে লোহার কড়ি কাটা হচ্ছে—যে আঘাতে শোনা যাচ্ছে কঠিন একটা যন্ত্রণার আর্তস্বর,—ওই সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যাবে কি প্রশ্নের জবাব? কাঁসারিরা যায় ভরা দুপুরে ঠন্‌ঠন্ ক'রে কাঁসি বাজিয়ে,—সেই বাদ্যের শেষ ধুয়াটায় পাওয়া যায় করুণ একটা কাতরতা। মধ্যাহ্ন কাকের ক্লান্ত কণ্ঠে; চুড়িওয়ালীর কাঁচের চুড়ির ঝনৎকারে, দূরের

রেলের বাঁশীতে, সন্ধ্যারতির মঙ্গল ঘণ্টায়—ওদের মধ্যে পাওয়া যাবে কি আমার ক্ষুধার্ত প্রশ্নের সদুত্তর?

সদ্য বিবাহিত মেজবোন গেছে শ্বশুরবাড়ি, আর ছোটবোন থাকতো ঘর-কন্নার কাজ নিয়ে। সুলতার ছোট ভাইটি চাটুয্যেদের গলিতে সারাদিন গুলিখেলা নিয়ে থাকে। আমার গতিবিধি ছিল আনাচে-কানাচে।

সুলতা বলে, আমাকে মাথার কাঁটা এনে দিবি—? ওই যে ডাক্তার-বাড়ির গায়ে মনোহারির দোকান, ওখানেই পাবি। কাঁটা এনে দিলে তোকে দইয়ের পয়সা দেবো।

লোভটা সামান্য নয়। বললুম, তুই ত দোকান চিনিস, আন্ না কেন?

আমার যে বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে গেছে রে!

কেন?

কী বোকা তুই!—এই বলে সুলতা তিনটি পয়সা আমার হাতে দেয়। ওর মধ্যে এক পয়সা দই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পছন্দসই চুলের কাঁটা হাতে পেয়ে সে খুশী হয়ে বলে, জলছবিগুলো নিবি?

কই, দে?

সুলতা তার কাগজের বাক্সের থেকে একে একে সমস্ত জলছবিগুলি আমাকে বের করে দেয়। এই মহামূল্য রত্নরাজি নিয়ে কতবার যে সাংঘাতিক মনোমালিন্য হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু আজ তার এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য দেখে আমি যেন হতবুদ্ধি। এই দান মনে আনে দুর্ভাবনা, কিছু বা বেদনা-বোধ। চেয়ে দেখছি, মন তার নির্বিকার,—সব যেন সে দিয়ে দিচ্ছে। এমন দুর্লভ কিছু তার পাওয়া হয়েছে, যার জন্যে আজ সম্পূর্ণ রিক্ত হবার তার ভয় নেই। যে জলছবি পাবার জন্যে আমার উগ্র বাসনার অন্ত ছিল না, অপ্রত্যাশিত সেই বস্তু হাতে পেয়ে আজ যেন নেবার উৎসাহও আর রইলো না। তবু নিলাম। কিন্তু নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমগ্র সত্তা যেন অস্বস্তিতে রি রি করতে লাগলো। কান্না এলো চোখে।

সুলতা হঠাৎ ভুলে গেল পুতুল খেলা। প'ড়ে রইলো তার 'নেত্য' আর 'কালাচাঁদ', পড়ে রইলো পুঁথির মালা আর বর-কনে—সমস্ত ফেলে সে চ'লে

গেল। তিন চারজন মিলে পাথরের ঘুঁটি খেলার যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা,—সেদিকেও সুলতার আকর্ষণ গেল-ক'মে,—সবচেয়ে আশ্চর্য এই। এই খেলায় সে এমন ক্ষিপ্রহস্ত ছিল যে, তার জুড়ি মিলতো না। ক্যারম্ বোর্ডে সে আমার সঙ্গে বসতো, কিন্তু সেই শূন্য বোর্ডটা আজ যেন মরুভূমির মতো মনে হোল,—তার যেন এপার ওপার নেই।

দিদির বাড়িতে গিয়েছিলুম ম্যালেরিয়ার দেশে। সপ্তাহ খানেক বাদে যখন ফিরে এলুম, শুনলুম—সামনের বুধবার সুলতার বিয়ে। সন্ধ্যালগ্নে কাজ।

ময়ূরের পেখম মেলে নেচে উঠলুম আমরা আনন্দে। শুধু আমরা নই। প্রতিবেশী মহলে সুলতা ছিল সকলের অতি প্রিয়, তারাও উল্লসিত। এত অল্প বয়সে বিয়ে শুনে সবাই আশ্চর্য। কিন্তু মেয়ের বাড় নাকি কলাগাছের মতো—বিয়ে না দিলেই নয়। কাপড় প'রে এসে দাঁড়ালে সুলতা নাকি মস্ত ডাগর মেয়ে। পাত্রপক্ষ গিনি দিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করে গেল সোমবারে। কপালে চন্দন চিত্রাঙ্কন নিয়ে সুলতা সকলের মাঝখানে সলজ্জ হাস্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাকা দেখার কল্যাণে আমার ভাগ্যে জুটে গেল একখুরি দই।

দৈবক্রমে নীচের তলায় আমরা পড়ে গিয়েছিলুম। সেই নীচেটায় নিম্নস্তরের গভীরতা, সেখানে অন্ধকারে আলো জ্বালবার কেউ ছিল না, সেখানে দরিদ্রের গুহা, বিদুরের খুদ। সেই অনেক নীচের থেকে তাকাতুম উপরদিকে—যেখানে আলোকের উৎসব, এক ফালি আকাশের যেখানে আশ্বাস, যেখানে দৈন্যের থেকে অসীম মুক্তি। যদি উঠতে পারতুম সেই গভীর অন্ধকারের থেকে উপরের দিকে তবেই সুলতার ধরাছোঁয়া পেতুম। কেননা অর্থহীন দুরাশায় মনটা কাঙ্গাল হয়ে উঁচুর দিকে হাত বাড়াতো।

শোনা গেল, বিয়ে ত' এবাড়ীতে নয়—জেলেটোলায় ওদের আদি বাড়িতে। সেখানে বনেদী ব্যবস্থা, মস্ত পুজোর দালান আর নাটমঞ্চ। অনেক লোকের ভীড় হবে সেখানে; অনেক আত্মীয় কুটুম্ব মিলে সেখানে শুভ বিবাহের উৎসব। অতএব সবাই মিলে চলে যাবে জেলেটোলার বাড়িতে। সেখানেই যা কিছু।

তুচ্ছ

মাঘের শীত তখনো বেশ। কয়েকদিন আগে হয়ে গেছে সরস্বতী পুজো। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সরস্বতীর সঙ্গে সুলতার কোথায় যেন মিল আছে। ওর হাতে যদি থাকতো বীণা, আর পায়ের কাছে থাকতো রাজহাঁস,—আর যদি থাকতো ওর খোলা এলো চুল—তবে ওকে ফুলের গয়না পরিয়ে মঙ্গল ঘণ্টা বাঁ হাতে নিয়ে আর ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ ধরে আরতি করা চলতো।

অতিশয় আনন্দে মাতামাতির ফলে আমার জ্বর এলো ঠিক গায়ে-হলুদের দিনে। ম্যালেরিয়া জ্বর এলো কাঁপতে কাঁপতে; কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুতে হলো অন্ধকার নীচের তলাকার মাঝের ঘরের এক কোণে। জ্বরে আমি বেহুঁস। জ্বর তার নিজেরই নিয়মে ছাড়বে, সুতরাং চিকিৎসাদির কথা আপাতত ওঠে না। গায়ে-হলুদটা হয়ে গেছে দুপুর বেলায়, কিন্তু হলুদে-রংটা রেখে গেছে আমার দুই চোখে। ঘোলাটে চোখ দুটো মাঝে মাঝে খুলে আবিল অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি, হল্‌দে ছায়া। সরস্বতী পুজোর দিনে ওই রংটায় কাপড় ছুপিয়ে পরেছিল মেয়েরা--ওটা নাকি বাসন্তী রং। সুতরাং জ্বরে অচেতন থেকেও অর্থহীন দুই চোখ মেলে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি বাসন্তী রংয়ের বন্যায় ছেয়ে গেছে সব।

পরদিন অপরাহ্ণে বিয়ে [illegible] উদ্দেশে বাড়িসুদ্ধ সবাই চ'লে গেল। কেবল রইলো পাশে[illegible] ঘরে ছোড়দাদা—কেননা তার পাসের পড়া। আমি পড়ে র[illegible]ম ছেঁড়া তো[illegible] আর কাঁথা জড়িয়ে। জ্বরে অচেতন। কিন্তু ঠিক মনে নেই, সকাল থেকে বিকারের ঘোর ছিল কিনা। সেই বিকারের মধ্যে হয়ত যাবার আগে সকালের দিকে কোন্ এক সময় মাথার কাছে এসে সুলতা হেঁট হয়েছিল। পিছনে পিছনে রাজহাঁসটা এসেছিল, বীণার বিলাপ বেজেছিল আমার কানে। বাসন্তী রংয়ের দুই দৃষ্টি মেলে হয়ত দেখে ছিলুম সুলতার সর্বাঙ্গে ফুলের গয়না, মাথায় মরকত মুকুট, চক্ষে বরাভয়, অঙ্গে অঙ্গে ভূষণের শোভা। সে হয়ত বলে থাকবে, বিয়ে বাড়িতে তুই যেতে পারলিনে, তোর জন্যে ঠিক আমি দই পাঠিয়ে দেবো, দেখে নিস।

নীচের তলাটায় অন্ধকার হয়ে এসেছে ভর সন্ধ্যায়। ছোড়দাদা আলো জ্বালালো পাশের ঘরে। মাঝখানে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল, আমি নিঃশব্দে পড়ে আছি।

তুচ্ছ

হঠাৎ উঠে বসলুম এক সময়ে। লগ্ন বোধ হয় আসন্ন। সানাই বেজে উঠেছে, বর আসছে চতুর্দোলায়—ইংরেজী বাজনা বাজছে তার আগে আগে। দোলাই খানা মুড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ির থেকে। পা দুটো যেন আজ ঠিক নেই। এলোমেলো পা—যেন মেসোমশাই। ওই গানটা আমারও মুখে আসছে গুনগুনিয়ে—'ওগো কাঙগাল, আমারে কাঙগাল করেছ, আরো কি তোমার চাই?'

জেলেটোলার বাড়ি আমি চিনতুম। ইস্কুল যাবার পথে ওই পথটা থাকতো বাঁ হাতি—যেদিক দিয়ে মা যেতেন নিমতলার ঘাটে। আমি যেতুম সঙ্গে। কেউ না দেখতে পায়—এমনি করে দোলাই মুড়ি দিয়ে খালি পায়ে এসে ঢুকলুম বাড়িতে। সামনেই মস্ত উঠোন, আর দুর্গাদালানে কারবাইডের আলোয় বসেছে বিয়ের আসর। ঘন সবুজ বেনারসী পরা সুলতা—বড় বড় সোনালি ফুল সেই বেনারসীতে। পিঁড়ির উপর সে বসেছে অল্প ঘোমটা টেনে। সামনের পিঁড়িতে বসেছে বর। বহু মেয়ে পুরুষ বালক বালিকায় আসর ভরে উঠেছে।

দোলাই ঢাকা ছিল সর্বাঙ্গে, পাছে বাড়ীর লোক দেখতে পায়। শুধু চোখ দুটো ছিল খোলা—সেই চোখ জ্বরে কাঁপছে। উৎসাহ ছিল না-দেখা পর্যন্ত। দেখার পর কী ক্লান্ত অবসাদ। কিন্তু কী দেখতে এসেছিলুম, মনে আছে কি? মনে আছে কি, জন্মজন্মান্তরের কোনো ধারাবাহিকতা? আমার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল আবিল নিদ্রায়। ঘামের ফোঁটা নেমেছে কপাল বেয়ে, দুই চোখ বেয়ে নেমে এসেছে লোনা জলের ফোঁটা ঠোঁটের দুই কোণে।

চাকর-বাকর দলের আড়ালে একপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখলুম নিজেকে। কিন্তু আর নয়। এ দৈন্য নিয়ে এখানে আর দাঁড়ানো চলে না। কেউ যেন না জানে, লুকিয়ে এখানে এসেছিলুম কাঁদতে। না জানে কেউ, ম্যালেরিয়া জ্বরে খাদ্যের দিকে আমার টান ছিল। আমার খাবার লোভ—সবাই জানে।

জ্বর ছেড়েছিল প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে। বিয়ে হয়ে যাবার পরেও বিয়ের আলোচনা চলে অনেক কাল পর্যন্ত। কিন্তু ওর মধ্যেই এক সময়ে শুনতে পেয়েছিলুম, বিয়ের পরদিন শ্বশুর বাড়ী যাবার আগে সুলতা সত্য

সত্যই আমার জন্য খানিকটা দই পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঋণ পরিশোধ সে করে গেছে বৈ কি।

দইয়ের আর এক নাম হোলো অমৃত!

⁘

বছর খানেকের ওপর কেটেছিল পুঁটিবাগানে। কিন্তু খরচ কুলিয়ে উঠছে না। ঘরভাড়া আরো কমাতে না পারলে ঘর চলছে না। অতএব আমরা একদিন ট্রামরাস্তা ছাড়িয়ে বাহির শিমলা পেরিয়ে এসে উঠলুম এক বোষ্টমের একতলা একখানা বাড়ীতে। বাড়ীর কর্তার নাম হোলো নিবারণ বোরেগী।

ছোট্ট একতলা। পূর্ব-পশ্চিম দুটি অংশ। মাঝখানে পরিস্কার সিমেণ্টের ঝরঝরে উঠোন। বাড়ীটির থেকে ট্রামরাস্তা অনেকটা দূরে। ডান-হাতি পোষ্টআপিসের বাড়ী ছাড়িয়ে বাঁ হাতি গলি। সেই গলি এসেছে এঁকেবেঁকে পশ্চিমে। পথেই পড়তো খেলার মাঠ, আর সেই মাঠের কোণে ছিল আমাদের বাঙগলা-মাষ্টার হেমবাবুর বাড়ী। নিবারণ বোরেগীর বাড়ীটির দক্ষিণেও ছিল খোলা অনেকটা জায়গা, আর তারই দক্ষিণ প্রান্তে পথের ধারেই ছিল জীবন দাসেদের মস্ত বাড়ী।

জীবন দাস! তা হ'লে বলি। ওই যে বিস্তৃত খোলা জায়গাটা,—ওটা হোলো পুকুর ভরাট করা মাঠ। ওই মাঠে আশপাশের বাড়ীর সমস্ত ঝাঁটানো জঞ্জাল জমা হোতো। ওখানে সমবয়স্ক সঙ্গী জুটে গেল কয়েকজন, এবং আমাদের কিশোরদলের খেলাধুলোর জায়গা হোলো ওই নোংরা মাঠে, ওই জঞ্জালের স্তূপের আশে পাশে,—এবং সেজন্য আমরা ছিলুম অস্পৃশ্য। এমনই অস্পৃশ্য যে, রাস্তা পেরিয়ে সামনে ওই মস্ত বড় বাড়ীর পাথর বাঁধানো রোয়াকে কখনো যদি বসতে যেতুম,—কোথা থেকে যমদূতের মতন তেড়ে আসতো জীবন দাস!

—হারামজাদা, পাজি,—দূর হ আমার র'ক থেকে!

ভয়ে ভয়ে উঠে আসতুম। জীবন দাসের রাগের কারণ ছিল। তার একটিমাত্র ছেলে নীলু নাকি আমারই জন্য নষ্ট হ'তে বসেছে। নীলুরা বড়লোক, তাদের ওই পাথুরে বড় বাড়ীর নীচের তলায় রাসপূর্ণিমায় পুতুলের

মেলা বসে, কীর্তন কথকতা হয় তাদের ঠাকুরদালানে, সময় অসময়ে জুড়িগাড়ী এসে তাদের দরজায় দাঁড়ায়: মোটা মোটা ঝলমলে মেয়েছেলে তাগা-তাবিজ প'রে গাড়ী থেকে নামে। ওরা নাকি তাঁতি। ওদের বাড়ীতে সেদিন বিয়ে উপলক্ষ্যে চার রকম মিষ্টান্ন নাকি পরিবেশন করা হয়েছিল। আমি দাঁড়িয়েছিলুম ওদের দরজায় বিয়ের দিনে বিকালবেলায় বর আসবার আগে। নীলু পরেছিল জরির বুটিদার রেশমী পাঞ্জাবী,, হাতে রেশমী রুমাল, মুখে সুগন্ধী পান,—পায়ে নতুন কালো পাম-সু। এ নীলু সে নয়। আজ সকাল পর্যন্ত আমার জীবনে যে এত অন্তরঙ্গ এত মধুর ছিল, সর্বপ্রকার দুরন্তপনায় যার অবাধ সাহচর্য পেতাম,—আজ সন্ধ্যার এই নীলু সে নয়,—আজ রাজবেশে দাঁড়িয়ে পথের কাঙ্গালকে সে যেন চিনতে পারে না!

কখন্ যে পিছন থেকে এসে পড়েছিলেন জীবন দাস বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কঠিন আঙ্গুলে আমার একটা কান ধ'রে তিনি দাঁত কিটিয়ে বললেন, ফের?

আমি হকচকিয়ে গেলুম। তিনি কান ধ'রে কিছুদূর টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, মানা করেছি না? ভাগ্...!

কান ধ'রেই তিনি আমাকে জঞ্জালের বালতির দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, শুয়োর, হ্যাংলার মতন দাঁড়িয়েছিস দরজায় গিয়ে,—এঁটো কাঁটা যা পাবি চাট্‌বি—কেমন?

আমি ভাবছিলুম আমার একপাশের একটি কান তখনও তাঁর হাতের মধ্যে আছে কিনা। তাঁরও সময় ছিল কম। বর আসার উলুধ্বনি শোনা যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি চ'লে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, ফের যদি কথা কইবি নীলুর সঙ্গে, তবে কুকুর লেলিয়ে দেবো।

নোংরা মাঠের প্রান্তে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। বর এসে পোঁছলো জীবন দাসের দেউড়ীতে। দেউড়ীর দুপাশে মস্ত দুটো গ্যাসের আলো দেওয়া হয়েছে। দূরের থেকে সেই আলোর আভা পড়েছিল আমার দুই চোখে। সেই চোখে ছিল কিছু সজলতা, কিছু বা বন্যতা।

একজন ধনী ব্যক্তির বিষদৃষ্টি আমাকে সমস্তদিন ধ'রে সহ্য করতে হোতো। অনেক সময় কারণ থাকতো না, অনেক সময় কৈফিয়তও খুঁজে পেতুম না। হয়ত নিজের ছেলের সঙ্গে দরিদ্র বালকের অসমান বন্ধুত্ব তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, হয়ত বা তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত করতো।

কিন্তু নেংটি ইঁদুর সকলের অলক্ষ্যে ঢুকে পড়তো দেউড়ীর কোন্ ফাঁকে। বাড়ীখানা ছিল মস্ত, মহলের পর মহল, ঘরের পর ঘর। অন্দর মহল কোন্ দিকে আমার জানার দরকার ছিল না। কিন্তু বাইরের মহলে নীচের তলার অন্ধকার ঘরগুলিতে থাকতো ঝুলপড়া রাসের পুতল,—নানা ঠাকুর দেবতা। তাদের গায়ে জরির সাজসজ্জা, নারকেলের আঁশ দিয়ে তৈরী ঘন কালো চুল, আড়ং-ধোয়া কাপড়-চোপড়। নীলু আমাকে বোঝাতো সব, বর্ণনা করতো কত কিছু। সেই সব ঘরে কত বিচিত্র বস্তুসম্ভার, কত আশ্চর্য রূপকথার উপকরণ। লোভের মোহের আনন্দের অসংখ্য সামগ্রী,—ওরা যেন আমার রসকল্পনার এক একটি প্রতীক্। সমস্ত নীচের মহল এবং কক্ষের পর কক্ষ ঘুরে বেড়িয়ে এক সময় গা-ঢাকা দিয়ে চ'লে আসতুম। কিন্তু রাত্রে বিনিদ্র চোখের সম্মুখে দেখতুম সেই সব ছবি। দেখতুম বৃন্দাবনের সেই অশ্বত্থ ছায়াতলের সেই কালীয়-দমনের ঘাটের সোপানশ্রেণী, দেখতুম কংসরাজার দেশ, দেখতুম কলঙ্কিনী রাধার লাঞ্ছনা। কিন্তু জীবন দাস! দাসবংশের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী নীলু! ওদের ভালোবাসতুম মনে মনে। ওদের ঘর, ওদের দালান, ওদের রাসমঞ্চ,—ওরা নৈলে আমার এ দেখা সম্ভব হোতো না। জীবন দাসের ঘৃণা বহন করতুম নির্বিকার মনে, কিন্তু সে ছিল আমার পরমাত্মীয়, তার ওই প্রাসাদের প্রতি মহলের ধূলিকণা ছিল আমার কিশোর মনের তীর্থক্ষেত্র!

বড় বড় চুল জীবন দাসের, দাড়ি ছিল গালভরা, চোখ দুটি ছিল ভাঁটার মতো। কী ঘৃণা ফুটতো ওর মুখে। কি বিজাতীয় হিংস্রতা ওর দুই চোখে। দূরের থেকে যদি দেখতে পেতুম, শরীর রোমাঞ্চ হোতো। মুখের সেই স্নেহলেশহীন কাঠিন্য,—সে-মুখে কোথায় নীলুর প্রতি বাৎসল্য? সে-মুখের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে গুপ্ত ক্ষীরধারা,—যে-ধারা সন্তানের প্রতি উপচিয়ে পড়ে? আমি যেন সেই আবিষ্কারের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতুম।

কিন্তু আমার সেই আশা অতৃপ্ত থেকে যেতো। চেয়ে দেখতুম হিংসাকে। সেই হিংসা শাসনের নয়, শমনের। সে হিংসা মানুষের চেয়েও যারা নিষ্ঠুর—তাদের।

পাড়ায় কখনো যদি কোনো গোলমাল দেখা যেতো, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো জীবন দাস। চোখে তার আগুন, মুখে বীভৎস কটূক্তি। ছেলের দলে মারামারি বেধেছে, কা'রো বাড়ী ছিঁচ্‌কে চুরি হয়েছে, পাড়ার কোনো বুড়িকে কেউ ক্ষেপিয়ে কাঁদিয়েছে, কেউ ঢিল ছুড়েছে কা'রো বাড়ীতে,—জীবন দাস আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিত আমাকে। বলা বাহুল্য, এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার ঝড় বয়ে যেতো আমার পিঠের উপর দিয়ে। অনেক সময় আমার অপরাধ থাকতো না, অনেক সময়ে নীলুকে অপরাধী করা চলতো, কিন্তু সে হোলো জীবন দাসের একটিমাত্র সন্তান,—সে হোলো দাস বংশের উত্তরাধিকারী,—তা'র কোনো অপরাধ হয় না।

নিবারণ বোরেগীর ওই একতলার উঠোনে জল দাঁড়াতো বর্ষার দিনে, আর আমাদের সাঁতার শেখার সুবিধা হোতো। সেই উঠোনে সকালবেলা আহ্নিক সেরে নিবারণ বোরেগী সূর্য প্রণাম করবার জন্যে এসে দাঁড়াতেন,—আর আমরা দেখতুম তাঁর চোখ-ওলটানো কর্কশ মুখশানা, আর গলায় তাঁর বৈষ্ণবের কণ্ঠী,—পাঁচনরী। তিনি নিজে ছিলেন পরম ভক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁর মুখের চেহারা দেখলে কা'রো ভক্তি হোতো না। গায়ে শাদা উড়ুনী, পায়ে খড়ম, মাথায় টিকি,—সকল সময় শুচি-শুদ্ধ, কিন্তু তিনি সকলের ভয়ের পাত্র ছিলেন, প্রীতির পাত্র ছিলেন না। তাঁর শাদারঙের একটা কুকুর থাকতো দরজার কাছে বাঁধা,—আর ছিল একটা পোষা বেজী, সেটা থাকতো বারান্দা থেকে নামতে গেলে যে-সিঁড়ির ধাপ,—সে ধাপের কোণে একটি গর্তে। কুকুরের ভয়ে চোর আসতো না বাড়ীতে, আর ঘরের মধ্যে সাপ ঢুকতো না ওই বেজীর ভয়ে। দুটি জন্তু এমনি ক'রে সদাসর্বদা পাহারা দিত তাদের প্রভুকে!

প্রভু কে?—নিবারণ তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলতেন, প্রভু কে বলো ত? প্রভু হলেন সেই বৃন্দাবনের গোপাল, সেই রসিকশেখর শ্যামমনোহর। গৌর গৌর!

স্বামী আর স্ত্রী দুজনকে পাশাপাশি দেখে আমরা অনেকসময়ে অবাক

হতুম। স্বামীর গায়ের বর্ণ অবশ্য বৃন্দাবনের গোপালেরই মতন, এবং স্ত্রীর চেহারাটা রাধাভাবে বিভোর। রং খুব ফর্সা, বয়স প্রায় কুড়ি। আমার দিদিদের সঙ্গে খুব ভাব। বড়দিদি ওকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতো, আচ্ছা কেষ্টদাসী, তুমি বুঝি ওঁর দ্বিতীয়পক্ষের বউ?

কেষ্টদাসী হাসতো। বলতো, সবাই তাই বলে, কিন্তু সত্যি নয়। সংসারে ওঁর মন ছিল না, তাই পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বৃন্দাবন আর নবদ্বীপ ছুটোছুটি করেছেন। মন ত' এখনো বসেনি!

কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের?

কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর, সুন্দর নাকের ওপর গঙ্গামাটির তিলক, গালে গলায় আর হাতে শাদা চন্দনের লেপন,—কেষ্টদাসী কপালে একটু ঘোমটা টেনে জবাব দিত, এই ছ' বছর হোলো। যাই ভাই, ওঁর পুজোর যোগাড় ক'রে দিইগে।

মা বলতেন, বউটার রূপ একেবারে ফেটে পড়ছে। অমন অনামুখোর হাতে পড়েছে, মেয়েটার দশা কি হবে জানিনে।

সকাল থেকে পাঁচ সাতবার নিবারণের ঘর থেকে স্বামী স্ত্রীর মিলিত কণ্ঠের কীর্তন শোনা যেতো। ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম! হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধে গোবিন্দ! জয় গৌর জয় গৌর!

এইটুকু বলতে লাগতো অনেকক্ষণ, দীর্ঘক্ষণ—আর আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো। কতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে কৃষ্ণদাসী, আর আমি রান্নাঘরের আড়ালে গিয়ে ওর হাত থেকে পাবো শশা-কলা আর আম সন্দেশ। কিন্তু বেরিয়ে আসেনা, সময় চ'লে যায়,—ঘরের মধ্যে স্বামী স্ত্রী একেবারে নীরব। সুতরাং আমি যাই পা টিপে টিপে বারান্দার ওপর, পায়ের শব্দ না পান্ নিবারণ। ঘরের দরজার ফাঁকটুকুতে দেখা যায় দুজনে চোখ বুজে ব'সে আছে সেই কখন্ থেকে। কেষ্টদাসীর চোখ দিয়ে নেমে এসেছে জল, আর নিবারণের চোখ দুটো জোর ক'রে বন্ধ করা। সামনে দুখানা বাঁধানো ছবি। শ্রীগৌরাঙ্গ দু'হাত তুলে উপর দিকে তাকিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছেন, মহাপ্রভুর গলায় পৈতা, কাঁধের উড়ুনি হাওয়ায় ভেসে-যাওয়া,—আর তাঁর মাথার পিছনে জ্যোতির্ময় সূর্যগোলক। দ্বিতীয় ছবি হোলো, ওঁংকারের মধ্যে কৃষ্ণরাধা একত্র

বিজড়িত। পায়ের কাছে ময়ূর আর হরিণ, পিছনে বসন্তপ্রকৃতি বৃন্দাবনের। ছবির ওপর চন্দনের ছিটে দেওয়া। কুমারটুলির ঘাটে এ ছবি অনেক দোকানে বিক্রি হয় আমি জানতুম। ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ দেখতে পেতুম বেজীটাও মুখ বাড়িয়ে আছে দরজার ফাঁকে। নৈবেদ্যর একটা অংশ সেও পায়। কিন্তু আমি একটু হাত নাড়তেই ফুড়ুক ক'রে সেটা পালায়। আমাকে সে বন্ধু মনে করে না। অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণদাসী থমথমে গম্ভীর মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই সময়টায় নাকি বিশেষ কারো সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। হাতে তার নৈবেদ্যর থালা। পায়ের কাছে বেজীটা ঘোরে। আমি তখন রান্নাঘরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছি। ফল আর মিষ্টি আমার হাতে দেবার সময় প্রশ্ন করলুম, এত দেরী হোলো কেন?

কৃষ্ণদাসী বললে, আমি কি এখানে ছিলুম?

মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার বললে, গিয়েছিলুম বৃন্দাবনে, ব্রজের রাখালের সঙ্গে!—কৃষ্ণদাসীর দুইচক্ষে তখনও বৃন্দাবনী বিহ্বলতা!

সন্দেশ আর কলা নিয়ে তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেবার সময় একবার থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলুম, কাঁদছিলে কেন, তখন?

স্নিগ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, ও কি কান্না রে, ও প্রেমাশ্রু!

আমার মেজদি হাসতে জানতো, এবং বড়বৌদি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে জানতো। পাশের ঘর থেকে মা বলতেন, তোমাদের অত হাসাহাসি কিসের? ছি, অত হাসতে নেই।

ওরা দুজনে এঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিত, তারপর বিজয়া দশমীর দিনে যেমন সিদ্ধি খেয়ে মানুষ অকারণে হেসে গড়াগড়ি দেয়,—তেমনি ওরা দুজনে মেঝেতে আঁচল লুটিয়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে দিত। একবার ক'রে বলতো, প্রেমাশ্রু,—আবার হাসতে হাসতে লুটোপুটি।

দশ গজের মধ্যেই কৃষ্ণদাসীদের মহল, মাঝখানে কোনো আড়াল আবডাল নেই,—কৃষ্ণদাসীরা কোনো কথা কি মন্তব্য শুনতে পেলে আঘাত পাবে, মায়ের মনে এই ছিল ভয়! আমি গিয়ে এক পাশে ব'সে নৈবেদ্যর ফল মিষ্টি খেতুম,

আর কৃষ্ণদাসীর বিষণ্ণ মুখখানার রহস্য ভাববার চেষ্টা ক'রে কূলকিনারা পেতুম না।

স্ত্রীকে অনেকে অনেক রকম ক'রে ডাকে। কেউ নাম ধরে, কেউ বলে, ওগো; কেউ ডাকে, শুনতে পাচ্ছ? নিবারণ স্ত্রীকে ডাকেন, কোথা গেলে? কোথা গেলে বললেই কৃষ্ণদাসী ছুটে যায় ঘরে। নিবারণ বলেন, কে যে কোথায় যায়! কেউ যায় শ্রীক্ষেত্রে, আবার কেউ বা যায় শ্রীধামে! শ্রীবাসের অঙ্গন আজ যে শূন্য! জয় রাধে কৃষ্ণ, শ্রীরাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ রাধে!

এটি নিবারণের সান্ধ্য আরাধনার ভূমিকা। কৃষ্ণদাসী গিয়ে হাত যোড় ক'রে স্বামীর কাছাকাছি ব'সে পড়ে। সামনে তেলের প্রদীপ জ্বলে। আমি গিয়ে পশ্চিমের জানালাটার নীচে দাঁড়াই। কথায় কথায় সাধনার কথাটা শুনতুম। সাধনাটা কি বস্তু সেটি আমার জানা চাই বৈ কি।

নিবারণ তাকিয়ে আছেন সেই মহাপ্রভুর দু'হাত তোলা ছবিখানার দিকে, কৃষ্ণদাসী কোলের উপর হাত যোড় ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছে। পুষ্পপাত্র আর নৈবেদ্যর রেকাব সামনে, দু'গাছা ফুলের মালা, ধূপ থেকে ধোঁয়া ওঠে, আর ওপাশে টাইমপিস ঘড়িটার থেকে টিকটিক শব্দ হয়। এমন সময় আসে ওই বেজীটা, মুখ তুলে-তাকায় নিবারণের দিকে,—একটু অপেক্ষা করে, তারপর কি যেন মুখে নিয়ে নিবারণকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে যায়।

আমি বাইরের আবছা অন্ধকারে জানালার পাশে—উইপোকায় খাওয়া ফুটো—সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে দেখতুম, ওরা আলোর সামনে ব'সে। চোখ বুজতেন নিবারণ, তারপর হাসতেন। কালো কালো লম্বা দাঁত, একটার থেকে একটা দূরে। হাসির আগেই সেগুলি বেরিয়ে আসতো। কিন্তু সে-হাসি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নয়, সে-হাসি নিজের মনের, সে-হাসি আত্মদর্শনের। কিছু দেখছেন চোখ বুজে, কিছু আমোদ পাচ্ছেন। এক সময় চোখ বুজেই হেসে বলেন, এই ত' ধরেছি। বল্ দেখি তুই ননীচোর, না মনোচোর?

নিবারণের প্রশ্নের জবাব ঘরের কোন্ দেওয়াল থেকে আসে শোনবার জন্য আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকতুম। কিন্তু এক সময় নিজেই নিবারণ গুনগুনিয়ে উঠতেন, তুমি নদীয়ার গোরা, ছিলে মনোচোরা......কোথা গেলে?

এই যে!—কৃষ্ণদাসী জবাব দেয়।

নিবারণ আবার গুণগুনিয়ে ধরেন, তুমি রাধিকার পারা, কোটি শশীতারা...

এতক্ষণ পরে ভাবে বিভোর হয়েছেন নিবারণ। কৃষ্ণদাসী আস্তে আস্তে ঘর থেকে উঠে আসে। আমি ততক্ষণে বাইরের দরজার কাছে স'রে গেছি। কৃষ্ণদাসী বারান্দার থেকে নেমে এসে আঁচল থেকে দুটো পয়সা খুলে আমার হাতে দিয়ে বলে, যা নিয়ে আয়। ছাদে যাবি ভাই লুকিয়ে।

মাঠ পেরিয়ে আমি ছুটে যেতুম হরিসাধনের দোকানে। এক ঠোঙ্গা তেলে ভাজা পেঁয়াজের বড়া কিনে সবাইকে লুকিয়ে চ'লে যেতুম ছাদে। নিবারণ তখন পুরোপুরি সাধনায় বসেছেন। আমাদের দিকে রান্নাবান্না চড়েছে। মেয়েরা আছে ঘরকন্নার কাজে। বড়দা আপিস থেকে ফেরেনি।

কৃষ্ণদাসী এলো ছাদে ছায়ার মতন। তারপর বড়াগুলি দুজনে খাওয়া চললো অনেকক্ষণ। কৃষ্ণদাসী বললে, কারোকে যেন বলিসনে ভাই,—আমাদের এসব খেতে নেই কিন্তু।

বললুম, তুমি ত' সধবা, মাছ খাওনা কেন?

মাছ!—তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণদাসীর চোখ উল্‌টে গেল। সে বললে, মাছ! জীবের মধ্যে যে প্রেমময়! সর্বজীবে তাঁর লীলা!—চুপ।

সিঁড়িতে যেন কা'র পায়ের শব্দ হোলো। কৃষ্ণদাসী অমনি তিনটে বড়া একসঙ্গে মুখে পুরে দিল। গরম গরম বড়াগুলি অতি সুস্বাদু।

প্রশ্ন করলুম, আমাকে কেত্তন শিখিয়ে দেবে?

কৃষ্ণদাসী বললে, তোর সময় কি হয়েছে?

কিসের সময়?

গৌর গৌর গৌর!—কৃষ্ণদাসী নিশ্বাস ফেলে বললে, নাম জপ চাই যে! নাম জপ, নাম ভজো, নাম করো সার রে। প্রভু যখন নাম করেন, দেখিসনি ওঁর মুখ কেমন ঢলঢল করে? দেখিসনি আমার জ্যোতির্ময় শ্রীগুরুকে?

বললুম, গুরু, কই গুরু?

নিবারণের ঘরের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, ওই-যে, ওই-যে আমার পরম গুরু! আমার বাসুদেব।

উনি ত' তোমার স্বামী!

কৃষ্ণদাসীর চোখে যেন বিভোর মনের ঘন ছায়া পড়েছে। কেমন যেন স্বর্গীয় হাসি হেসে বলে, যেই গুরু সেই স্বামী, আবার সেই ত' আমার বাসুদেব!—এবার যাই।

কৃষ্ণদাসী তা'র একরাশ এলোচুলের ওপর এবার ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। আমি ভাবতুম, ও মেয়ে পৃথিবীর মানুষ নয়। ওর মিষ্ট হাসি, মিষ্ট চোখ, মধুর স্নেহ,—আমার ধারণা সেগুলো এ পৃথিবীর বাইরের জিনিস। আমাকে কোনো কাজে কৃষ্ণদাসী ফরমাস করলে নিজেকে ধন্য মনে করতুম।

কীর্তন শেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ছাদের আড়ালে, মাঠের কোণায়, হেদুয়ার নিরিবিলি বেঞ্চে, শেষ পর্যন্ত কুমারটুলির গঙ্গার ঘাটে গিয়ে—কীর্তনের চরণ আওড়াতুম। অমনি ক'রে গুণগুনিয়ে ওঠে যেন আমার ওষ্ঠাধর, অমনি ছায়া যেন আমার চোখে নামে, শ্রীরাধাভাবে অমনি ক'রে রাঙা হয়ে ওঠে যেন আমার ঘামের ফোঁটানামা মুখ,—আমি যেন দেখতে দেখতে কৃষ্ণদাসী হয়ে উঠি।

জগন্নাথ প্রামাণিকের বাড়ী কীর্তন হচ্ছে, আমি গিয়ে বসলুম আসরের মাঝখানে। মানিকতলায় প্রতাপবাবুর বাড়ীতে আসর বসেছে নিত্যানন্দ গোস্বামীর,—সেখানে আমি নিত্য শ্রোতা। সুর আর সঙ্গীতের একটা প্রবল মোহ, সে-মোহ কাটানো কঠিন ছিল।

ওদের মহলে মাছ মাংস আসতো না,—কুকুরটা খেতো দুধ ভাত, আর বেজীটা খেতো দুধকলা। নিবারণ খড়ম পায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেই এক পাশ দিয়ে আসতো শাদা কুকুর, আর বেজীটা এসে ঘুরতো পায়ের তলায়। শিক্ষার গুণে দুটো জন্তুই ছিল সাম্প্রদায়িক। উঠোন পেরিয়ে আমাদের মহলে কখনো ওরা পা বাড়াতো না। কৃষ্ণদাসীর সৎমা ছিল সংসারে, আর ছিল নিবারণের ভাগ্নে আর ভাগ্নেবৌ। ভাগ্নেবৌ শ্যামবর্ণ আর হাসিখুশী, আর স্বামীর জন্য একপাশে গিয়ে সে মাছ রাঁধে। স্বামীর আছে এক ব্লকছবির কারখানা। পাঁজিপুঁথিতে সেই ব্লকছবি ছাপা হয়। উপার্জন মন্দ নয়। এপাশে কৃষ্ণদাসীরা খায় নিরামিষ, নিবারণের জন্য দুধের মালাই, পায়েস পিঠে।

মাছ রান্নার গন্ধ পেলেই নিবারণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, গৌর গৌর—কোথা গেলে?

কৃষ্ণদাসী সব ফেলে ছুটে আসে। নিবারণ সেই গতিভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলেন, উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী আমার প্রাণ রে!—এবার যে তেল সেবা হবে! তুমি বুঝি বৌমার রান্নার জায়গায় বসে নাম করছিলে?

আমরা এ মহলে একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠতুম। কেন আড়ষ্ট হতুম, তা'র রহস্য প্রকাশ পেতো অনেক রাত্রে। ভাগ্নেবৌদের ঘর নিশুতি হয়ে যেতো। সৎমা ঘুমিয়ে থাকতো উত্তর পূবের কোণের ভাঁড়ার ঘরে। আমাদের এ মহলে আর কা'রো সাড়াশব্দ পাওয়া যেতো না। কিন্তু ছাঁৎ ক'রে আমার ঘুম ভেঙে যেতো মায়ের কাছাকাছি শুয়ে। মা ততক্ষণে উঠে বসেছেন। ও মহল থেকে আসতো দাঁতে দাঁত পেষা রুদ্ধ আক্রোশের আওয়াজ, শুনতে পেতুম নিরুদ্ধ আর্তকণ্ঠ! বুঝতে পারতুম নিবারণ আর কৃষ্ণদাসীর ঘরখানা ঝড়ের তাড়নায় আলোড়িত। বাইরে কেবল সেই শাদা কুকুরটা অন্ধকারে ঘরে ঢুকতে না পেরে গোঁ গোঁ করছে রাগে। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়তুম। ঘুমের ঘোরে শুনতুম মায়ের চাপা কণ্ঠস্বর, দুর্গা দুর্গা!

সকালবেলায় দেখতুম কৃষ্ণদাসীর সেই মূর্তি। স্নান করা খোলা চুলের উপর অল্প ঘোমটা টানা, কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, পরণে রাঙাপাড় শাড়ী, নাকে তিলকমাটির দাগ। কীর্তনের আসরে শুনেছিলুম, শ্রীরাধা নাকি একশো বছর ধ'রে কেঁদেছিলেন। কৃষ্ণদাসীর মুখে দেখতুম, একশো বছরের কান্নার পরের বিষণ্ণতা। ওদিকে কিন্তু নিবারণের নামকীর্তন সেই কোন্ সকালে আরম্ভ হয়ে গেছে।

হঠাৎ ওই নামকীর্তনের ভিতর থেকেই আওয়াজ আসতো কর্কশ কণ্ঠে, কোথা গেলে?

ভাগ্নেবৌয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণদাসী ছুটে যেতো পুজোর ঘরে। ফুলের রাশি এনেছেন সৎমা গঙ্গার ঘাট থেকে। সেই ফুলের একটি মালা মহাপ্রভুর জন্যে, আর একটি নিত্যানন্দের। সেই মালা গাঁথতে ব'সে যেতো

কৃষ্ণদাসী। মালা দুজনের, কিন্তু দুইয়ে মিলে এক। ভাবো মনে মনে। ওযে শ্রীধাম নবদ্বীপ। নয় দ্বারবিশিষ্ট দ্বীপ, তারই মাঝখানে চৈতন্যের উদয়! গৌর গৌর। ওযে প্রেমে ঢল ঢল ঢল গল গল গল ছল ছল ছল অরুণ নয়ানে দুটি ভাই! ও তা'র একটির নাম গৌরহরি আরেকটির নাম হয় নিতাই! ও যে পথে পথে ধায়, হরি হরি গায়......জয় গৌর জয় গৌর!

সুর যেখানে পঞ্চমে ওঠে, সেখানেই নিবারণ থেমে যান, কেননা তারপর গলা চিরে যেতে থাকে। কৃষ্ণদাসী মালা গেঁথে চলে আপন মনে। আর আমি মনে মনে নিবারণের ওই কীর্তনের চরণগুলি গুনগুনিয়ে ভেঁজে মুখস্থ করে রাখি।

কাঁদছো কেন গো অমন ক'রে?

হঠাৎ নিবারণের গলার আওয়াজে রান্নাঘরে মায়ের হাতের খুন্তি থেমে যায়। মা উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন বুঝতে পারি। তাঁর চাহনির মধ্যে আছে নিরতিশয় উদ্বেগ, তাও বুঝতে দেরি হয় না। কিন্তু তারপরেই নিবারণের কণ্ঠস্বর যায় বদ্‌লে—ও, নয়নসলিলে বসন তিতাওল! চোখের জলে মুখ ভেসে যায়, বুক ভেসে যায়! আহা, ব্রজের শুষ্ক রজ ওতে কি সিক্ত হবে?—প্রেমজলে ডুবুডুবু লোচনতারা!

নিবারণ নিজের কণ্ঠে কাঁপন মিলিয়ে কীর্তন গেয়ে ওঠেন। পূজার আয়োজন আছে, কিন্তু ঠিক পূজা নেই। পাট আছে, মন্ত্র নেই। সুতরাং আয়োজনটা সম্পূর্ণ হলেই অনুষ্ঠানের শেষ হয়। সন্ধ্যাবেলা শুধু আরতি, আর মঙ্গলঘণ্টা। নিবারণ ভাবে বিভোর থাকেন। কিন্তু কেউ কি জানে, ওই ফাঁকে ছাদের সিঁড়িতে ব'সে দুদিক পাহারা দিয়ে আমি আর কৃষ্ণদাসী গরম গরম মাছের চপ আর মটন্ কাট্‌লেট খেয়ে নিই? কেউ কি জানে, সমস্ত পূজার আয়োজনের আড়ালে আমি আমিষ খাদ্য সংগ্রহ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে থাকি ছাদের সিঁড়িতে কতক্ষণে কাপড় তুলে আনার অজুহাতে আসবে কৃষ্ণদাসী? মা থাকেন সন্ধ্যাহ্নিক নিয়ে, সৎমা সারাদিনের পর ঘুমে কাতর, ভাগ্নেবৌ তা'র শিশুকে নিয়ে ঘরে ঘুম পাড়ায়, আর নিবারণ সুর ক'রে পড়েন চৈতন্য-চরিতামৃত। বড়বৌদি আছে রান্নাঘরে আমার দৃষ্টির পাহারায়।

একতলার ছাদ। পশ্চিমের বাড়ীটার দেওয়াল উঠেছে অনেক উঁচুতে। চাঁদের আলো আড়াল করেছে ওই মস্ত দেওয়াল, সুতরাং তা'র নীচে একতলার ছাদটা অন্ধকার। হঠাৎ যদি কেউ ছাদে উঠে আসে? আসুক—তা'রা দেখবে কৃষ্ণদাসীকে, আমি চক্ষের পলকে উত্তর দিকের গলির নীচে নেমে যেতে পারবো, কেউ জানবে না।

হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলুম, রাত্তিরে তোমাদের ঘরে অত শব্দ হয় কেন?

আমার কাঁধের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, গুরুর যে ভর হয়!

ভর কি?

হর্ষ কম্প স্বেদ পুলক! হাসিতে কান্না, কান্নায় হাসি! তা'কে বলে, ভর!

তাহলে অত দাপাদাপি কেন?

কৃষ্ণদাসীর দুই চক্ষু ভক্তি বিহ্বলতায় যেন ঝলমল করে। জ্যোতির আভা যেন তা'র সর্বাঙ্গে। বহুদূরের থেকে সে যেন মিষ্ট কণ্ঠে বলে, তিনি যে নাচান্, তিনি কাঁদান্, তিনি ভেঙে খান্ খান্ ক'রে দেন্, তিনিই আবার গ'ড়ে তোলেন! কান্নায় তিনি গলেন না, যন্ত্রণায় তিনি টলেন না।

আমি বললুম, কই আমি ত' ভর হওয়া একবারও দেখিনি?

কৃষ্ণদাসী বললে, দেখো সোমবারে।

সোমবারে কি?

সোমবারে যে মহাপ্রভুর জন্মতিথি এবার। সেদিন আমাদের সকাল সন্ধ্যে আসর! রঘুনাথ গোস্বামী আসবেন। ঘটা হবে খুব।

সারাদিনের ভয়ানক গরমের পর এবার বাতাস বইছে ছাদের ওপর। ছাদের মেঝে তখনও গরম। সেই হাওয়ায় কৃষ্ণদাসীর চুল উড়ছিল, আর সেই চুলের গন্ধ পেয়ে আমি মনে মনে ভাবছিলুম, কৃষ্ণদাসী কোন্ তেলটা মাথায় মাখে! সেই তেল পাওয়া যায় কোন্ দোকানে! বোধ হয় দিনরাত চন্দন গায়ে মাখলে তবেই কৃষ্ণদাসীর মতন স্বভাব পাওয়া যায়। ও এসে পৌঁছবার আগেই সুগন্ধ তেল আর চন্দনের সুবাস আসতো আমার নাকে। আমার কাঁধে হাত রেখে

কৃষ্ণদাসী যখন সচকিতভাবে গলগলিয়ে তা'র বক্তব্য ব'লে যেতো, আমার বন্য প্রকৃতি ততক্ষণের জন্য যেন শান্ত নম্র হয়ে থাকতো। ওর ছোঁয়ায় আমার কান্না পেতো।

উঠোনটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের যাতায়াতের পথটুকু রেখে বাকি অংশটায় আটচালা বাঁধা হয়েছিল। উপরটা তেরপল দিয়ে ঢাকা। আমাদের এদিক থেকে ওদের আর কিছু দেখা যায় না। খোলের উপর চাঁটি পড়েছে। আজ সোমবার, মহাপ্রভুর জন্মতিথি। ওদের মহলে গিয়ে ফাই ফরমাস খাটতে পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেছি। কীর্তনের আসর বসেছে উত্তর দিককার বড় ঘরখানায়। রঘুনাথ গোস্বামী এসেছেন দলবল নিয়ে। অন্যান্য আখড়া থেকে আরো এসেছেন অনেকে। আহারাদির পালাটা বিয়ে বাড়ীর মতন। আয়োজন প্রচুর। আমি এ মহলে এসে চন্দন পরেছি, কিন্তু নাকে তিলক কাটতে সাহস পাইনি। কণ্ঠী গলায় দেবার ইচ্ছাটা অনেকদিনের, কিন্তু জীবনে অনেক ভালো ভালো ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকে গেছে।

খোল আর করতালের আওয়াজে সমগ্র পল্লীটা মুখর হয়ে উঠেছে। সকল কীর্তন কথার আগে গোরাচাঁদের বন্দনা ক'রে নিতে হয়। তাই ওর নাম গৌরচন্দ্রিকা। ব্রজবিহার, তরণী-যাত্রা, বন-ভ্রমণ, মাথুর—একটির পর একটি পালা। আমার ওসব জানা নেই, তাই মাঝে মাঝে কৃষ্ণদাসী এসে কীর্তনের এক একটি বিষয় আমাকে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। নিবারণ আছেন সকলের মধ্যমণি হয়ে। আজ তাঁর পরণে গরদের ধুতি, কাঁধে বৃন্দাবনী চাদর, সর্বাঙ্গে তিলকসেবা।

প্রভাতে যে খোল করতালের প্রচণ্ড ঝনৎকার আরম্ভ হয়েছিল, তার সাময়িক বিরতি হোলো মধ্যাহ্নের পর। কেউ আছেন রাধাভাবে, কেউ শ্রীকৃষ্ণে, কেউ গোপাল-গোবিন্দে, আবার কেউ বা সুবল সখায়। রঘুনাথ গোস্বামী ছিলেন শ্রীমতীভাবে। তিনি এক সময় উঠলেন নেচে-নেচে। রং কালো, কদম ফুলের মতন মাথাটা ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামানো নেই, গলায় আছে পৈতা, কোমরে গামছা বাঁধা—শ্রীমতীর ভাবে তিনি ভাববিহ্বল! এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, সুতরাং দৃষ্টি আমার সজাগ ছিল, এবং আমিও ভক্তিতে আপ্লুত ছিলুম।

শ্রীমতী উঠলেন চোখ বুজে হেসে-কেঁদে। কোথায় তিনি যাবেন, এবং কোথায় গিয়ে থামবেন, তা কা'রো জানা নেই। কিন্তু নেচে নেচে তিনি এগোচ্ছেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। বুঝতে পারা গেল, গোস্বামীজির ওপর 'ভর' হয়েছে। এখন তিনি কৃষ্ণভাবিনী, কৃষ্ণকামিনী!

আটচালাটা ছোট। ওপাশে কলতলা, পূর্বদিকে বারান্দা, এদিকে আনাগোনার পথ। আবার এইটুকুর মধ্যে কাজের বাড়ীর নানাবিধ সামগ্রী থৈ থৈ করছে। কিন্তু শ্রীমতীকে ত' যেতে হবে। বৃন্দাবন থেকে মথুরা,—সে যে অনেক পথ! তিনি যাবেন কেমন ক'রে? মাটির খুরি, গেলাস, কলাপাতা এক পাশে, অন্য পাশে জলের জালা, দই মিষ্টির হাঁড়িগুলো একধারে, এক পাশে গামলায় রয়েছে আলু-কুমড়োর ছোক্কা, এপাশে গরম গরম লুচির চেঙ্গারী,—কিন্তু শ্রীমতীকে ত' যেতে হবে! কত অরণ্য, কত হিংস্র শ্বাপদ আর সরীসৃপ, কত বা দুর্জন আর গুরুজনের ভয়! পথ অন্ধকার, মেঘমেদুর আকাশে শ্রাবণের বজ্রগর্জন, অশ্রুজলে তিনি দিশাহারা, বিবশা, বিলোলবসনা! হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে তিনি যাবেন, মথুরা নগরের প্রতি ঘরে ঘরে। ও বিশাখা, ওরে ও ললিতে! আমি যোগিনী হইয়ে যাবো সেই দেশে!

বিশাখা আর ললিতা ধরলো রঘুনাথকে। রঘুনাথের জ্ঞান নেই। মথুরা তখনো অনেক দূর। তাঁকে ধ'রে বারান্দায় তোলা হোলো। হাসছেন তিনি যেন কা'র সঙ্গে! কাঁদছেন যেন কা'র জন্যে! তাঁর চোখ উলটিয়ে গিয়েছে কা'র স্বপ্নে! অচেতন অঙ্গ তাঁর!

উঠোন থেকে খোলের ওপর চাঁটি পড়লো—হরি হরি বল্, হরি হরি বল্! বিশাখা আর ললিতা—মানে, মদনমোহন দাস এবং আরেকজন ছোকরা বোষ্টম,—রঘুনাথের টাল সামলাচ্ছে অতিশয় সন্তর্পণে! আশপাশে তোরঙ্গ বাক্স, হাঁড়ি কড়াই, বিছানা বাসন,—একেবারে একাকার। ওর মাঝখান দিয়েই শ্রীমতীকে যেতে হবে অভিসারে! কিন্তু রঘুনাথ বাধা মানবেন না আজ! ভক্তিরসে বিহ্বল হয়ে নিবারণ শিবনেত্রে চেয়ে রয়েছেন সেইদিকে। সবাই তটস্থ, স্তব্ধ, আকুলিত। মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠছে অনেকে।

আমি ভাবছিলুম শ্রীমতী থামবে কোথায়! কোথায় পথের শেষ!

অবশেষে থামলেন তিনি ঘরে গিয়ে। ললিতা আর বিশাখা তাঁকে ধরাধরি

ক'রে কোনোমতে দাঁড় করালো কুশাসনের উপর—যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের পাতা পড়েছে! তিনি লুটিয়ে পড়ছিলেন প্রায় দুজনের হাতের মধ্যে, কিন্তু তা'রা রঘুনাথকে বসিয়ে দিল আসনে। সামনের পাতে লুচি-তরকারি পড়েছে।

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালুম কৃষ্ণদাসীর দিকে। বুঝতে পারিনি, এতক্ষণ সে আমারই পিছনে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছিল। তা'র কান্না দেখলে পাষাণ গ'লে যায়।

ব্যাকুল হয়ে বললুম, কাঁদছো কেন অমন ক'রে।

হঠাৎ হুঁস হোলো কৃষ্ণদাসীর। বললে, অ্যাঁ?

বললুম, এত চোখের জল কোথায় থাকে তোমার?

চোখ মুখ তা'র যেমন ফোলা, তেমন রাঙা। আঁচলে মুখ মুছে কৃষ্ণদাসী শুধু বললে, এ যে প্রেমাশ্রু! এর কি শেষ আছে?

প্রহার এবং উৎপীড়ন ছাড়া মানুষ কাঁদে কেমন ক'রে—একথা সেদিন আমার জানা ছিল না। অহেতুক যন্ত্রণা বোধও যে মানুষকে অনেক সময় কাঁদায়, একথা কি জানতুম সেই বয়সে? সুতরাং সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে আমি কৃষ্ণদাসীর কাছ থেকে স'রে গেলুম। মাঠের সামনে ওই রাসবাড়ীর জীবন দাস আমাকে আড়ালে পেয়ে কান ম'লে থাপ্পড় দিত—কেননা ওর ছেলে নীলুর সঙ্গে আমি খেলে বেড়াতুম, এবং তা'তে নীলুর স্বভাবচরিত্র নাকি নষ্ট হোতো। জীবন দাসের প্রহারটা সয়ে যেতো, কিন্তু নীলুর সঙ্গে বিচ্ছেদের কল্পনাটা আমার সইতো না। আড়ালে গিয়ে একটা কানের জ্বালার সঙ্গে আমার ভিতরের যন্ত্রণাটা মিলে যেতো, এবং হু হু ক'রে জল এসে পড়তো দুই চোখে। সে জল নীলুর জন্যে। ওরই নাম কি প্রেমাশ্রু?

অমন জল অনেকের জন্যেই পড়েছে আগে আর পরে। দীপু গুণ্ডা যেদিন মার খেলে পুলিশের হাতে, বদ্যিদের বাড়ীর হীরেন এম-এ পড়তে পড়তে যেদিন হেদোয় ডুবে আত্মহত্যা করলো, নণ্টুর মাকে যেদিন কপালে কলঙ্ক মাখিয়ে বাড়ী থেকে তাড়ানো হোলো, খাঁদি যেদিন প্রথম শ্বশুরবাড়ী গেল, বুড়ো পূর্ণ পণ্ডিতকে নিয়ে যেদিন গঙ্গাযাত্রা করলো,—জল পড়েছে বৈ কি চোখ দিয়ে। কিন্তু সে-জল তা'রা কেউ দেখে যায়নি, আমার চোখে জল আসতে পারে একথা কেউ স্বীকার করতো না।

এই যেমন আজকে। কৃষ্ণদাসীর মনে বোধ হয় এই আশা ছিল যে, আমার চোখেও নামবে ওদের ওই প্রেমাশ্রু। কিন্তু আমি চ'লে গেলুম বাইরে, ওদের লুচির চেঙ্গারীর প্রতি যেন আজ আমার লোভ ছিল না। মনে বিক্ষোভ জ'মে উঠেছিল কেন, আজও বেশ মনে পড়ে। বৈশাখের রোদে কৃষ্ণদাসীর টকটকে মুখখানা, তা'র ওপর দরদরে ঘাম। সকাল থেকে জল পড়েনি ওর মুখে। এতগুলো বোষ্টমের সেবা, এতটুকু বিশ্রাম নেই। কথায় কথায় আবার ওর ওপর নিবারণের চাপা তাড়না, তা'র ফলে মুখে ওর বিষণ্ণতা! এর ওপর আবার যদি দেখা যায় ঝরো ঝরো প্রেমাশ্রু, তবে অসহ্য। সুতরাং বিক্ষোভ আর তিক্ততা নিয়ে সেই দুপুরে আমি চ'লে গেলুম কোন্ গলি থেকে কোন্ গলি পেরিয়ে, আমার আজ আর মনে নেই। যদি সেদিন রাস্তার যে কোনো লোকের গালে চড় মারতে পারতুম তবে খুশী হতুম।

দিদিমা এলেন অনেক দিনের পর। দিদিমা যেন আমার মুক্তি, আমার উদ্দাম স্বাধীনতার প্রতীক্। চঞ্চল অধীর বালক ছুটে গিয়ে বসলো তাঁর পাশে। পরিশ্রান্ত পথিক এসে বসলো যেন গঙ্গার উদার স্নিগ্ধ হাওয়ায়। এখানে তাপ শীতল হবে, তৃষ্ণা মিটবে।

দিদিমা বললেন, কই রে, তোরা কোথায়? কেমন আছিস সব? অনেক দিন আসতে পারিনি! সত্তর বছর বয়েস হ'তে চললো, আর কি এত হাঁটতে পারি? কেমন আছিস বাপি?

সেদিন দিদিমার নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি, কেননা ওই প্রেমাশ্রুটায় হয়ত আমার গলা বন্ধ হয়ে যেতে পারতো। কেউ কোনো প্রশ্ন না ক'রে আমাকে উপলব্ধি করলে তৃপ্ত পেতুম। লাঞ্ছনা আর উৎপীড়নের দাগ আমার সর্বদেহে মনে। ব্যথা আমার নিবিড়—যেন একশো বছরের ব্যথা! কত কাল ধ'রে যেন মার খাচ্ছি—কত যুগ যুগান্তর। ব্যথা আমার ছড়িয়ে আছে এখানে, ওখানে—সমস্ত কলকাতায়!

মা এসে দাঁড়ালেন। দিদিমা বললেন, এসো মা, এসো। পোড়া চোখে কাল থেকে ঘুম নেই। শেষ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলুম, তোদের এখানে যেন অসুখ। তাই আর থাকতে পারলুম না। একটা চোখে দেখতে পাইনে, তবু ভাতে-ভাত

দ্বটো ম্বখে দিয়ে এল্বম ছ্বটতে ছ্বটতে। হ্যাঁ গা, ছেলেটা কাঁদে কেন, বল্ দিকি?

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, ও তোমার কাছে থেকে ইস্কুল যাবে তাই দ্ব'দিন বায়না ধরেছে।

দিদিমা হাসলেন। বললেন, ওমা, তার জন্যেই ত এল্বম! তোদের আর ভাড়া দিয়ে এখানে থেকে কাজ নেই মা। মাসে মাসে এগারো টাকা ভাড়া গ্বণবি কোত্থেকে? আমি তোদের নিতে এল্বম। চল্, বাড়ী মেরামত আমার হয়ে গেছে!

মা রাজী হলেন। আমাদের যাবার দিনস্থির হয়ে গেল। আমি নেচে উঠল্বম এবং তেতে উঠল্বম। আবার যাবো দিদিমার বাড়ী, আবার ফিরে পাবো সেই পল্লী,—যার সঙ্গে আমাদের দেড় বছরের বিচ্ছেদ। যেখানে আমার অসংখ্য পায়ের দাগ আজও ছড়ানো।

আমাদের যাবার কথা শ্বনে নিবারণ দ্বঃখিত হননি। কেননা তাঁর ধারণা, এমহলটা ভাড়া দিলে তিনি পনেরো টাকা নিশ্চয় পেতে পারেন। আমাদের জন্য তিনি এতদিন ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছেন।

যাবার আগের দিনও হরিসাধনের দোকান থেকে খাবার এনেছিল্বম। লোক-চক্ষের আড়ালে ভাগ্নেবো আর কৃষ্ণদাসী দ্বজনেই এসে চোরা ভোজনের আসরে যোগ দিল। কিন্তু কাপড় চোপড় প'রে নেমন্তন্নে বেরোবার আগে নিবারণ যে কলতলাটার দিকে হঠাৎ আসতে পারেন, এ আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। একেবারে সামনা-সামনি, হাতে-নাতে ধরা পড়া। স্বস্বাদ্ব কাট্লেটের উপরে কৃষ্ণদাসী সবেমাত্র কামড় দিয়েছে, সে-ম্বহ্বর্তে নিবারণের আবির্ভাব। কাট্লেটের স্বগন্ধ তাঁর জানা ছিল।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে নাকি এ সব একেবারেই নিষেধ। তার ওপর আবার এসব বাইরের দোকানের জিনিস, যা ছ্বঁলে গঙ্গাস্নানে যেতে হয়। তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে অত্যন্ত কঠোর ব্রত পালন ক'রে থাকেন। আজ সমস্তটাই অশ্বচিতে ভ'রে উঠলো। কিন্তু প্রচণ্ড আক্রোশ আর উত্তেজনা সত্ত্বেও নিবারণ কিছ্ব বললেন না,—সামনে ভাগ্নেবো! তিনি একবার তাকালেন আমার দিকে,—

আমার হাতে ঠোঙ্গাটা; পরে তাকালেন কৃষ্ণদাসীর দিকে। তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনিই চ'লে গেলেন।

ভাগ্নেবৌ স্তব্ধ, কৃষ্ণদাসী আড়ষ্ট, আমি হতবাক। নিষিদ্ধ ভোজনের ফলে যে-ধর্মচ্যুতি ঘটলো, তা'র প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে? সে যে ভয়াবহ পরিণাম!

পরদিন সকাল থেকে কৃষ্ণদাসীকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ভাগ্নে, ভাগ্নেবৌ, সৎমা এবং পরিশেষে নিবারণ নিজে এসে আমাদের কাছে বিদায় নিলেন। আমাদের মালপত্র গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে চলেছে। আমার চোখ ছিল এখানে ওখানে। বুঝতে পাচ্ছি কৃষ্ণদাসী আজ শোবার ঘর থেকেই বেরোয়নি।

কেন বেরোয়নি সে-জবাব এক ফাঁকে নিজেই এসে দিল কৃষ্ণদাসী। আমাদের বিদায় ক'রে দিয়ে নিবারণ তেল সেবা ক'রে গিয়েছেন কলতলায়, সেই দুর্লভক্ষণে আমার ভিতরের সাপটা আবার এলো ঘুরে ফিরে মাথার মণি খুঁজতে। ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণদাসী, এবং পাছে গলার আওয়াজ করলে নিবারণ শুনতে পান্, এজন্য হঠাৎ গায়ের কাপড় সরিয়ে দিয়ে সে বললে, দেখে যাও! এ শাস্তি পেয়েছি মহাপ্রভুর হাত থেকে। এ তাঁর প্রেমের চিহ্ন!

ব্যাধের বাণ বিদ্ধ হয়েছে একটির পর একটি রক্তিম শ্বেতবর্ণ রাজহংসীর সর্বাঙ্গে। গলায় পিঠে হাতে বুকে কালশিরার দাগ। আমি শিউরে উঠলুম। ইশারায় প্রশ্ন ক'রে জানতে চাইলুম, কি জন্য তা'র এত বড় শাস্তি!

শূন্য মহলের দিকে চেয়ে কৃষ্ণদাসী স'রে এসে আমার কানে কানে বললে, চ'লে যাও। গুরুর আদেশ, কিছু বলতে নেই!

জল ঝরছিল তা'র চোখে। তাকালুম তা'র ভিজা মুখখানার দিকে। কিন্তু সেই অনর্গল অশ্রুটা কিসের, আজকে আর কৃষ্ণদাসী সে কথা বলতে পারলো না। সে-অশ্রুর ভাষা অশ্রুত থেকে গেছে। নিশ্চয়ই সেটা প্রেমাশ্রু নয়!

রুদ্ধ বিষশ্বাস নিয়ে সাপটা বেরিয়ে চ'লে গেল মাঠের দিকে। পিছন ফিরে আর আমি দেখিনি।

ইতিহাসটুকু মাত্র দেড় বছরের, তবু ওতেই যেন অনন্তকালের পায়ের চিহ্ন থেকে গেছে। সে যাই হোক, ঠিক পঁচিশ বছর পরে আবার সেই পল্লীতে একবার পদার্পণ করেছিলুম। তার কথাই বলি।

নিবারণ বোরেগীর বাড়ী ছেড়েছিলুম,—বেশ মনে পড়ছে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের সেই আমি,—এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালে উত্তীর্ণ হয়ে এসে পড়েছিলুম ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। সেদিন সরস্বতী পুজো। হঠাৎ ডাক এলো কলিকাতার সেই আমার প্রাচীন পল্লীর কোনো একটি নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের থেকে। স্কুলে নাকি সারস্বত সম্মেলন,—সেখানে যদি আমি যোগদান করি তবে স্কুল প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মহাশয় অতীব প্রীত হন্। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নাকি উপস্থিত থাকবেন, এবং আমার আদর অভ্যর্থনার কোনোরূপ ত্রুটি হবে না,—একথা প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন। আমার অনুমতি পাবামাত্রই মোটর এসে আমার বাড়ীর দরজায় দাঁড়াবে। শুধু আমার অনুমতির অপেক্ষামাত্র।

মোটর আমাকে নিয়ে গিয়ে পেঁছিলো সেই বিদ্যালয়ের দরজায়। ফুল লতা পাতায় গেট্ তৈরী, শালুর উপর তুলোর অক্ষরে সারস্বত সম্মেলনের ঘোষণা। মোটর থেকে নেমে আসতেই আশেপাশে শঙ্খধ্বনি। প্রধান শিক্ষক মহাশয় মস্ত এক মালা এনে আমার গলায় পরালেন। ছেলেমেয়েরা এসে ঘিরে দাঁড়ালো চারিপাশে। আমার কপালে দিল শাদা চন্দনের ফোঁটা। আসর বসেছে মস্ত বড়।

সভাপতি বরণের পর যথারীতি কার্যারম্ভ। এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। সে-অভিভাষণের প্রথমারম্ভেই আমার প্রতি স্তুতিবাদ। আমি তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালুম এতক্ষণে। আমার সর্বাঙ্গ যেন পলকের মধ্যে হিম হয়ে এলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দেখি, ছোটবেলাকার সেই নীলুর বাবা,—সেই জীবন দাস! সেই দাড়ি, সেই ঝাঁকড়া মাথার চুল,—তবে চুলদাড়ি পেকেছে, চোখে চশমা উঠেছে, দুটি দাঁত পড়েছে। চোখে মুখে সেই হিংস্রতা নেই, আছে শান্তি, শ্রদ্ধা-অনুরাগ, আছে অপ্রত্যাশিত উদারতা।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ব'লে চললেন, "তোমার শুভাগমনে আমাদের এই বিদ্যালয় আজ পূতপবিত্র, তোমার সান্নিধ্য আমাদের জীবনে পরম গৌরবের বস্তু,—হে সৌম্য, তুমি আমাদের সকলের সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করো!"

মনে পড়ছে সেই সকালের পুকুর ভরাট করা ছোট্ট মাঠ, সেই মাঠে আশেপাশের

ঝাঁটানো জঞ্জাল,—সেইখানে যমদূতের মতো তেড়ে আসতো জীবন দাস। সে-জীবনটা কি সত্যি নয়? এ জীবনটা কি মিথ্যে নয়!

আমি মুখ তুলে তাকালুম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির প্রতি। তিনি ব'লে চললেন, "হে নিরভিমান, তুমি খ্যাতির মোহকে জয় করিয়াছ, তুমি প্রতিষ্ঠার লোভকে দূরে ঠেলিয়াছ,—"

কে বললে? তাকালুম জীবন দাসের দিকে। রাসযাত্রার সেই পুতুলগুলি,—কী মোহ রেখে গেছে তা'রা আমার মানসলোকে! বৃন্দাবনের সেই কালীয়-দমনের দৃশ্য, কংসরাজার সেই হিংসার ছবি,· শ্রীরাধার সেই লাঞ্ছিত মুখ! লোভকে জয় করেছি? মিথ্যা কথা! এখনো লোভ আছে যদি সেই বাল্যকাল আর একবার ফিরে পাই,—যদি ফিরে পাই সেই জীবন দাসের একটুকু স্নেহ, যদি ফিরে পাই নীলুর সেই বন্ধুত্ব! এ জীবন দাস সে নয়, কিন্তু এ আমি সেই আমি! সেই আমি বিবর্তিত এই আমির মধ্যে। আমি সেই মোহাতুর, লোভাতুর, ক্ষুধাতুর। সে ছিল নালা, এ হোলো নদী,—সে জল মিলেছে এই জলে!

জীবন দাস অভিভাষণ শেষ ক'রে বসলেন আমার গায়ে গায়ে। আমার সঙ্গে একটু ছোঁয়া, একটু অন্তরঙ্গতার লোভে। আমার সান্নিধ্যে তাঁর নাকি গৌরব, তাঁর আনন্দ। কেমন লাগলো অভিভাষণটি,—তিনি অতিশয় আড়ষ্ট-ভাবে উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন।

জবাব দিতে পারলুম না, কেননা কণ্ঠ ছিল বাষ্পাচ্ছন্ন। অভিমানকে কি জয় করেছি, আক্রোশকে কি পেরেছি ভুলতে? একথা কি উপলব্ধি করেছি, কোনো মানুষই ছোট নয়!

মোটরে উঠবার সময় জীবন দাস একটি ফুলের তোড়া আমার হাতে দিয়ে আনত হয়ে করজোড়ে নমস্কার জানালেন। আমি যেন তাঁদের এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টিকে ভুলে না যাই।—

*

দিদিমার বাড়ীতে ফিরে এসে আবার পেয়েছিলুম সেই প্রাচীন পরিচিত মধুর জীবন। ছোটবেলাকার বোধশক্তিহীন প্রাণের সমস্ত চিহ্ন এখানে ওখানে

জেগে রয়েছে। সেই বৈশাখের দুপুরে ফেরিওয়ালা হেঁকে চ'লে যায় আমাদের পুরনো পাড়ার সরু পথ দিয়ে। শিশুকালের চক্ষে ওই পথটাকেই মনে হোতো কত দীর্ঘ,—যেন ও-পথটা হারিয়ে গেছে কোনো তেপান্তরে গিয়ে। পথটা নির্জন—সেই ছায়াচ্ছন্ন নির্জন পথে বয়ে যেতো যেন তন্দ্রাজড়ানো স্নিগ্ধ হাওয়া। সেই হাওয়ায় ভেসে আসতো দূর আকাশ থেকে চিলের ডাক, ভেসে আসতো বহুদূর থেকে ইঞ্জিনের বাঁশীর সুর। ঘর থেকে বাইরে চ'লে যাওয়ার জন্য কে যেন আমাকে স্থির থাকতে দিত না।

কিন্তু কোথায় যাবো? আছে কি কোনো জানা পথ? আছে কি সে-পথের কোনো নির্দেশ। ওই দীর্ঘ গলি-পথ উত্তর দিকে বেরিয়ে খৃষ্টানদের গির্জা পেরিয়ে চ'লে গেছে গোয়াবাগানের দিকে, আর দক্ষিণের দিকে গিয়েছে কাঁসারিপাড়া আর ঠনঠনে ছাড়িয়ে পটলডাঙগার দিকে। তারপর—তারপর আর আমার কল্পনা ছোটেনা। আমার পথ-হারানো মন ঘরের খুঁটিটা আঁকড়ে ধ'রে যেন থরথর ক'রে কাঁপতো।

এমন সময় একদিন ডাকপিওন এসে আমার নামে একখানা পোষ্টকার্ড হাতে দিয়ে গেল। চিঠি? আমার নামে? সমস্ত শরীরের ভিতরে বিদ্যুতের একটা ঝলক যেন প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল। আমার জীবনে সেই প্রথম চিঠি পাওয়া। মহাশূন্যলোকের অস্থির এক পাখী যেন বিশাল সুদূরের সংবাদ নিয়ে আমার হাতে এসে উড়ে বসলো। আনন্দে অথবা কান্নায় আমার গলা বুজে এসেছিল।

চিঠি লিখেছে বলাই শিবপুর থেকে। গরমের ছুটিতে স্কুল বন্ধ, তাই সে গিয়েছে মামারবাড়ী। আমি নাকি তা'র একমাত্র বন্ধু, আমাকে না দেখে সে তিষ্ঠতে পারছে না। ওখানে সে ফুটবল খেলে, আর এই সেদিন দুটো গোলা পায়রা পুষেছে। একদিন লুকিয়ে সে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

এক পয়সা দামের সরু পোষ্টকার্ড, ছাপাগুলো একটু বেগুনী রংয়ের,—ডানপাশে পঞ্চম জর্জের চেহারা। সেই চিঠি ছিল আমার মন্ত্র, সেই চিঠি ছিল অবারিত মুক্তির প্রথম ছাড়পত্র। আরো কিছু ছিল সেই চিঠিতে—ছিল আমার ভ্রমণের সঙ্কেত। ঘরের থেকে বাহির, সে বাহির অনেক বড়। বিধি-নিষেধের বাইরে যে-জীবন—সে-জীবনের আস্বাদ আমার দরকার ছিল। স্নেহ-

মোহ-বন্ধনের অতীত যে মহাজীবনের ডাক—তার অচ্ছেদ্য আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যেতো নিমতলা ঘাটের একপ্রান্তে অশথতলার ছায়ায়,—যেখানে প্রাচীন অশ্বত্থের একটা ডাল ঝুলে পড়েছে গঙ্গার জলে,—স্রোতের তাড়নায় সেই ডালের পাতাগুলি কাঁপতো থরথর করে। থাকতো আশেপাশে মাঝিমাল্লা, এসে পৌঁছতো কত দেশের কত মহাজনী নৌকা; ষ্টীমারের সাইরেন বেজে যেতো মাঝগঙ্গায়,—খেয়া-পারাপার কত হয়ে গেছে পাল তুলে দিয়ে। আমার মন প্রত্যেকটি নৌকা ধ'রে ধ'রে চলা-ফেরা করতো এপার থেকে ওপার।

একদিন বলাই বললে, চল্ মানিকতলার খাল পেরিয়ে যাবো বাঘমারির দিকে। কিন্তু সাবধান, ওদিকে ডাকাতের ভয়,—সন্ধ্যার পর আলো জ্বলেনা। ওই পথ দিয়ে গেলে পায়রাটুনি, তারপর উল্টোডিঙ্গি,—সেখানে মাথার উপর দিয়ে রেলগাড়ী যায়। পথ হারালে কিন্তু আর কোনোদিন বাড়ী ফেরা যাবে না।

মাঠ দেখেছিস কখনো? কখনো দেখেছিস ধানের ক্ষেত? দেখেছিস আম জামের বাগান? তাল আর তেঁতুলের বন?

গলা কাঁপতো জবাব দিতে। বলতুম, না।

আমার দাদামশায়ের ধানক্ষেত আছে হাওড়া জেলায়। যাবি একদিন সেখানে? সেখানে কিন্তু বাঘের ভয়! বনে শিয়াল ডাকে! ডাক শুনেছিস্ শেয়ালের?

এবারেও বলতুম, না।

বলাই বলতো, এমন বোকা তুই? তোর কিচ্ছু হবে না!

বলাইয়ের চোখে মুখে যেন বিশ্বপৃথিবীর অভিজ্ঞতা,—যেন সে জ্ঞানের ভাণ্ডার। আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাতুম সমস্ত হৃদয় দিয়ে। সমবয়সী হলেও সে যেন আমার চেয়ে হাজার বছরের বড়।

বড় হয়ে কলকাতায় ঘুরতে হবে তা জানিস? অনেক বড় কলকাতা মনে রাখিস। চৌরঙ্গী দেখেছিস? দেখেছিস বাগবাজার?

সত্যি দেখা হয়নি কলকাতা! আজো কি সব পথ ঘুরেছি, সব গলি

মাড়িয়েছি? প্রত্যেকটি আঁকাবাঁকা পথ হোলো এক একটি চেতনার মতো। কত রহস্যে নিবিড়, কত ছোট ছোট জীবনের কাহিনী।

ভোরের মধুর বাতাস উঠেছে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। বসন্তের পাতা-ঝরা প্রায় শেষ হয়ে এলো পথের দুই পাশে। পাখীরা ঘুম ভেঙে উঠেছে, কিন্তু রোদ ওঠেনি তখনও। দীর্ঘ বিস্তৃত পথ উত্তর দিকে যেন অজানা রহস্যের দিকে চ'লে গেছে। দুই পাশে তখনও রয়েছে প্রান্তরের ভগ্নাংশ, তখনও ওখানে হাল বলদ নিয়ে চাষীদের দেখা পাওয়া যেতো। পথটা পায়ে-হাঁটা। তখনও যানবাহনের রেওয়াজ হয়নি। কিন্তু আর যাবো কতদূরে? অন্ধ আকর্ষণ আর কতদূরে টানবে এমন ক'রে? সুতরাং নিয়তির হাত ছাড়িয়ে যেন এক সময় পালিয়ে আসতুম।

শ্যামবাজারের মোড়ে তখনও আধুনিক সভ্যতা গ'ড়ে ওঠেনি। দু'একটি চিড়ে-মুড়কীর দোকান, আর অবাঙগালী ফেরিওয়ালাদের এক একটি কেন্দ্র। পথের দু'ধারে খোলার খাপরা, সেখানকার বস্তির মেয়ে-পুরুষরা আসে বড় রাস্তার ধারে জল নিতে। দেশবন্ধু পার্কের দিকটা ছিল জলামাঠ, মাঠের প্রান্তে উল্টোডিঙ্গির খাল—সেদিকে যেতে ভয় করতো দিনের বেলা। নাবালক দলের অসমসাহসিক অভিযান হোতো ওই দিকে। শ্যামবাজারের পশ্চিম দিকটায় এলে তবে সভ্যজগতের দেখা পাওয়া যেতো।

বলাই বলল, বালীগঞ্জে যাবি একদিন?

বললুম, সে কোন্ দিকে?

বিজ্ঞের হাসি হেসে সে বললে, কলকাতা কিন্তু সেখানেই শেষ। তারপর সুন্দরবন।

তেলের আলো জ্বলতো মনোহরপুকুরের পথে! দু'ধারে দুর্গম বনময় জঙ্গল জলা। কোথাও কোথাও মুড়ি আর ছোলা-ভাজার দোকান। কালীঘাট পর্যন্ত আসা যেতো সাহস ক'রে। দক্ষিণ দিকটা জলাময় অন্ধকার বন। এধারে ওধারে ছোট ছোট গ্রাম্য বস্তি। মহানির্বাণ মঠ পর্যন্ত এসে মনোহর-পুকুরের সরু পথ কোন্দিকে যেন হারিয়ে গেছে। বলাই বলতো, আর নয় কিন্তু, আর কিছু আমি চিনিনে।

ইচ্ছা হোতো আরো যাই। যাই সুন্দরবনের দিকে। যাই সেই হিংস্র

অরণ্যলোকে, যাই গঙ্গাসাগরে,—যাই সেখানে—যেখানে আজো কেউ যায়নি। কিন্তু বেলা প'ড়ে এলো—মনোহরপুকুরের বনের গাছপালার মাথায় পড়ন্ত রোদ চিকচিক করছে। অবেলার দিকে অজানা পথে পা বাড়াতে আর সাহস হয়না। এখনও হাঁটতে হবে দু'ঘণ্টা তবে বাড়ী পেঁছতে পারবো।

নতুন বালীগঞ্জের পত্তন তখনও হয়নি, তখন রাসবিহারী এভেনু কল্পনার অতীত। দুর্গম বনময় গ্রাম, এলোমেলো পথ, সেই পথ ধ'রে যেতো পুরনো ছ্যাকড়াগাড়ী—সেই গাড়ী বালীগঞ্জ ষ্টেশন থেকে পালপার্বণে যাত্রীদের নিয়ে পেঁছে দিত কালীঘাটে। সেই পথ ধ'রে সোজা ফিরে আসা, কালীঘাট ছাড়িয়ে ভবানীপুরে এসে পেঁছতে পারলে তবেই দুর্ভাবনাটা যায়। এক সময়ে পথ ফুরিয়ে যেতো, কিন্তু পথের নেশা ফুরতো না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষে ছবি এঁকে যেতুম মনে মনে। সমস্ত চেতনাটার উপরে অসংখ্য পথের দাগ, সেই দাগ ধ'রে আমার কল্পনা ছুটে যেতো—যার কোনো আদি অন্ত নেই।

মামা একদিন বাড়ী ফিরে এসে বললেন, এবারে আর সাতশো রাক্কুসীর ঘরে হাঁড়ি চড়বে না—ব'লে রেখে দিলুম।

দিদিমা বললেন, অলক্ষণের কথা শোনো! বলি কেন, কি হয়েছে শুনি?

মামা চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, কলিযুগের শেষ হবে এবার। বড়-বাজারে নবগ্রহের যজ্ঞ বসেছে, খবর কি কিছু রাখো? মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প। তোমাদের পাখীর বাসা ভাঙবে এবার।

বাসা ভাঙলেই তোর মন ঠাণ্ডা হয়, কেমন? আজ ক'ছিলিম টেনে এসেছিস, শুনি?

মামা এবার চেঁচিয়ে বললেন, বাঙালী পল্টন চলেছে যুদ্ধে, খবর রাখো?

দিদিমা বললেন, কোথায় যুদ্ধ?

মুখ বেঁকিয়ে মামা বললেন, ইউরোপে—তোমার বাপের বাড়ীতে! ইউরোপ কোথায় জানো?

দিদিমা মুখ তুলে চেয়ে রইলেন। মামা বললেন, এ যুদ্ধে আর কাউকে বাঁচতে হবে না! সব আমি শুনে এলুম গোবর্ধনের দোকান থেকে। ছেলে-পুলে যদি রাস্তায় বেরোয়, আমি বাঁচাতে পারবো না। হেদোর মোড়ে সব সেপাই ব'সে গেছে। টুঁ শব্দটি করেছো কি একেবারে দ্বীপান্তরে চালান্ দেবে।

মামা আরো ব'লে দিলেন, এ যুদ্ধে ইংরেজ যদি হারে তবে বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। দেশে অরাজকতা আর প্রলয়। আর যদি জেতে, তবে দেখে নিয়ো তোমার জামাইয়ের মতন আমিও রায়-বাহাদুর টাইটেল্ পেয়ে যাবো।

মামা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সে-রাত্রে আমার চক্ষে ঘুম রইলো না। ইউরোপ শব্দটা আমাকে পেয়ে বসেছিল। শিশুপাঠ্য ভূগোলে ইউরোপের মানচিত্রটা থাকে বাঁ দিকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন কল্পনায় আমি তখন বেরিয়ে পড়েছি ভারতবর্ষের থেকে। চলেছি আফগান ইরাণ পেরিয়ে, চলেছি আরব আর ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে—চলেছি সাত সমুদ্র তেরো নদী উত্তীর্ণ হয়ে। চলেছি দূর থেকে দূরে। আমার চোখে ঘুম নেই।

বলাই—আমার সহপাঠী—তার হাত থেকে সেই আমার প্রথম চিঠি পাওয়া। সেই চিঠি এনেছিল পথের সংবাদ, পথ হারাবার নেশা, পথ ভুলে যাবার মোহ। ঘরে যারা মানুষ, ঘর তাদেরকে বেঁধে রাখে। ঘরে সুখ আছে, মুক্তির আনন্দ নেই। সেই কালে কলকাতা ছিল অনেক বড়—যেন আদি-অন্ত হীন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মহানগর হয়ে এসেছে ছোট। কথা কইতে কইতে শহর ফুরিয়ে যায়।

বলাই বলতো, এ-পথে হাঁটা হোলো, ও-পথটা বাকি রইলো—এ হলে চলবে না। সব রাস্তা, সব গলি পেরিয়ে যাওয়া চাই।

ভূগোলের শিক্ষক বলতেন, ট্রেনে যদি বিলেত যাওয়া হয়, তবে কোন্ পথে?

মামা বলতেন, বল্ দেখি পগেয়াপটি কোন্ দিকে? কোন্ দিকে জানবাজার?

বলতে পারতুম না, অবাক হয়ে থাকতুম। কতটুকু পথ জানি, এটি বড় কথা নয়। কতখানি পথ অপরিচিত রয়ে গেল সেইটিই আসল কথা। ক্ষুধা জেগে ওঠে মনে মনে,—রেলপথে ট্রেনের চাকার নীচে দিয়ে ক্ষুধার্ত মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে, খরস্রোতা গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে চলে, আকাশ-পথের উড্ডীন পাখীর ডানার তলায় তলায় ছুটে যায়। মন যায় দুর্গম অরণ্যলোকে, দুরারোহ পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়, ঝড় আর ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ অন্ধকার সমুদ্রের বিভীষিকায়। এই সুবিশাল প্রাচীন ভারতের সর্বত্র পিপাসার্ত মন প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়ায়।

কিন্তু বলাইয়ের সেই প্রথম চিঠিই হোলো মূলমন্ত্র—প্রথম প্রেরণা।

*

আমার দ্বিতীয় উদ্দীপনা ছিল শ্রীমান নন্দদা। তা'র কথাও বলবো। তার চোখ দুটো লাল। বড় বড় তারা দুটোয় রক্তের দাগ লেগে থাকতো। কবে যেন কোন্ ডাক্তার বলেছিল, এখন থেকে যদি চোখের চিকিৎসা না করা হয় তবে ভবিষ্যতে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

খুনী মাসিমা কেঁদে উঠলেন। তাঁর ওই একটিই ছেলে। ওকে নিয়েই তিনি বিধবা হয়েছেন আজ বছর পাঁচেক হোল। খুনী মাসিমা ডাক্তারের কথা শুনে প্রথমে কাঁদলেন চেঁচিয়ে। তারপরে কাঁদলেন ডুকরে-ডুকরে। তারপরে কাঁদলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিন্তু যে ব্যক্তির চোখের অসুখ, সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চড়িভাতি করতে গেল, কিংবা ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাদে উঠলো, কিংবা পাড়ার ছেলের কাছে সাইকেল বাগিয়ে নিয়ে গেল তখনকার বালীগঞ্জের দিকে বেড়াতে। আমরা রইলুম খুনী মাসীমার আশে পাশে! সমস্ত রাত্রি ধ'রে তিনি বারান্দার ধারে প'ড়ে অত্যন্ত করুণ নিঃশ্বাস ফেলেন, একা ব'সে থাকলে তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়ে,—আমরা কেউ কাছে গিয়ে বসলে তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চ'লে যান্। তাঁর নিজের ছেলেটির যদি দুই চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়, তবে অপরের দিকে তাকাতে তাঁর ভালো লাগবে কেন?

ডাক্তার বলেছিলেন, চোখ দুটোর রীতিমতো চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত খুব বেশী পড়াশুনো করাটা ভালো হবে না। ওতে নাকি দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

খুনী মাসিমার ছেলের নাম নন্দলাল! আমার চেয়ে বড়। নন্দদা এর আগে নীচের ক্লাশে ফেল করেছিল বার দুই! ইস্কুল যাবার নাম ক'রে সে যেত গঙ্গায় সাঁতার কাটতে,—সঙ্গে তা'র থাকতো গুলু ওস্তাগর লেনের বন্ধু—জলিল আর কেষ্টা—ওরা তিনজনে মিলে হাফপ্যাণ্ট প'রে সারাদিন ধ'রে গঙ্গায় সাঁতার কাটতো, আর বাড়ী এসে পৌঁছতো ঠিক বেলা চারটের সময় যখন ইস্কুলের ছুটি হয়। হাতে বই খাতা, পরণে ধুতি আর জামা। চোখ দুটো লাল! সেই লাল চোখ দেখে খুনী মাসিমা আবার ডুকরে কেঁদে উঠতেন।

বলতেন, পড়াশুনো করতে গিয়ে আমার ছেলের চোখ দুটো যদি যায়, তবে নাইবা হোলো পড়াশুনো! চোখ যদি বাঁচে, তবে ভিক্ষে করেও খেতে পারবে! নন্দ, বাবা—বই-খাতা তুই আর ধরিসনে!

খুনী মাসিমার কান্না দেখে নন্দদা চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠতো, একজামিন্ দিতে হবে না? আমার হয়ে তুমি পাস করবে? লেখাপড়া ছাড়লে খেতে দেবে কেউ?

নন্দদার নাকটা টেপা—চোখ দুটোর সঙ্গে সমতল। কিন্তু বিদ্যার প্রতি তা'র এমন নিবিড় অনুরাগ দেখে খুনী মাসিমা আবেগে অধীর হয়ে আঁচলে চোখ মুছতেন। আমি জানতুম ইস্কুল না গিয়ে নন্দদা রাস্তায় রাস্তায় গুলী খেলে, আর লাট্টু ঘোরায়; আমি জানতুম জলিল আর কেষ্টর সঙ্গে এমন সব জায়গায় সে আনাগোনা করে আর তাস খেলতে ব'সে যায়, যেখানে কখনো যেতে নেই! নন্দদা কোত্থেকে যেন টাকা আনে, আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাবারের দোকানে ঢোকে, কিংবা গাড়ীভাড়া দিয়ে টিকিট কিনে খেলা দেখতে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে থিয়েটারেও যেতে দেখেছি। কিন্তু এ সব খবর আমার মুখ দিয়ে বেরোলে আর রক্ষে নেই। নন্দদার নামে যদি কা'রো মুখ থেকে নিন্দে রটে, তবে খুনী মাসিমা চিৎকার করে তা'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন—এই ছিল ভয়। সবাই জানতো, লেখাপড়ায় নন্দদার এতটুকু মনোযোগ নেই, এবং পাড়ার অনেকগুলি ছেলে নন্দদার দলে মিশে একেবারে নষ্ট হতে বসেছে। পাশের বস্তির পিছনে গিয়ে হাওয়া-গাড়ী-মার্কা সিগারেট খাওয়া, মতি মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে লুকিয়ে ময়লা তাস সাজিয়ে জুয়া খেলা, কেষ্টদের ঘরে গিয়ে হারমোনিয়ম বাজানো—আর নয়ত এক একদিন অনেক রাত পর্যন্ত থিয়েটার দেখে বাড়ী ফেরা! এ সমস্ত কথা যদি কখনো খুনী মাসিমার কানে উঠতো, তবে তিনি চিৎকার করতেন। বিধবার একছেলের বিরুদ্ধে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই যে একজোট হয়েছে, এই সত্য আবিষ্কার করতে তাঁর এক মিনিটও দেরি হোতো না। আমরাও অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতুম।

নন্দদার চোখের চিকিৎসা হয় না, কিন্তু খুনী মাসীমা ছুটে যান গোয়া-বাগানের শীতলা তলায়, কাঁসারিপাড়ার ঠাকুর বাড়ীতে, ঠনঠনের কালীতলায়, আনন্দময়ীর মন্দিরে,—আর নয়তো কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানৎ করতে। বনের

পশুপক্ষী কেঁদে যায় খুনী মাসিমার দুঃখে। গরীবের ছেলে, মাথার ওপর কেউ নেই, ভবিষ্যতের সংস্থান নেই, উপার্জন ক'রে খাওয়াবার মতন মানুষ নেই,—এর ওপর চোখ দুটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে মাতাপুত্রে দাঁড়াবে কোথায়?

খুনী মাসিমা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হন্। অন্নজলের দিকে তাঁর রুচি থাকে না, ঘরকন্নার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই,—মুখের উপরে কাপড় মুড়ি দিয়ে তিনি এক কোণে পড়ে থাকেন। সমস্ত বাড়ীটায় অশান্তি আর উদ্বেগ যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

নন্দদা গিয়ে কাওরাপাড়ার বস্তিতে ঢোকে। সেখানে পাঁচু পালের সঙ্গে ব'সে তুবড়ী আর ফানুস তৈরী করে, আর নয়তো সবাইকে নিয়ে ব'সে বটতলার বই পড়তে পড়তে হেসে খুন হয়। আমি যাই অনেক সময় নন্দদার পিছু পিছু, তবে আমার ডিগ্‌ডিগে চেহারাটার জন্য শাস্তির ভয় ছিল প্রচুর। পাঁচু পাল নন্দদাকে পয়সা জোগাড় ক'রে আনতে বলে। ওরা ঝুপসি ঘরের মধ্যে ব'সে বিড়ি টানতে থাকে।

ঘুড়ি লাটাই নিয়ে নন্দদা যখন ছাদে ওঠে, খুনীমাসিমা যান্ তার সঙ্গে সঙ্গে। আমি লাটাই ধরি, নন্দদা ঘুড়ি ওড়ায়, আর ছাদের সিঁড়ির শেষ ধাপটির ওপর ব'সে খুনীমাসিমা ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে কাঁদেন। আমি ভাবতুম তিনি কাঁদেন কেন। একদিন খুনীমাসিমা এগিয়ে এসে নন্দকে ডাকলেন,—'নন্দ, বাবা, ঘুড়িটে কি ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিস?

নন্দদা তখন তিনকড়ি চাটুজ্যের ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ খেলছিল। অন্যমনস্ক-ভাবে বললে, হ্যাঁ, একটু একটু পাই।

ব্যস!—কেঁদে উঠলেন খুনীমাসিমা, মধুসূদন, নারায়ণ! তুমি বাছার চোখ দুটি রেখো বাবা! সিদ্ধেশ্বরী কালীকে আমি সোনার চোখ গড়িয়ে দেবো! নন্দ, বই পড়তে কি খুবই কষ্ট হয়?

আঃ তুমি যাও এখান থেকে!—নন্দ কঠিন লাল চক্ষে খুনীমাসিমাকে ধমকে ওঠে। তার চোখের তারা দুটোর নীচে শাদা অংশটায় রক্তের রেখা দেখা যায়। তারপর বলে, একশোবার বলেছি না যে, তেমন কষ্ট হয় না! শুধু চোখ দুটো জ্বালা করে, জল পড়তে থাকে, আর মাথা ঘুরে বমি আসে!

আঁৎকে ওঠেন খুনীমাসিমা! বলেন, অ্যাঁ, কি বললি?

বলবো আবার কি? ঘ্যানঘ্যান করো না এখানে! লেখাপড়া করতে গিয়ে যদি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যাই, তা'তে তোমাদের ক্ষতি কি? লেখাপড়া হলেই হোলো!—ভো কাটা! দুয়ো—দুয়ো—

তিনকড়ির ঘুড়ি কেটে গেছে। নন্দদা আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু পিছন ফিরে দেখি, খুনীমাসিমা তখন আবার ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। নন্দদার সুগভীর অভিমানের কথা শুনে তাঁর বুকের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠেছে। তিনি নন্দদার চক্ষুরত্ন দুটির জন্য মন্দিরে-মন্দিরে ঠাকুরের পায়ের তলায় মাথা কুটছেন বটে, কিন্তু চিকিৎসা করবার চেষ্টা একবারও করেন নি, তাই নন্দদার এই অভিমান!

খুনীমাসীমা চোখের জল মুছে নীচে নেমে গেলেন।

পরদিন সকালে বহু চেষ্টার পর চারটি টাকা জোগাড় ক'রে খুনীমাসিমা নন্দদার হাতে দিয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠালেন। আমাকে যেতে বললেন সঙ্গে। কিছুদূর গিয়ে নন্দদা আমাকে এক মনিহারির দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে গেল ডাক্তারের বাড়ীর দিকে। প্রায় পনেরো মিনিট। তারপর সে ফিরে এসে দু'আনা খরচ ক'রে এক শিশি ভেসেলিন পমেড কিনলো, এবং রাস্তার কলের জলের সাহায্যে লেবেল্‌টি তুলে ফেলে বাড়ীর দিকে চললো। আমাকে এক সময় শাসিয়ে রাখলো, খবরদার, আমার বিষয় কোন কথা তুই বাড়ীতে বলবিনে। এই নে, চার পয়সার দই খাস।

চারটি পয়সা নন্দদা আমার হাতে দিল। সেই পয়সা পেয়ে কেবল যে পরম কৃতার্থ বোধ করলুম তাই নয়। আমি ভাবলুম, এত বড় দাতাকর্ণও ভূভারতে নেই। বহুকাল পরেও দেখেছি, নন্দদা অপরের নাম-সই জাল ক'রে অপরের কোম্পানীর কাগজ ভাঙিয়ে এনেছে, আর সেই টাকা দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপকে উদ্ধার করেছে।

যাই হোক, বাড়ী ফিরে আসতেই খুনীমাসিমা আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন,—ডাক্তার কি বললে, নন্দ?

নন্দদা নিঃশ্বাস ফেলে ধপ ক'রে মেঝের ওপরেই ব'সে পড়লো। সেই হতাশ মুখ দেখে মায়ের প্রাণ হাউ হাউ ক'রে উঠলো। নন্দদা বললে, চোখ নষ্ট হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো!

তুচ্ছ

অ্যাঁ! আত্মহত্যে? কেন, বাবা? কি বললে ডাক্তার?

ডাক্তার বললে, তেমন আশা নেই! তবে অনেক দিন ধ'রে ওষুধ চালাতে হবে!—এই ব'লে নন্দদা সেই লেবেল তোলা পমেডের শিশিটা বা'র করলো।—পুনরায় বললে, চার টাকাই ডাক্তার নিল, আর এই ধার ক'রে ওষুধ এনেছি আড়াই টাকা! ওবেলা টাকা দিয়ে দিয়ো।

মেসোমশায় মারা যাবার আগে কিছু রেখে যাননি। সামান্য কিছু জামা কাপড়, কতকগুলো পেতল কাঁসা, গোটা দুই তিন বাক্স প্যাঁটরা, মাকড়ি-নাকছাবি-বাঁধানো-শাঁখা-নোয়া দড়িহার মিলিয়ে আন্দাজ শতখানেক টাকার সোনাদানা। কিন্তু তিন চার মাস ধ'রে নন্দদার চোখের চিকিৎসার পর দেখা গেল, চোখের উন্নতি তেমন কিছু হয়নি বটে, তবে মাসীমা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তিনি কালীঘাটে যে জোড়া পাঁঠা মানৎ করেছিলেন,—সেই ছাগল দুটি কিনতে গেলে অন্তত পাঁচ ছয় টাকা লাগবে বৈকি! কিন্তু সে টাকাও বর্তমানে যোগাড় করা আর সম্ভব নয়!

অবশ্য এই চার মাসের মধ্যে নন্দদার অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। পাঁচু পাল নাকি তাকে উপহার দিয়েছে সিল্কের পাঞ্জাবী আর রেশমী রুমাল; জলিল তা'কে নাকি দিয়েছে ফাউণ্টেন্‌পেন্‌ আর পামসু জুতো! কেষ্ট দিয়েছে দুই শিশি এসেন্স। নন্দদা মাথায় এতদিন ধ'রে লাগিয়েছে ভেসেলিন পমেড, আর আলবোট কেটে টেরি বাগিয়েছে। তা'র রেশমী পাঞ্জাবীর পকেটে হাওয়াগাড়ী সিগারেটের বদলে কাঁচি সিগারেটের বাক্স আর দেশালাই খড়খড় করে। থিয়েটার দেখে সে বাড়ী ফিরে আসে অনেক রাত্রে। অনেক রাত্রি হ'লে কিন্তু অসুবিধা নেই, কেননা কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। সমস্ত দিনের বেলাটা সূর্যের আলোয় তা'র দুই চোখে যন্ত্রণা হয়, রাত্রে অন্ধকারে বাগানে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরিবিলি ব'সে থাকলে চোখ আর মাথা দুই ঠাণ্ডা থাকে।

মামা একদিন খুনী মাসীমাকে ডেকে বললেন, ওরে, তোর ছেলেকে দেখে এলুম পগেয়াপটির মোড়ে—গ্যাঁড়াতলা থেকে খানিকটা এগিয়ে—

কেন, সেখানে কেন?

গাঁটকাটার দলে ভিড়েছে যে!

আমার ছেলের নামে এত বড় বদ্‌নাম দিচ্ছ যে?—খুনীমাসীমা চিৎকার ক'রে উঠলেন :—তুমি নিজে কি? তুমি ঠকিয়েছ কত লোককে? কত লোককে ধাপ্পা দিয়ে টাকা মেরেছো? তোমার কোন্ গুণে ঘাট আছে?

মামা খানিকটা দাঁড়ালেন। পরে বললেন, হুঁঃ, আমার বাপের টাকায় খেয়ে-প'রে আমার ওপর তম্বি! কেমন?

খবরদার।—ওধার থেকে দিদিমা চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, আমার স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তি,—আমার টাকা!

তোমার টাকা!—মামা হাঁকলেন, ফল্‌না ভটচার্যির টাকায় তোমার গুষ্টি মানুষ হচ্ছে না? তোমার টাকা! কেন, দেশে উকিল মোক্তার নেই? আদালত নেই? হাইকোর্ট নেই?

দিদিমা তারস্বরে চীৎকার করলেন, মুখ সামলে কথা বলিস, নন্‌স্যান্! এখনই গোঁসাইকলুকে খবর দিয়ে তোকে একেবারে গো-টে-হেল্ ক'রে ছাড়বো! খবরদার!

কোনো ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় দিদিমার না থাকলেও তিনি ইংরাজীতে কটূক্তি করতে পারতেন। কিন্তু মামা আর কোনো জবাব দিতে পারলেন না। কেন না ভীমকায় গোঁসাই কলু নামক সেই সমাজরক্ষক কুস্তীগীর হোলো দিদিমার অতি বাধ্য—সুতরাং তা'র কথাটা স্মরণ ক'রে মামা আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

নন্দদার চরিত্রের প্রতি এমন ভয়ানক কটাক্ষ শোনা ইস্তক খুনী মাসীমা মেঝের উপর প'ড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন—এক সময় সহসা মুখ তুলে হাউ হাউ করে বললেন, ছেলে যদি আমার মন্দ হয়েই থাকে, তবে মামার মতনই ভাগ্নে হয়েছে!

মামার মতন ভাগ্নে!—মামা ভিতর থেকে একবারটি বেরিয়ে এলেন। পুনরায় বললেন, মামা গাঁট কেটেছে, কিন্তু ধরা পড়েনি কখনো! তোর ছেলে হোলো কাঁচা চোর! ধরা পড়লেই মরা—এই ব'লে রাখলুম! বলে কিনা, মামার মতন ভাগ্নে! রাম বলো!

মামা আবার ঘরে ঢুকে তামাক টানতে বসলেন।

কিছুদিন পরে কোথা থেকে যেন ফিরে এসে নন্দদা হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলো, সে বিদেশে যাবে!

বিদেশে!

খুনী মাসিমা সবেমাত্র হবিষ্যি করতে বসেছিলেন। সেদিন দ্বাদশী। তিনি আঁতকে উঠে ভাত ফেলে দৌড়ে এলেন। বললেন, কোথা যাবি বাবা?

নন্দদা উত্তর দিল না। জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। খুনী মাসিমা কাছে এসে তা'র মাথায় হাত রেখে বললেন, নন্দ, কি হয়েছে বাবা? কোন্ দুঃখে যাবি বিদেশে? হ্যাঁ বাবা, কথা বলছিসনে যে?

খুনী মাসিমা ফুঁপিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে নন্দদা গভীর বেদনা কণ্ঠে নিয়ে বললে, সকলের চক্ষুশূল হয়ে থাকার চেয়ে সকলের চোখের আড়ালে চ'লে যাওয়াই ভালো!

সন্তানের বেদনায় জননীর প্রাণ আকুল-ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কেঁদে উঠে খুনী মাসিমা বললেন, তুই চক্ষুশূল হয়ে চলে গেলে আমি আর এখানে থাকবো মনে করেছিস? মা গঙ্গার কোলেও কি আমার ঠাঁই হবে না, নন্দ? কিন্তু তুই কোথায় যাবি, বাবা? নন্দ, আমার সাত রাজার ধন!

নন্দদা বললে, যাবো অনেক দূরে—জাহাজে চ'ড়ে সে দেশে যেতে হয়!

অ্যাঁ! জাহাজে! সমুদ্দুরের পথ!—খুনী মাসিমা ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। বাড়ীর সমস্ত বাতাসটা যেন সেই ব্যথায় ও কাতরতায় ঘুলিয়ে উঠলো। তিনি অনেকটা যেন ভেঙ্গে পড়লেন বিছানার একপাশে। কাঁদলেন তিনি অনেকক্ষণ। তারপরে একসময় বললেন, কোন্ দুঃখে তুই সমুদ্দুর পেরিয়ে যাবি, বাবা? হ্যাঁরে, নন্দ?

নন্দদাও তার মায়ের সঙ্গে ককিয়ে উঠলো, আমার জীবনের কি দুঃখ তা তোমরা কি জানবে?

আমি জানবো না, তবে কে জানবে বাবা?

অনেকক্ষণ পরে নন্দদা বললে, যাকগে, আমাকে যেতেই হবে সে-দেশে। এদেশে লেখাপড়া হলো না,—সে-দেশেই যাবো। যদি কোনোদিন অন্ধ হয়ে

যাই, তবে সে-দেশের লোক কি আর আমাকে দয়া করবে না? আমার দুঃখ নিয়ে আমি চ'লে যেতে চাই!

সমস্ত দিন ধ'রে নন্দদা বিছানায় প'ড়ে রইলো, আর সমস্ত দিন ধ'রে খুনীমাসিমা সেই একভাবে কাঁদতে লাগলেন আর ছেলেকে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। অবশেষে যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো, তখন নন্দদা বালিশের পাশ থেকে মুখ তুলে বললে, আমি কথা দিয়েছি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে, তিনি আমার জন্যে টিকিট কিনেছেন। যদি তোমরা সবাই মিলে আমাকে যেতে না দাও, তবে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, তা জানো?

বড় বড় চোখ মেলে নন্দদা মায়ের দিকে তাকালো। সেই চোখে নিশ্চিত আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত দেখতে পেয়ে খুনী মাসীমা শিউরে উঠলেন!

কী কান্না দীর্ঘ রাত পর্যন্ত। আমি নন্দদার পাশে শুয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছি। খুনী মাসীমার কাতর কান্না দেখলে বনের পশুপক্ষীও বোধ হয় কেঁদে যায়। মনে হচ্ছিল নন্দদার হয়তো চোখের অসুখ, কিন্তু মাসিমা যে একেবারেই অন্ধ! অজ্ঞান ব'লেই না অন্ধ! মা মাত্রেই বোধ হয় অন্ধ!

ডুকরে-ডুকরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে—খুনী মাসিমার সেই কান্নার আদি অন্ত নেই! ওদিকে জীবনের সমস্ত দুঃখ নিয়ে বালিশের তলায় মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে নন্দদা! নন্দদা চিরকালের মতো নিরুদ্দেশে চ'লে যাবে! চাকরি যদি সেই দেশে কোথাও পায় ভালো, যদি না পায় তবে তা'র সমস্ত ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পৃথিবীময় খুঁজলেও আর নন্দদাকে পাওয়া যাবে না।

রাত বোধ হয় দুটো বাজে। চারিদিক নীরব। বাড়ী সুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার চোখেও ঘুম এসেছিল। এমন সময় খুনী মাসীমা আবার ককিয়ে উঠলেন, তবে কি কোনো উপায় নেই? তবে কি কাল ভোরে উঠে গিয়ে গঙ্গার কোলেই আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে, বাবা?

নন্দদা প্রথমটা জবাব দিল না। নিশুতি রাত! ও ঘরে বড়দার বড় ঘড়িটায় টিক-টিক শব্দ হচ্ছে। পাছে কোথাও কেউ শুনতে পায় এ জন্য গলা নামিয়ে এক সময় নন্দদা বললে, আছে একটা উপায়, তুমি পারবে?

যেমন ক'রেই হোক পারবো, নন্দ! বাবা আমার!

নন্দদা বললে, হয় জাহাজে যাওয়া, আর নয়ত আত্মহত্যা, দুইয়ের একটা! কিন্তু একটা উপায় আছে এখনও!

খুনী মাসীমা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, কি বল্? মন খুলে বল্?

পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ো না ব'লে রাখছি!

খুনী মাসীমার অশ্রুভার দুটো চোখ জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। বললেন, না দোষ দোবো না, তুই বল্!

নন্দদা বললে, কেউ যেন না জানে! আমার চারদিকে এখন গোয়েন্দা। আমি নজরবন্দী। যদি না যাই, পুলিশে ধরবে! তবে হ্যাঁ, ক্যাপ্টেনকে যদি শতখানেক টাকা ঘুষ দেওয়া যায়, তবে হয়ত টিকিট খানা বাতিল হ'তে পারে! তুমি কিন্তু একথা কোথাও প্রকাশ ক'রো না ব'লে দিচ্ছি। গোয়েন্দাদের কানে যদি ওঠে, তাহলে আমার তিন বছর জেল্!

খুনী মাসীমা সুদীর্ঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, না কোথাও বলবো না। কাল আত্মীয় কুটুম্ব মহলের দরজায় দরজায় হত্যে দিয়ে সন্ধ্যের আগে তোকে টাকা দেবো! ভয় কি তোর, নন্দ?

অন্ধকারে নিঃসাড়ে শুয়ে আমি হাসলুম। এ আমি জানতুম!

*

সেকালের ভট্‌চার্যিবাগানের সেই বত্রিশ নম্বর বাড়ীর গায়ে ছিল মস্ত পুকুর। আশপাশে ছিল জাম তেঁতুল আর কাঠচাঁপার জঙ্গল। সবাই জানতো সেই পুকুর-ঘাটে থাকতো যক্ষি বুড়ি, জলের নীচের থেকে উঠে এসে বসতো সে ঘাটের সিঁড়িতে। ধুতরোর মতন তা'র শাদা চুল, ভয়ানক তার চোখের তারা। চৈত্রের দুপুরে যখন জাম গাছের ডালে ব'সে কাকের চোখে তন্দ্রা নামতো, দূরের কোন্ রেলের বাঁশী শোনা যেতো, আর কাঁসারিরা গলি দিয়ে পেরিয়ে যেতো ঠন্‌ঠনিয়ে—সেই সময় হয়ত কোনো মধ্যাহ্নের ঘুমভাঙা বালক চুপি চুপি যেতো পুকুর ঘাটে, কিন্তু যক্ষি বুড়ির ভয়ে তাকে থমকে দাঁড়াতে হোতো ওই বাড়ীর খিড়কি দরজায়। জাম-তেঁতুলের বনে উদাসী হাওয়া বয়ে যেতো ফুরফুরিয়ে, আর ঘুঘু ডেকে যেতো কোনো ভাঙা

পাঁচিলের পাশ দিয়ে, পথ দিয়ে যেতো সেই অদ্ভুত মেয়েছেলে,—'বা-ত ভা-লো ক-রি, দাঁতের পোকা ভালো করি'—সেই মেয়েছেলের পিঠে ঝোলানো থাকতো ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি, কানে রুপোর কানবালা, হাতে একগাছা রুপোর চুড়ি, আর খড়ের মতন শুকনো তা'র মাথার চুল। ওরা কোন্ জাত, কোন্ দেশের—কোনোদিন জানা যেতো না। ওরা কলাপাতায় তেল মাখিয়ে দাঁতের ওপর চেপে ধ'রে মন্তর পড়ে, আর সেই মন্তরের চোটে দাঁতের ভিতর থেকে শাদা শাদা পোকা বেরিয়ে আসে। তখন দেখা যেতো সেই ডাইনীর চোখে যেন পিশাচীর উল্লাস! দাও তাকে তখন চারটি পয়সা।

খিড়কির সেই পুকুরে তারপর কোথা থেকে এসে মাটি পড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে পুকুর বুজে মাঠ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে যক্ষি বুড়ি জলের তলাকার রাজ্য ছেড়ে তার হিসেব নিকেশ শেষ ক'রে কোথায় গেল চ'লে—তার খবর আর কিন্তু কেউ নিল না। ওরা হাওয়ায় ভেসে চ'লে যায়, ওদের ডানা আছে,—ওরা জ্যোৎস্নারাত্রে শাদা চুল এলিয়ে আকাশ পথে উড়ে যায়। আবার হয়ত কোনো অজানা পুকুরে গিয়ে জায়গা নিয়েছে—সেখানেও চৈত্রের দুপুরে মধুর হাওয়া ওঠে, জল ছল ছল করে ঘাটের শেষ সিঁড়িতে, বটের ঝুরি নেমে আসে জলে, আশে পাশে যজ্ঞি ডুমুর আর কাঁটা কুলের ঝাড়। যক্ষি বুড়ির চোখে তন্দ্রা নামে।—এমনি ক'রে কত গল্প শুনে যেতুম!

যেখানে ছিল পুকুর সেখানে জ'মে উঠলো গাড়ীর আড্ডা। আর সেই জঙ্গল কেটে জ্ঞান ভটচার্যির পাকাবাড়ী উঠলো। যেখানকার ছায়ায় গিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে গা ছম্‌ছম্ করতো, সেখানে এসে পড়তে লাগলো রাজমিস্ত্রিদের মালমসলা, গরুর গাড়ী বোঝাই ইঁট আর চুন সুরকি। দেখতে দেখতে কোথায় গেল সেই জাম-তেঁতুলতলা,—আর ঝোপ-ঝাড়, সেখানে এলো উগ্র দিনের আলো, লোকজনের আনাগোনা, আর ফড়ে-দালালদের হিসেব নিকেশের কচকচি। চেয়ে-চেয়ে দেখলুম, যেন একটা মস্ত কিছু ওখান থেকে বিদায় নিয়েছে; ওখানকার সেই ঝোপ-ঝাড়, সেই ছমছমে বাঁশবনের ছায়া, সেই শালিক পাখীর কণ্ঠে আর কাঠবিড়ালীর ঝিলিকে চমকে ওঠা বোশেখ মাসের দুপুরের তন্দ্রাটা, তারাও যেন ওই সঙ্গে বিদায় নিয়ে গেছে। কাজ সেরে গেছে সবাই—শুধু রেখে গেছে আমাকে যেন সমস্ত ওলোটপালটটা

দেখবার জন্য! আমি যেন সকল ভাঙগনের সাক্ষী! বাল্যকালটা আমাকে পিছনে ফেলে ওদের সঙেগ যেন চ'লে যাচ্ছে।

সেই বত্রিশ নম্বর বাড়ী চ'লে গেছে অনেককাল আগে। সেখান থেকে ভেঙেগ এখন সতেরো নম্বর। এরই সঙেগ আমাদের আশৈশব নিবিড় পরিচয়। কিন্তু আবার ভাঙগন ধরেছে এখানেও।

দিদিমা বললেন, ওরে, এ বাড়ী আমাকে বেচতেই হবে, নৈলে সুরেন রায়ের দেনা শুধবো কি ক'রে? পাটা বন্ধক দিয়ে এক একটা মেয়েকে পার করা হোলো, নাতিদের বে'থা দিলুম—এক এক ধাক্কায় টাকা এনে দিতে হোলো। আর এ বাড়ী থাকবে না।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিদিমা বললেন, একে একে পাঁচটি জামাই গেল, দুটো নাতনী গেল, খুনীকে আর নিবারণকে রাখতে পারলুম না। আমি আর কেন থাকি সংসারে!

দিদিমার পিঠের পাশটিতে ব'সে ছিলুম। আর সবাই ছিল আশেপাশে। সেদিন সামনে দিয়ে খাট সাজিয়ে নিয়ে গেল এ পাড়ার অক্রূর চাটুয্যেকে—গলায় থাকতো তার রুপোর চেন্ বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা, চুলের রাশি পড়তো পিছন দিকে, কপাল জোড়া সিঁদুর, কাঁধে ঝোলানো পাটকরা গামছা। হাতে মস্ত লাঠি। বিরাট শরীর ছিল তাঁর। চোখ দুটো দেখে ভয়ে আমরা পালিয়ে আসতুম সদর দরজা থেকে। সেই অক্রূর চাটুয্যেকে নিয়ে গেল সামনে দিয়ে। আর নিয়ে গেল ললিতবাবুকে আর ভাদুড়ী মশাইকে। তারপরে গেল সাতুবাবু।

দিদিমা আঁচলে আবার চোখ মুছে বললেন, পেটের ছেলে মানুষ হয়নি,—ওরা ছিল আমার সাত ব্যাটা! পাড়া কানা হয়ে গেল। এবার একে একে সব যাবার পালা!

দিদিমা?

কেন, বাপি?

বাড়ী বিক্রি হ'লে আমরা কোথা যাবো?

দিদিমার গলা দিয়ে কান্না উঠে এলো। তিনি বললেন, পথে পথে ভেসে যাবো! ওই কাওরা বস্তির সামনে দিয়ে যাবে বড় রাস্তা—সারি সারি বাড়ী

আর বড় বড় দোকান। এমনটি কি আর থাকবে! কার্তিকরা বাড়ী ছেড়ে চললো, দীপুদের আড্ডা ভাঙলো, লালাদের দোকান উঠলো,—গঙ্গার মা'র ঘর আর আস্তাবল ভেঙে এবারে সাফ হয়ে যাবে!

আমার কথার জবাবটা খুঁজে পাচ্ছিনে। পথে পথে ভেসে যাবো—কিন্তু সে কোন্ পথ? এ গলির পরে সেই গলি, তারপর ওই গলি—গলি পেরোলে ট্রাম রাস্তা, সেটা ছাড়িয়ে গির্জার পাশ দিয়ে সে অনেক দূর! সেখানেও ত' ভাঙন ধরেছে! ছাতুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গায় যাবার পথে সব ভাঙছে, ভাঙছে মানিকতলায়, শুঁড়িপাড়ায়, ভাঙছে কাঁসারিপাড়ায়, জেলেটোলায়—ভাঙছে চারদিকে। ঘর বাড়ী সব ভেঙে দিচ্ছে, আর ভেঙে দিচ্ছে মন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় ভাঙা বাড়ীর ভিতরকার শোবার ঘরের দেওয়াল আর কুলুঙ্গী, অন্দর মহলের সব লুকোনো আব্রুরাখার জায়গা। ওই সব ঘরে কেঁদেছে কত লোক, কত হাসির সঙ্গে চোখের জল গড়িয়েছে,—আর ওখানে ছিল কত নন্টুর মা, কত রত্নেশ্বরের মরা ছেলে যজ্ঞেশ্বর, কত সরলার মার-খাওয়া শিশু। ওরা সবাই কাজ সেরে চ'লে গেছে ঘর ভেঙে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমার কান্না পেতো।—

দালাল আনাগোনা করছে বাড়ীতে। তার নাম রামলাল। বুড়ো, কিন্তু লম্বা চওড়া। গলার আওয়াজ ভয়ানক মোটা। যমদূতের মতন এসে দাঁড়ায়—এ বাড়ী সে বিক্রি করিয়ে দেবে। বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলে কে কোথায় যাবে জানা নেই। কিন্তু শিকড় নড়েছে। কেউ যাবে কাশী, কেউ কেষ্ট-নগর, কেউবা যাদবপুর। কিন্তু মামা যাবেন কোথায়?

মামা চেঁচিয়ে ওঠেন পাশের ঘর থেকে। বাড়ী বিক্রি, বলে—যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই? জাল-উইলের জোরে কা'র বাপের সম্পত্তি হস্তান্তর করতে চায়? মাগি যেদিন বায়না করবে, সেই দিনই হাইকোর্টে ঠুক্‌বো এক নম্বর। বাপের ব্যাটা যদি হই, তবে ডুবো জাহাজ আবার তুলে আনবো।

দিদিমা হেঁকে ওঠেন—যা যা যা, ভারি সাধ্যি তোর! যা পারিস করগে যা। বলে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে!

মামা বলেন, হ্যাঁ, তাই যাবো। হাইকোর্টের প্যায়দারা আসবে, ঘুঘু চরবে, দারোয়ান ছুটবে—তবেই আমার নাম নোগে ভট্‌চায। তিনি পুরুষ

ধ'রে মামলা চলবে, আমি গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাকবো এই ফল্‌না ভট্‌চার্যির বাড়ীতে।

রামলাল-বুড়ো খন্দের আনে মাঝে মাঝে—এ বাড়ী দেখে যায়। মামা বলেন, ব্যাটাকে বাগে পাবো যেদিন, মুরগি-জবাই করবো!

কান পেতে শুনি দিদিমার গলা। সে গলায় যেন আর পুরনো তেজ নেই; কান পেতে শুনি মামার আওয়াজ, সেই আওয়াজের জোর যেন কবে থেকে ক'মে গেছে। ভাঙ্গন ধরেছে ওদের শক্তিতে, যেমন ভাঙ্গন ধরেছে পুরনো কলকাতায়। অবিনাশ কবিরাজের বাড়ী ভাঙ্গছে, ওই যেখান থেকে লাল রঙের বড়ি এনে দিতুম—সেই বড়িতে থাকতো গঙ্গাজলের গন্ধ। বুড়ো কবিরাজের চেহারাটা ছিল গঙ্গাজলের বর্ণ, সে গায়ে জড়িয়ে থাকতো তসরের চাদর—মাথায় ছিল তার শাদা চুল, আর শ্বেত চন্দন মাখানো থাকতো বুড়োর কপাল জুড়ে। কবিরাজের সেই মস্ত দোকান একদিন উঠে গেল। সরকারী কুলীরা ভাঙ্গতে লেগেছে তা'র বাড়ীটা। থাকবে না কেউ আর এ পাড়ায়। চৌধুরীরা চলে যাচ্ছে, সর্বাধিকারীরা বাড়ী খুঁজছে। আর গলির মধ্যে সেই নলিতবাবুর খুব সুন্দর বৌ—সেই যে আমাকে কাছে বসিয়ে হাসিমুখে তালের বড়া খাওয়াতো—তারা যেন কবে চ'লে গেছে কোন্‌ পাড়ায়। খোঁজ পেলুম না কোথায় হঠাৎ একদিন চ'লে গেল সেই অন্ধ গঙ্গার মা তার ঘরটি ছেড়ে। অন্ধকার একটি ঘরে থাকতো সেই বুড়ি, তার চৌকীর তলায় থাকতো পিতলের কয়েকটি বাসন। অন্ধকার থেকে সেই বাসন চকচক করতো, আর মনে প'ড়ে যেতো যক্ষি বুড়ির করাল চোখ। গঙ্গার মা পা বুলিয়ে-বুলিয়ে উঠতো তা'র ঘরে, কোমর থেকে চাবি নিয়ে খুলতো ঘর, আর তোলা উনুনে গুলের আগুন ধরিয়ে ভাত ফুটিয়ে খেতে ব'সে যেতো। ছোট্ট ঢিল ফেলতুম ওর ঘরের মধ্যে, আর বুড়ি আরম্ভ করতো গালাগালি। কান পেতে শোনা যায় না সেই কদর্য ভাষা, কিন্তু গঙ্গার মা চ'লে যাবার পর সেই গালি যেন মনে মনে শুনতে পেতুম। যারা দুঃখ পেয়ে গেছে আমার হাতে, তাদের জন্যেই নিঃশ্বাস পড়ছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

শেতলবাবুদের বস্তি ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে, পাঁচু পালরা চ'লে যাচ্ছে পাড়া ছেড়ে। সেই অন্ধ বুড়ো একদিন ম'রে গেল—সেই যে খড়কে পুড়িয়ে

মন্তরপড়া জলে ছ্যাঁকা দিত, আর আমার হাত থেকে নিত পাঁচটি পয়সা। শিশুর তড়কা হলে এক পয়সা, ভূতে পেলে কিন্তু জলের দাম বেশী। সেই বস্তির থেকে হরার মায়ের গলার আওয়াজ আর শুনিনে; কাওরানি বুড়ি আর লালার দোকানে পোস্ত দানা কিনতে আসে না,—ওরা কেউ মরেছে, কেউ বা স'রে গেছে।

এ বাড়ী বিক্রি করবেন দিদিমা! ওই যে বেলতলার ছাদে ছিল ভাঙগা রেলিংটা—শিশুদের প'ড়ে যাবার ভয়ে ওটায় দড়ি বেঁধে রাখতে হতো। কিন্তু এবার থেকে আর দরকার হবে না। বিষ্টুবাবুর ছাদের দেওয়াল থেকে চুণ-বালুর চাপ্‌ড়া খ'সে পড়ছে। ইঁটেল-চণ্ডী নাকি জানান দিচ্ছে, এ বাড়ীতে আর আমাদের জায়গা নেই। এই বেলতলার ছাদে দাঁড়ালে গন্ধ পাওয়া যেতো শরৎকালের, যখন আসেন দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—তিনি আসেন কৈলাস থেকে,—এই শরতের মেঘ যেদিকে ভেসে যায়, রাজহাঁসরা আসে যে দেশ থেকে। শোনা যেতো আগমনী গান এই বেলতলার ছাদ থেকে। কবেকার কোন্ জননীর বুকফাটা কান্না সোনামাখানো রোদ্দুরে আর হাওয়ায় ভেসে আসতো আমাদের কানে—"কবে যাবে গিরিবর আনিতে আমার উমাধনে। যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, মা বিনে উমা কত কেঁদেছে।"

কোন্ মা কেঁদেছে কবে? কাঁদবে না কি মা বসুমতী এই বাড়ীর অনেক নীচের থেকে—যেদিন আমরা একে ছেড়ে চ'লে যাবো? কাঁদবে না কি আজকের এই এলোমেলো হাওয়া অন্ধকার ঘরে ঘরে—যখন একজনও কেউ এখানে থাকবে না? এখান থেকে বড় ছাদের পাঁচিল পেরিয়ে দেখা যায় কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা আকাশ,—গোলা পায়রারা পাখার শব্দ ক'রে উড়ে গিয়ে যেদিকে উধাও হয়ে যায়, আর নিম গাছটা হেমন্তের হাওয়ায় থরথরিয়ে ওঠে, আর বেল গাছ থেকে কাকের বাসা সেই হাওয়ায় শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে। এখান থেকে দেখতুম শ্রাবণ মাসের বর্ষা—ওই নারকেল গাছটা যেন কুঁকড়ে যেতো ঝড়ে আর বৃষ্টিতে, শ্যাওলাধরা ওর পাঁচিল থেকে জল গড়িয়ে আসতো—আর সেই শ্যাওলার ওপর নাক রেখে শুঁকতুম শ্রাবণ মাসের ভিজে গন্ধ। সব ছেড়ে এবার আমাদের চ'লে যেতে হবে! বুড়ো রামলাল খদ্দের আনছে একে একে।

দিদিমা?

দিদিমা চুপ ক'রে শুয়ে ছিলেন বেলতলার ছাদে। জবাব দিলেন, কেন, ভাই?

কান্নায় থতিয়ে গেল বালকের মুখের আওয়াজ। একটু সামলে নিয়ে বললুম, বাড়ী বিক্রি হ'লে তুমি যাবে কোথায়?

আমি? আমি যাবো কাশী। যেদিন শেষ হবে সেদিন হাড় ক'খানা যাবে মণিকর্ণিকায়। কাশী, কাশী বিশ্বনাথ!

দিদিমার বুকের ভিতরটা ওই বিশ্বনাথের জন্যে যেন হাহাকার ক'রে উঠতো, হাহাকার করতো এ বাড়ীর মমতায়। সেই হাহাকার শুনতুম কান পেতে। সেই হাহাকারে শুনতে পেতুম কলকাতার ভাঙনের আওয়াজ,—আসছে যেন নতুন, কিছু একটা নতুন। হয়ত ঘোড়ায় চ'ড়ে আসছে সেই কল্কি অবতার, তার পায়ের ধুলো উড়ছে চারিদিকে! আমরা কোথায় ঠিকরে যাবো কেউ জানে না। সামনের ভবিষ্যৎটা ভয়ের মতন এসে দাঁড়াচ্ছে।

বোনেদের একে একে বিয়ে হয়ে চ'লে গেছে। যারা কাছে ছিল, পাশে ছিল, তারাও দেনা পাওনা বুঝে নিয়েছে। মামার সেই ডালিম গাছ শুকিয়ে গেছে, পুষি বিড়ালটা মরে গেছে কোথায় কোন্ আঁস্তাকুড়ের পাশে শুয়ে। ও বাড়ীর সেই ভাগ্নি বিনু—তারও বিয়ে হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কানামাছি খেলাটা জমে উঠেছিল দিনে দিনে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলুম, আর কাছে আসে না। ভিতর মহলে সে থাকে, ঘাগরার বদলে শাড়ী পরে, বিনুনির বদলে খোঁপা বাঁধে, নতুন মামীর সঙ্গে হাসি তামাসা করে। বিনু হোলো বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে, গরীবের ছেলেটার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সমস্ত দিনমান ধরে যার সঙ্গে খেলাধুলোর কথাই শুধু ভাবতুম, হঠাৎ একদিন সমস্ত খেলা ফেলে রেখে সে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। পিছন ফিরে একবারও তাকালো না, কাঙাল গরীবের দুটো আকুল চোখ তার দিকে কেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রয়েছে। বিনু একদিন শ্বশুরবাড়ী চ'লে গেল।

*

দেখতে দেখতে ক্ষিরি নাপতিনি চোখ বুজলো। ম'রে গেল মানুর মা। তারপর ম'রে গেল নয়নদাদা। নয়ন দাদার বয়স হয়েছিল চার বছর কম একশো। শনদড়ির মতো তার মাথার চুল, কোঁচকানো চামড়ার মধ্যে তার শরীরে ছিল চওড়া হাড়, কথা বলতো কম,—শ্যাকরা বাড়ীর টাকা আদায় ক'রে বেড়াতো এখানে ওখানে। সে নাকি মরবার আগে পর্যন্ত এক সের ক'রে খাঁটি দুধ খেতো! দেখলুম বেহারী বুড়োর গঙ্গাযাত্রা। বুড়ো খাবি খাচ্ছে,—তাকে খাটে ক'রে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল নিমতলায়।

বাড়ীর ভিতর ঘর-কন্না ভাঙ্গছে। ন'মাসিমা চ'লে গেছেন কাশী—আগে ভাগে ছেলে মেয়েকে নিয়ে। সমস্ত বাড়ীময় প্রবল অশান্তি বাধিয়ে সরলা গেছে শ্বশুর বাড়ী। মামী বলছেন, বাড়ী বেচে আমায় কিছু দিয়ো। চিরকাল তোমাদের বাড়ীতে ঝিগিরি করলুম,—এবারে বেরিয়ে পড়বো। আমি গিয়ে থাকবো কেষ্টনগরে। সেখানে আজও আমার বাপ-খুড়োর গুষ্টিরা বেঁচে আছে।

দিদিমা বললেন, তোমাকে টাকা দেবো কোন্ সুবাদে?

আমার পাওনা আমি নিয়ে চ'লে যাবো এখান থেকে।

ওই দস্যুকে বুঝি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে যেতে চাও?

সে তোমরা মায়ে-ব্যাটায় বোঝাপড়া ক'রো, আমি জানতেও আসবো না!—মামী মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলেন।

দিদিমা হেঁকে বললেন, তোমার সোয়ামী আমার নামে হাইকোর্ট করবে, আর আমি দুধকলা দিয়ে সাপ পুষবো, কেমন?

মামীর দিক থেকে আর কোনো সাড়া এলো না।

ওদিকের শূন্য মহলটায় আর ভাড়াটে আসছে না। ভাড়ার নোটিশ ঝুলছে দোতলার জানলায়, কিন্তু খোঁজ নিতে আসছে না কেউ। সুরেন রায়ের কাছে বাড়ী বাঁধা—তাদের ওখান থেকে টাকার তাগাদা আসছে। সুদ আর আসলে টাকা জমেছে অনেক। এদিকে ভাড়াটের অভাবে দিদিমার খরচ পত্র চলছে না। বুড়ো দালাল রামলাল প্রায় রোজই আনাগোনা করছে। বাড়ী কেনবার লোক প্রস্তুত।

তুচ্ছ

কালো বিড়ালটা কেঁদে যায় ভাঙগা পাঁচিলের ধার দিয়ে, আঁস্তাকুড়ের পাশ দিয়ে। ও বিড়ালটা নাকি অলক্ষণে—দিদিমা বলেন। বিড়ালটা আসে রাত্রে, যখন ওদিকের শূন্য মহলে সাঁ সাঁ করে যায় হাওয়া,—যখন এদিকের মহল একেবারে নিশুতি,—নিচের তলায় যখন জনমানব থাকে না। কালো বিড়ালের ডাক শোনা যায় বেলগাছের নীচে, আনাচে কানাচে,—ওর সঙেগ যেন একাকিনী পেত্নীর কান্নাটাও মিলে যায়। সিঁড়ির তলাটা অন্ধকার, কলতলার পাড়াটাও ঝুপসি। বুঝতে পারা যায় আর কিছুদিন পরে এ বাড়ীতে একটি মানুষও থাকবে না। এ কথা মনে রয়ে গেল এই বাড়ীতে কেউ কা'রো জন্যে কখনো কাঁদলো না, কেউ কাউকে বুক ভ'রে ভালো বাসলো না, কেউ বড় রকমের কিছু লেখাপড়া শিখলো না, কোনোদিন কারো মুখ থেকে ভালো কথা শোনা গেল না। এরা শুধু মরবার জন্যে বেঁচেছিল, বাঁচবার জন্যে ঘরে ঘরে ভাত ফুটিয়ে খেয়েছিল।

ভাঙগন ধরেছে কলকাতায়। নতুন নতুন রাস্তা হচ্ছে, নিত্য নতুন নক্সায় একটির পর একটি প্রাসাদ গ'ড়ে উঠছে। যারা পুরনো ছিল, যারা পুকুর-ঘাট আঁকড়ে ছিল, যারা জামার বদলে উড়ুনি আর কোর্তা গায়ে দিয়ে মাথায় গামছা চাপিয়ে ঘুরে বেড়াতো,—তা'রা ধীরে ধীরে স'রে যাচ্ছে। পাড়ায় আর ভিস্তির দেখা পাইনে, কাবলীওলার সংখ্যা যাচ্ছে কমে, পাল্‌কির আড্ডায় পাল্‌কি আর বেহারাদের যখন তখন দেখা যাচ্ছে না, খোলার খাপরা তা'র নোংরা হাওয়া নিয়ে স'রে যাচ্ছে, পাড়ায়-পাড়ায় মিশনারিরা আগের মতন আর ঘুরছে না। মিত্তিরদের জুড়ি গাড়ী বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, হরমোহন বাবুরা নাকি মোটর গাড়ী কিনবে, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নাকি পিচ্ পড়বে, হাবড়ার পুল নাকি থাকবে না।

ভাঙগন ধরছে পাড়ায় পাড়ায়। যা কিছু পুরনো, এবার থেকে সে সব লোপ পেয়ে যাবে। তারা যে-যার কোথায় স'রে যাবে কেউ জানে না। তারা নাকি থাকবে কেবল ইতিহাসে। পুরনোটা পালাচ্ছে, নতুনটাকে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিনে। যদি জিজ্ঞেস করো, এত যে ভাঙগছে, এত যে গ'ড়ে উঠছে—এখানে আসবে কা'রা, কা'রা থাকবে—কেমন তাদের চেহারা, তাদের সঙেগ এদের মিলবে কি না,—এ সব কথার জবাব কারো মুখেই নেই। ওরা

কেবল ভেঙেগই যাচ্ছে, ওদের কাজ হোলো ভাঙগনের,—ওরা প্রশস্ত জায়গা রেখে দিচ্ছে তাদের জন্যে, যাদের সঙেগ ওদের কোনো জানাশোনা নেই।

মাঝরাত্রে দিদিমার সাড়া পাওয়া যায়। তাঁর ঘুম নেই, ঘুম তাঁর আসে না। তিনি ডাকেন, জেগে আছো মা, বিশু?

এদিক থেকে উত্তর আসে, কেন, মা?

তোমার মনে আছে, ওমহলের কোণের ঘরে সেই বোষ্টমদের? কী গানই গাইতো তা'রা! এখনো কানে শুনছি!

মা বলেন, সব মনে আছে।

দিদিমা বলেন, সেই মেয়েটাকে কোত্থেকে যেন ধ'রে এনেছিল। কী মারধরই করতো! মেয়েটার আচার-ব্যাভার কিন্তু ভালোই ছিল!

মা বলেন, পোড়ারমুখির জ্ঞানবুদ্ধি ছিলনা কিছু।

ওই পর্যন্তই। দিদিমাও চুপ, মায়েরও আর কোনো সাড়া নেই। পোড়ার-মুখির কথাটা আমিও কিন্তু ভুলিনি। মেয়েটার নাকে তিলক, হাতে উল্‌কির লেখা—'হরে কৃষ্ণ', মাথার খোঁপায় বেলফুলের মালা, চোখ দুটোয় যেন ঘুমের ভাব, পরণে থান কাপড়,—মেয়েটার সোঁদা সোঁদা গা, সেই গা থেকে চন্দনের গন্ধ পেতুম। কীর্তনের কলি থাকতো তা'র মুখে দিনরাত, আর—সে গান গাইলে আমাদের এদিকে সকলের হাত থেকে কাজ প'ড়ে যেতো। একদিন বাড়ী ছেড়ে তা'রা চ'লে গেল, কিন্তু তা'র মাথুরের গান সেই থেকে এই বাড়ীর বুকের তলাটাকে টনটনিয়ে তুলতো। কীর্তনের সেই কান্না রেখে গেছে ওই কোণের ঘরের হাওয়ায়।

ওরই পাশের ঘরের সেই বেথুন কলেজে পড়া ফর্সা মেয়েদুটোকে মনে পড়ে। তা'রা বয়সে অনেক বড়। তাদের বাপের নাম রমাকান্ত কাকাটিয়া। তারা আসামের লোক,—এখানে এসেছিল লেখাপড়ার সুবিধের জন্য। মনে পড়ছে কোনোদিন কথা বলেনি তারা। তা'রা সম্ভ্রান্ত, তা'রা শিক্ষিত, তাদের পোষাকের আভিজাত্য। কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দয়ার চোখে দেখে স'রে গেছে। নিজেদের মধ্যে বিদ্রূপের হাসি হেসেছে নিজেদের ভাষায়, কিন্তু সম্ভ্রমের চক্ষে ওদের দেখেছি। বুঝতে পারতুম কী ঘৃণা কী কৃপা আমাদের

ওপর। কী কঠিন হাসি মাখানো থাকতো ওদের মুখে। গোলাপ ফুলের মতন চেহারা,—কিন্তু যেন শুক্‌নো রঙগীন কাগজের ফুল। ওদের চোখ দিয়ে আমরা নিজেদেরই দেখতুম, আমরা কী কাঙগাল, কী অকিঞ্চন, কী নির্বোধ। যতদিন তা'রা ছিল ওই বড় ঘরে, ততদিন ওদের ঘৃণা বয়ে বেড়িয়েছি।

দরজার মাথার উপরে যে ঘর, সেই ঘরে ছিল অরুণ চৌধুরী। জমীদারের ছেলে সে, শান্তিপুরের ধুতি পরতো, সারাদিনে পাঁচ ছয়বার চান্‌ করতো সাবান দিয়ে—আর গায়ে একটি গেঞ্জি দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো। তা'র ছিল একটু মাথার দোষ, নিজের মনে কী বকতো, আর চাকরকে সরিয়ে নিজের হাতে পান সাজতে বসতো। কী সৌখীন তা'র নজর, কী সুন্দর তা'র চেহারা। হঠাৎ একদিন রাত্রে সে খুন করতে উঠলো তা'র চাকরটাকে। চীৎকারে ঘুম ভাঙগলো আমাদের। মামা এদিক থেকে লাঠি ঠকঠক করলেন, কিন্তু খুনে পাগলের সামনে গিয়ে তাঁর দাঁড়াবার সাহস ছিল না। চাকরের চীৎকারে অত রাত্রেও রাস্তায় লোক জড়ো হলো। শেষকালে তাকে তালাবন্ধ ক'রে চাকরটা বেরিয়ে এসে এক কোণে রাত কাটালো। পরদিন থানা পুলিশ। সেই জমিদারের ছেলেকে নিয়ে গেল নাকি বহরমপুরে।...

সব ঘরের গল্প আমার মুখস্থ। শূন্য মহলের অতীত কাহিনীরা আমার কানে আর মনে যেন রাত হলেই ভীড় ক'রে আসে। সেই ছিন্নভিন্নরা প'ড়ে থাকবে শূন্য ঘরে ঘরে, ঘুরে বেড়াবে এ বাড়ীর হাওয়ায়, দেওয়ালে-পাঁচিলে, আনাচে কানাচে। কিন্তু আমরা আর এখানে থাকবোনা।

মামা যেন একটু বদলে গেছেন, একটু ঠাণ্ডা হয়েছেন। একদিন বললেন, বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলে বাড়ী আমি ফেরৎ পাবো—কিন্তু কত টাকায় বিক্রি হচ্ছে শুনি?

দিদিমা বললেন, বটে, টাকার গন্ধ পেয়েছিস বুঝি? তোর এত মাথা ব্যথা কিসের?

আমার বাপের সম্পত্তি।

বাপের মুখে জল দিয়েছিলি? ঘাটে গিয়ে আগুন দিয়েছিলি?

মামা মুখ বিকৃত ক'রে খিঁচিয়ে উঠলেন, পুরনো কাসুন্দি তুলে পাড়া

জানান্‌ দিচ্ছ? বিষ খাইয়ে কা'রা পাগল করেছিল ফল্‌না ভটচার্যিকে? জাল-উইলে কা'রা সই করিয়ে নিয়েছিল পাগলকে দিয়ে?

তুই মুখ সামলে কথা ক'স ব'লে দিচ্ছি!—দিদিমা রুখে বসলেন। ঝড়ের ডাক শুনে আমরা ঘরে গিয়ে লুকোলুম।

মামা তেড়ে উঠে বললেন, টাকার ভাগ আমি চাই, নৈলে হাইকোর্টে গিয়ে ওই জাল উইল আর বিষ খাওয়ানো প্রমাণ করবো!

তবে হাইকোর্টেই যা, মেনিমুখ নিয়ে ঘরে ব'সে থাকিস কেন? টাকা চাস কোন্‌ লজ্জায়?

মামা বললেন, যাবো, হাইকোর্টেই যাবো,—তার আগে সব নিকেশ ক'রে যাবো। তোকে নিয়ে যাবো! ছুরিখানা আমার আজও ভোঁতা হয়নি।

মামা ঘরে গিয়ে ঢোকেন। মাঝে মাঝে তাঁর ছুরিতে মরচে ধ'রে যায়, মাঝে মাঝে সেই ছুরি তিনি শানিয়ে তোলেন। সেই ছুরিটি একদিন আমি লুকিয়ে দেখে এসেছি। সেখানা ছোরা নয়,—ছোট্ট পেন্‌সিল্‌ কাটা ছুরি। কিন্তু তারই ভয় ক'রে এসেছি আমরা এতকাল। ওর চেয়ে খুন্তি ভালো, চিম্‌টে ভালো, এমন কি সোন্না-নরুণও ভালো। ছয় পয়সা দামের ছোট্ট একখানা ছুরি। যা ছোট ছেলের পকেটে-পকেটে ঘোরে।

তবু সকলের মধ্যে একটা হৃৎকম্প ছিল—যেদিন বাড়ী বিক্রি হবে, সেদিন মামার কী উত্তাল চেহারা। দানবের হুঙ্কারে সেদিন কেঁপে উঠবে বাসুকীর ফণাটা, কেঁপে উঠবে পৃথিবীর তলাটা। সেদিনকার ভূমিকম্পের দোলনটা কে সইবে? কা'র এমন সাহস? ঠাকুর ঘরে গিয়ে দিদিমা চুপি চুপি আলোচনা করেন। যেদিন বাড়ী বিক্রি হবে, সেদিন দিদিমাকে বাঁচানোর জন্য থানা থেকে পাহারাওলাকে আনা দরকার,—বটতলার থানায় ডায়েরী ক'রে আসা চাই সকলের আগে। মামা ভয়ানক হিংস্র, তাঁর হাত থেকে সাবধান থাকা দরকার।

সাতপুরুষ ধ'রে শিকড় নেমে গেছে এই পাড়ার মাটির তলায়, তা'কে উপ্‌ড়ে ফেলবার সময় এসেছে এবার। আর সময় নেই, নতুনের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ভাঙনের আওয়াজ আসছে কানে। গুছিয়ে যদি নিতে হয় তবে এই বেলা। এই বেলা ঘট ভ'রে নাও, কাজ সেরে রাখো, ফসল ঘরে তোলো।

এবার ঝড় উঠবে, ঈশানের কোণে কালো মেঘ জমেছে, তুফান আসবে সমুদ্রে। এই বেলা তীরে ওঠো।

দিদিমা বলেন, ওরে, ন্যায়বাগীশের বংশ, গলগন্ড মেলাবার গুষ্ঠি। বন কেটে বসতি বসেছিল ওই বত্রিশ নম্বর বাড়ীতে। সে অনেককালের কথা, ভাই।

মুখ তুলে তাকাতুম দিদিমার দিকে।

দিদিমা গল্প ব'লে যেতেন। যশোর খুলনা জেলার এক বামুনের ছেলে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল সুতোনুটিতে, ছেলেটার নাম ছিল অনন্তরাম। দেখতে রাজপুত্তুর, কিন্তু গলায় ছিল গলগন্ড। সে আজ দুশো বছর আগের কথা রে, তখন এদেশে নবাবী আমল, কোম্পানীর রাজত্ব তখনও হয়নি। রেলগাড়ী নেই, পায়ে হাঁটা পথ। ছেলেটা এসে উঠলো শোভাবাজারের মস্ত রাজবাড়ীতে। সেখানে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। রাজার ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে ছেলেটা পুরুতের কাজ নিল। খায় দায়, আর থাকে একটা ঘরে। রাজবাড়ীর পুজো, পাওনা-গন্ডা বেশ ভালোই। অনন্তরাম রোজ গঙ্গাস্নান সেরে এসে গলায় উড়ুনীখানা জড়িয়ে পুজো করতে বসে। পুজো করে এক মনে, পুজোর মন্তর শুনে সকলের গায়ে কাঁটা দেয়। একদিন কিন্তু রাজার নজরে প'ড়ে গেল। রাজা বললেন, ঠাকুর মশাই, তোমার গলায় ওই উড়ুনীখানা কেন জড়ানো থাকে? অনন্তরাম মিছে কথা বলতে পারতেন না। বললেন, রাজা মশাই, ওটা আমার গলগন্ড! ওটা নিয়েই আমি জন্মেছি। রাজার মুখ গম্ভীর হোলো। বললেন, শরীরে একটা খুঁৎ নিয়ে রাজবাড়ীতে তোমার পুরুতগিরি করতে আসা উচিত হয়নি! তুমি এমন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, এত ভক্তি তোমার, ঠাকুরের দয়ায় ও রোগটা কেন তোমার সারেনি? এই কথা শুনে অনন্তরাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ব্রাহ্মণের মুখের ওপর এত বড় কথা? আমি চললুম। এ রোগ যদি সারাতে পারি তবেই দেবতার ভজনা করবো, নৈলে না খেয়ে মরবো পথের ধারে শুয়ে। এই ব'লে ন্যায়বাগীশ গঙ্গায় চললেন। গলাজলে নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনদিন চোখ বুজে। তিনদিন পরে সেই গলগন্ড মিলিয়ে গেল।

মিলিয়ে গেল!—আমরা উৎসুক প্রশ্ন করলুম দিদিমাকে।

হ্যাঁ, মিলিয়ে গেল। অনন্তরাম ফিরে এলো হাসি মুখে আবার রাজ-বাড়ীতে। সেই দেখে রাজা কেঁদে পড়লেন সেই ব্রাহ্মণের পায়ে। বললেন, অপরাধ নিয়ো না, ঠাকুর—কি বলতে কি বলেছি! তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি নারায়ণ! তোমার পায়ের ধুলোয় রাজবাড়ী পবিত্র হোক। যা তুমি চাও তাই দেবো! ন্যায়বাগীশ বললেন, আমি দেবসেবা চাই, আর কিছু চাইনে। রাজা সে কথা শুনলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করলেন। তখন কাঁসারিপাড়া, ঠন্‌ঠনে, বার-শিমলে, পুঁটিবাগান সমস্তই জঙ্গল, বাদুড় বাগানের ওদিকে বাঘ ডাকে, কালীঘাটে যেতে গেলে ডাকাতে অঞ্চল পেরিয়ে যেতে হয়,—মাঝখানে ধান ক্ষেত আর বন বাদাড়। সেই সময় ন্যায়বাগীশ জায়গা পেলেন এই বার-শিমলেয়। সেই থেকে এ পাড়ার নাম হোলো ভটচার্যি বাগান। তোর মামাতো ভাইকে নিয়ে এই হোলো সাত পুরুষ। ন্যায়বাগীশের বংশ যে। ওদের কত বোল-বোলা, বারো মাসে তেরো পার্বণ,—ওদের কথায় রাজা ওঠে বসে।

টিপটিপ ক'রে রেড়ির তেলের পিদিমটা জ্বলে। বালিধসা ফাটলধরা দেওয়ালে দুশো বছর আগেকার ছায়ারা যেন ন'ড়ে বেড়ায়। সেকালের সেই নবাব, সেই শোভাবাজারের রাজা, সেই সেপাই সান্ত্রী পাহারা,—তাদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায় তরুণ ব্রাহ্মণ,—আপন অহঙ্কার আর মহিমায় ওই পিদিমের আলোয় জ্বলজ্বল করে।

দিদিমা বলেন, শুনবি তবে আর এক গল্প? শোন্ তবে—

তিনি যেন আরেক যুগ এসে থমকে দাঁড়ান,—আরেক গল্প তুলে ধরেন আমাদের চোখের সামনে।

ফরিদপুরের কোন্ গাঁয়ে এক বর গিয়েছিল বিয়ে করতে। হাবড়া জেলার বর, বরযাত্রীরাও তাই। বিয়ের দুদিন পরে বরের দল শেষ রাত্রে উঠেছে নৌকোয়,—মস্ত বজরা নৌকো। ভোরের আলো ফুটতে দেখা গেল, বছর তেরো বয়সের একটি বামুনের ছেলে সেই নৌকোয় সবাইকে লুকিয়ে উঠে বসেছে আগের রাত্তিরে। ছেলেটার পৈতে হয়েছে সবে, মাথাটা ন্যাড়া, গায়ে শাদা চাদর—দেখতে একেবারে চাঁদের টুকরো। বিষয় আশয় সম্পত্তি আত্মীয় স্বজন ছেড়ে সেই ছেলে বিবাগী হয়ে চললো ওদের সঙ্গে, কিছুতেই নৌকো

থেকে নামলো না! ওদের সঙ্গেই এলো পালিয়ে। হাবড়া রামকেষ্টপুরের ঘাটে নেমে সেই ছেলে উঠলো এসে ওদের বাড়ীতে—সাঁতরাগাছিতে। লেখাপড়া নিয়ে ছেলেটা বসে গেল, ওদের ঘরেই মানুষ হতে লাগলো। কোথায় রইলো তা'র মা-বাপ, কোথায় রইলো তা'র দেশ-গাঁ। সেই বাড়ীতে ছিল গোলাপসুন্দরী ব'লে খাঁয়েদের মেয়ে। খাঁগুষ্ঠির ছেলেমেয়ের রূপের বড় দেমাক। সেই মেয়ের সঙ্গে বে'থা দিয়ে খাঁয়েরা ওই ছেলেটাকে করলো ঘর জামাই। ঘর দিলে, জমি দিলে, ভাগের ভাগ দিলে। সেই গোলাপসুন্দরীর রূপ ছিল ডাকসাইটে। এত রূপ সেই মেয়ের যে, নিজের দিকে চাইতে পারতো না। একদিন কি হোলো জানিস ভাই? নিজের রূপ দেখে নিজেই সে পাগল হয়ে গেল। নীচের তলাকার একখানা এঁদোপড়া অন্ধকার ঘরে তাকে বেঁধে রাখতে হোলো! আহা, একুশ বছর বয়সে সেই গোলাপসুন্দরী পাগল অবস্থায় একদিন ম'রে গেল! রেখে গেল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

এপাশ থেকে মা বললেন, পুরনো কথা আর কেন তোলো, মা? ওসব কাহিনী ডুবে যেতে দাও!

দিদিমা বললেন, তা হোক মা। কবে বলতে কবে ম'রে যাবো, সব কথা ব'লেই যাই। ওরা বংশ পরিচয় জেনে রাখুক। সেই গোলাপসুন্দরী কে জানিস, ভাই?

ভাইবোনেরা সবাই মুখ তুলে তাকালুম দিদিমার মুখের দিকে। দিদিমা বললেন, সেই হোলো তোদের ঠাকুমা! তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল। আর ওই ছেলেটাই তোদের ঠাকুরদাদা!

পিদিমের আলোটা তখন প্রায় নিবে এসেছে। সেই অন্ধকারে কি দেখতুম? কী দেখতুম জানলার বাইরে অন্ধকার নিমগাছটার সেই ঝাপড়াগুলোর ভিতরে! অতীতকাল কোথাও কথা কইছে না! বোবা রাত্রি বুকের ওপর চেপে বসে। এই অবরোধের ভিতর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতুম। ওই যেমন পালিয়ে এসেছিল অনন্তরাম ন্যায়বাগীশ, যেমন পালিয়ে এসেছিল সেকালের সেই এক তরুণ কিশোর! গলায় তা'র পৈতের গোছা, শাদা উড়ুনী গায়ে জড়ানো, মাথাটা ন্যাড়া—সুন্দর সুকুমার কিশোর। আমিও যেন চলেছি তা'র সঙ্গে সেই শেষ রাত্রে। নৌকায় চলেছি নদীপথে নিরুদ্দেশে। টলমল

করছে নৌকা, অকূলের দিকে পাড়ি দিয়েছি আমিও তা'র সঙ্গে। ভবিষ্যৎ জানা নেই, জানা নেই এ জীবনের কোনো পরিণাম! সমস্ত কাঁদন বাঁধনকে ডিঙিয়ে, স্বজন পরিজন আত্মীয় বন্ধুকে ছেড়ে—ওর সঙ্গে একই নৌকায় পাড়ি দিয়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগলুম।

ভাঙন ধরেছে কলকাতায়, ভাঙন ধরেছে পাড়ায় পাড়ায়। কে যেন তাড়না করছে। দাঁড়িয়ে থাকা চলবেনা,—এগিয়ে যেতে হবে। কত জঞ্জাল জমেছে এই বাড়ীতে, কত কালের কত নোংরা স্তূপাকার হয়ে উঠেছে এখানে ওখানে, একোণে ওকোণে। কত ফাটলে বাসা বেঁধেছে চামচিকে, কত গর্তে ঢুকে রয়েছে কেঁচো আর কাঁকড়া বিছে, কত কীটপতঙ্গ সাপখোপ। এর উপরে পড়বে ভাঙনের আঘাত। ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে।

কালো বিড়ালটা কাঁদলেই ছাঁৎ ক'রে ওঠে বুকের ভিতরটা। ওর কান্নাটা কানে এলেই বুঝতে পারি, এ বাড়ীর থেকে আমাদের বাস উঠবে। দিদিমা বাড়ী বিক্রি করবেন। রামলাল দালাল খদ্দের আনছে।

ভাঙন ধরেছে আমাদের মনে, বাঁধন ভেঙেছে আমাদের জীবনে। জঞ্জাল সরিয়ে আমাদের এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। আমরা সবাই ঘরভাঙার কাজে লেগে যাই। কী আছে আমাদের? আছে আবর্জনা, আছে অদরকারী অনেক সামগ্রী। ওরা কোনো কাজে আসবেনা আমাদের, ওরা কেবল দিনে দিনে জমে উঠেছে আমাদের আশেপাশে। টিনের কৌটো, খালি শিশি, ছেঁড়া মাদুর, পায়াভাঙা জলচৌকি, পুরনো জুতো, কানাভাঙা কাঁচের বাটি, পারা-ওঠা ময়লা আরসি, দাড়াভাঙা চিরুনী। ময়লা বালিশ থেকে তুলো বেরিয়ে পড়েছে, তোষকের ভিতর থেকে বেরিয়েছে নাড়িভুঁড়ি। ফুটো বাল্‌তি, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, ছেঁড়া ছাতা,—ভাঙনের মুখে ওরা একটি একটি ক'রে বেরিয়ে পড়ছে আজ লোকসমাজের সামনে। ওরা আমাদের যাবার পথ আগলে রেখেছিল এতকাল, এবার যাবার তাড়ায় ওদেরকে পা দিয়ে সরিয়ে চ'লে যাবো।

হঠাৎ ওই আবর্জনার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে অদ্ভুত সামগ্রী। গোয়ালীয়রের রাজামার্কা একটি তামার পয়সা! পুরনো কাঠের সিন্দুকের ভিতর থেকে একপাল আরশোলার সঙ্গে বেরিয়ে আসে সমুদ্রের শুকনো

একখণ্ড ফেনা! আমরা অবাক হয়ে পরীক্ষা করতে থাকি। ঝুপসি কুলুঙ্গির ভিতর থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে খুঁজে পায় কোন্ দেশের পাহাড়ের একটি রামখড়ি। একরাশি ঝিনুক খুঁজে পেয়ে যাই আমরা। পেয়ে যাই গয়া-র পাথরবাটি, এক টুক্রো কষ্টিপাথর, একটি চুম্বক লোহা, এক শিশি চুয়া, পঞ্চবটির একখানা পুরনো ছবি, পিতলের পিনাটে বসানো একটি ছোট শিব-লিঙ্গ, তীর্থযাত্রার একখানা পুস্তিকা, ধূমপানের একটা পাইপ। ছোট একটি পুঁটলীও খুঁজে পাই। তা'র মধ্যে রুদ্রাক্ষ, লাল সূতো, টিনের আয়না, শুকনো ফুলের গুঁড়ো, সিঁদুর মাখানো চাউলের দানা। কী যেন আবিষ্কার করি সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে। ওর মধ্যে কত দেশের কাহিনী, কত ভ্রমণের ইতিহাস, কতকালের পুরনো গন্ধ।

কী কৌতূহল আমাদের চোখে মুখে। মা লক্ষ্য করতেন, কিন্তু কথা বলতেন না। অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে ধমক খেতুম,—ফেলে দে, ফেলে দে—ওসব জঞ্জাল আর সঙ্গে নিয়ে যাসনে।

জঞ্জাল, সবাই জানে। কোনো কাজে আসবে না, এও জানা। তবু ওই জঞ্জালেই মস্ত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। ওরা খবর আনে অতীতের প্রাচীনের, ওরা খবর আনে সুদূরের। সমগ্র বাল্যকালটা যেন অস্থির কৌতূহলে সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে দিদিমার মন শোকাচ্ছন্ন। তবু আমাকে ওই জঞ্জালের কাহিনী জানতে হবে বৈ কি, না জানলে স্থির থাকবো কেমন ক'রে বাকি জীবনটা? ভূগোলে প'ড়ে এসেছি যে সব দেশের নাম, তা'রা কেমন ক'রে এলো আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে,—আমাদের ওই ভাঙ্গা কাঠের সিন্দুকে?

দিদিমা? তুমি জানো না?—আমার জিজ্ঞাসা অস্থির হয়ে ওঠে।

চোখের জল মুছে দিদিমা বলেন, আহা অজ্ঞান—কোত্থেকে জানবে বলো মা? তিন মাসের ছেলেটি রেখে বাপ গেল, বাপের পরিচয় জানতে সাধ হয় বৈ কি। আহা, চোখে যেন আজো দেখতে পাচ্ছি। এই এতখানি বুকের ছাতি, মটর ডালের মতন রং, ঝাঁপা ঝাঁপা কোঁকড়া চুল, কী লম্বা চওড়া। পাশ দিয়ে গেলে পথের লোক চেয়ে থাকতো। রূপ দেখেই ত ঘরে জামাই করে এনেছিলুম! দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতো বাউণ্ডুলে হয়ে, বাপ ছিল ঘর-

জামাই, তাই অহঙ্কার ক'রে বাপের সম্পত্তি ছুঁলো না,—শেষ কালে ওর মামা গিয়ে ওকে ধরলো কাশীতে। সেখানেই তোর মায়ের সঙ্গে বিয়ে দিলুম ভাই। জামাইটি আমার বড্ড বদরাগী ছিল, কারো তোয়াক্কা রাখতো না। চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু রাজার মতন মেজাজ ছিল! চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতো,—শ্বশুর-শাশুড়ী শালা শালীকে গেরাহ্যি করতো না। বিয়ের রাত্তিরে বাসরে ব'সে বললে, বউ আমার শ্যামবর্ণ হোলো, আমি খুশী। সুন্দরী হ'লে কথায় কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো!—নতুন জামাইয়ের কথা শুনে আমরা সবাই অবাক।

পিতৃ-পরিচয় শুনে স্তব্ধ হয়ে দিদিমার দিকে চেয়ে রইলুম। দিদিমা বললেন, পড়াশুনোয় বড্ড মনোযোগ ছিল! যত রাজ্যের বই এনে রাত জেগে জেগে পড়তো। রাশি রাশি বই! বই নিয়ে একবার বসলে ঘরকন্নায় তা'র মন থাকতো না।

নিঃসাড়ে বসে সমস্ত গল্পটা শুনে যেতুম। রেড়ির তেলের পিদিমটা জ্বলে পুড়ে এক সময় যেন খাক হয়ে যেতো।

পুরনো কলকাতাটা ভাঙছে। ওর সঙ্গে বাল্যকালটাও যেন শেষ হয়ে আসছে। বস্তি ভেঙে যাচ্ছে আশে পাশে। ময়নাদের ওখান থেকে ঘুঁটে কিনে আনতুম, তাদের ঘরকন্নাও একদিন ভেঙে গেল। খাঁদা শুঁড়ি একদিন এসে জানালো, গোঁসাই কলু ম'রে গেছে। দিদিমা চোখের জল মুছলেন। ভাদুড়ীদের কর্তার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন খেয়ে এলুম এই ক'দিন আগে। ছাদের আল্‌সের ধারে দাঁড়িয়ে যতদূরে দৃষ্টি চ'লে যেতো—পশ্চিমে আর উত্তরে—খোলার চালা আর বস্তি, পুরনো বাড়ী আর অলিগলি,—সর্বত্র শুধু ভাঙছে। হুকুম এসেছে ভাঙনের। সবাই ছন্নছাড়া হয়ে চলেছে।

আমাদের যাবার দিন স্থির হোলো।

গোলা পায়রারা থাক্ ওদের কোটরের মধ্যে, চামচিকেরা থাক্ ফাটলে-ফাটলে, ইঁদুরেরা থাক্ গর্তগুলোয়, আনাচে কানাচে থাক্ মাঝরাত্রির সেই ভূত পেত্নী দৈত্য পিশাচের দল,—ওদের সকলের হাতে রাজ্যপাট রইলো,—আমরা এবার বিদায় নিয়ে চ'লে যাচ্ছি।

তুচ্ছ

অল্প জায়গার মধ্যে ঘুরছিলুম এতদিন। আশে পাশে আঁকা-বাঁকা গলি ঘুঁজি, বস্তির ভিতরকার বিচিত্র গোলক ধাঁধার পথ,—কিন্তু সমস্তটা যেন আমার চিরকালের চেনা। গঙ্গার মার মতন আমিও যদি অন্ধ হতুম, তবে আমারও অসুবিধে হোতো না। পা বুলিয়ে বুলিয়ে, গন্ধে-গন্ধে—সমস্ত পাড়াপল্লীর প্রত্যেকটি পরিচিত ঘরে, প্রতি গলিতে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারতুম। চোখ বুজে আমি চ'লে যেতে পারতুম মিত্তিরদের বাড়ী ডাইনে রেখে অর্জুনের দোকান ছাড়িয়ে মহাকালী পাঠশালাটা পেরিয়ে পুঁটি বাগানের পথটা ধরে কচিদের বাড়ীর ধার দিয়ে। তারপর সোজা ফিরে আসতে পারতুম আমাদের গলিতে। কিন্তু এর বাইরে যে কলকাতা, সেটা আমার কাছে গল্প, আমার কল্পনা। আজ সেই অজানা কলকাতার মস্ত বড় বিস্তারের মধ্যে কোথাও চ'লে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। সেই জগৎটা একেবারে অপরিচিত। পুরনোটা পিছনে ফেলে যেতে কান্না আসছে, নতুনটা মনে মনে দুর্ভাবনা আনছে। আমাদের যাবার দিন স্থির হয়ে গেল।

মামা বললেন, আমি যাবো না, এ আমার বাপ পিতামোর ভিটে। যদি বিক্রি হয়, তবে হাইকোর্ট থেকে ফিরিয়ে আনবো। আবার ভাড়া বসাবো এ বাড়ীতে। আবার ডালিমের গাছ এনে বসাবো বেলতলার পাঁচিলে, আবার আমি নতুন বেড়াল পুষবো। এ আমার হকের ধন, একে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। আর যদি দেখি তেমন বেগতিক, তবে রইলো আমার কাছে ওই ছুরি। নিজের বুকে বসাবার আগে আর পাঁচটাকে নিকেশ ক'রে তবে যাবো।

বেশ, তাই করিস্,—দিদিমা চুপ ক'রে যান্! যাবার জন্য তিনি গোছগাছ করতে ব্যস্ত ছিলেন। বিবাদ আর তিনি বাড়াতে চান না। ছেলের বুদ্ধি, বিদ্যা ও শক্তির সীমা তাঁর জানা ছিল।

কিন্তু আমরা এখান থেকে এর আগে গিয়েছি অনেকবার, আবার ফিরে-ফিরে এসেছি। বাঘমারিতে গিয়েছি, গিয়েছি সেই বল্‌দে পাড়ায়। তারপরে গিয়েছি লতাদের বাড়ীতে, সেখান থেকে সেই কেষ্টদাসীদের বাড়ী। গিয়েছি বটে, কিন্তু থাকতে পারিনি,—আবার দিদিমা এখানে এনেছেন ফিরিয়ে। এবার যাচ্ছি মাণিকতলায়। এই আমাদের শেষ যাওয়া, শেষ ক'রে চ'লে যাওয়া।

এখানকার এই জরাজীর্ণ ঘরে ঘরে আমার অবাধ্য বাল্যকালটা যেন আব্দার

ধ'রে কাঁদতে বসেছে। ওই মামার জন্যে কাঁদছে মন অকারণে। ওই মামার হাতে হয়েছে কত অপমান, কত দিনের কত লাঞ্ছনা। ভাতের থালা ফেলে পালিয়েছি ওঁর ভয়ে, ঘর ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ওঁর তাড়নায়, ওঁর মুখের গালাগালি শুনে সবাই কানে আঙ্গুল দিয়েছে, ওঁর ছুরি আর লাঠির আতঙ্কে বন্ধ ঘরে থেকেছি আমরা কতদিন! কতবার থানায় খবর দিয়ে পাহারাওলাকে এনে বসাতে হয়েছে; গোঁসাই কলু, অক্রুর চাটুয্যে আর মণি মিত্তির এসে দাঁড়িয়ে কতদিন বিবাদ মিটিয়েছে তা'র সংখ্যা নেই,—কিন্তু তবু দিদিমা একবারও ভয় পাননি। দুরাচার ও দুঃশীল পুত্রকে পৈতৃক সম্পত্তির থেকে বঞ্চিত করতে তিনি একটুও পশ্চাৎপদ হননি। দিদিমা আমাদের বড় কঠোর। অশ্বত্থ যত বৃদ্ধ হয়েছে, ততই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি টলেননি।

ঘোষ লেনের সামনে মানিকতলায় যেদিন ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম, সেদিন এবাড়ী কেনবার খদ্দের ঠিক হয়েছে। মামা রইলেন এবাড়ীতে একা। আগামী বৃহস্পতিবারে বিক্রয় কোবালা রেজিষ্ট্রি হবে।

বাড়ী মস্ত বড় ছিল, মামী তাই ভয় পেলেন। মামী বললেন, তিনমহল বাড়ী—এ বাড়ীতে থাকবে কে একলা? সন্ধ্যের আলো দেবে কে? ঝাঁট পড়বে কা'র হাতে? আফিংখোরের সঙ্গে আমি একলা এখানে বাস করবো না! গলা টিপে যদি আমাকে মারে একদিন, তবে জানবে কেউ? দস্যুকে সামলাবে কে?

দিদিমা বললেন, দস্যু তোমার স্বামী নয়? সাত পাক ঘোরোনি একদিন? শুভদৃষ্টি করোনি? অগ্নিসাক্ষী ক'রে এক পিঁড়িতে বসোনি? এক বিছানায় শোওনি?

রাম বলো! গেল জন্মের কথা!—মামী বাঁকা মুখে ঠোঁট উল্টে বললেন, গাঁজাগুলি খেয়ে ভূতনেত্য করবে জানলে মাথার সিঁদুর কবেই মুছে ফেলতুম। আমি থাকবো না, ছেলের সঙ্গে আমি কালই কেষ্টনগরে চ'লে যাবো।

মামী সত্যই চ'লে গেলেন তা'র পরের দিন। যাবার ঠিক আগে মামা চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আছে! তোর কেউ সেখানে ঠিকই আছে! তুই নষ্ট

মেয়েমানুষ,—পঁয়ত্রিশ বচ্ছর ধ'রে তুই সেই ব্যাটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিস। সে আজ তোকে ডাকছে সেখান থেকে।

মুখে আগুন কথার!—মামী ঠিক্‌রে উঠলেন।

তামাকের গড়গড়ার সেই বড় চিম্‌টেটা নিয়ে মামা তাড়া ক'রে গেলেন মামীকে, আর প্রবীণ বয়স্কা মামী তাঁর পুঁটলিটি হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। সদর দরজায় ছুটে এসে দাঁড়িয়ে মামা শাসালেন, ফের যেদিন ধরতে পারবো, সেদিন এই চিম্‌টে দিয়ে তোর মাংস তুলে-তুলে নেড়িকুকুরকে দিয়ে খাওয়াবো!

মামী ততক্ষণে হন হন ক'রে লালার দোকান ছাড়িয়ে শীলেদের বাড়ীর ধার দিয়ে নির্মল সরকারের বাড়ীর পাশ দিয়ে ছুটে চললেন পূর্বদিকে। মামীর পক্ষে বিয়ের পরে এই প্রথম বাপের বাড়ী যাওয়া! যাবার ঘটা দেখে পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছিল।

অতঃপর মামা রইলেন একা সেই শূন্যপুরীতে। তিনি ঘড়ি সারানোর কাজ তখনও করেন বটে, কিন্তু ঠিক বোঝা যায়নি, তাঁর আহারাদির পর্বটা চলে কেমন ক'রে! বাড়ীটায় দিনের বেলাতেই একা থাকতে কেমন গা ছমছম করে, রাত্রির কথা ত' আলাদা। খাঁ খাঁ করছে তিনমহল, ভিতরের ঘরে ঘরে হাওয়ার হাহাকার, নীচের তলাটা প্রেতলোক, আশেপাশে কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, বস্তিপল্লীতে সরকারি ভাঙনের ফলে সমস্ত লোকজন পাড়া ছেড়ে কে কোথায় চ'লে গেছে, অন্ধকার সাঁ সাঁ করছে বাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে। হয়ত পিদিমের তেল ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু সেই অন্ধকারে কোনো এক ঘরে ব'সে রয়েছেন মামা। চোখে তাঁর ঘুম নেই, কিন্তু ঘুমেল চোখ। গড়গড়ার নলটা হাতে, আফিঙের আমেজ আছে মাথায়, উবু হয়ে ব'সে আছেন তিনি ছেঁড়া কাঁথার ওপর,—আর ভাবছেন শুধু হাইকোর্টের কথা। এই প্রেতপুরী তাঁর পৈতৃক, এ হোলো ফলনা ভট্‌চার্যির সম্পত্তি,—তিনিই একমাত্র ওয়ারিস, সুতরাং মহামান্য হাইকোর্টের সাহায্যে এ সম্পত্তি জননীর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা দরকার! মামলা একবার ঠুকলে আর তাঁকে রোখে কে?

কিন্তু মামলার খরচের টাকা?

মামা এলেন একদিন সকালে মানিকতলার ভাড়া বাড়ীতে। বাড়ী বিক্রির

রেজেষ্টারী তা'র এক সপ্তাহ আগে হয়ে গেছে। দিদিমা সমস্ত টাকা পেয়ে গেছেন ক্রেতার হাত থেকে। এখন তিনি অতিশয় শোকার্ত মনে কাশী যাবার জন্য মন প্রস্তুত করছিলেন। বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্য মামাকে একমাসের সময় দেওয়া হয়েছিল।

মামা এসে দিদিমার সামনে অদূরে বসলেন। পুরনো ছাতিটি দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে বললেন, হয়ে গেছে বিক্রি? টাকা পেয়ে গেছ?

দিদিমা বললেন, হ্যাঁ।

মামা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে এক সময় বললেন, হুঁ, গজকচ্ছপ! পাছে মামলা বাধে আমার সঙ্গে, তাই ব্যাটা এখনো দখল নিতে আসেনি বুঝতে পারছি।

দিদিমা বললেন, সে আসেনি, পেয়াদা আসবে! বাঁশের চাড়া দিয়ে তুলবে। একমাস পেরিয়ে গেলেই গলাধাক্কা!

তুমি বোঝো না, সম্পত্তির কিচ্ছু বোঝো না তুমি!—মামা বললেন, আমি না বলেছিলুম, স্ত্রীধনের প্রমাণ নেই? ছেলে ওয়ারিশন্ থাকতে মায়ে বেচতে পারে না? ওসব বিক্রি আর রেজেষ্টারী রাখো! টাকা হোলো কপালের ফল, হাতে পেয়েছ রেখে দাও। আর টাকা পেলেই কি সম্পত্তি হাতছাড়া হয়! আদালত-মকোদ্দমা নেই? হাইকোর্ট নেই? বাড়ী রেজেষ্টারী দলিলে বেচে টাকা পেয়েছ, বহুৎ আচ্ছা, টাকাটা তুলে রেখে দাও! ল্যাঠা চুকে গেল! আমি বাড়ী ছাড়িনি, কারণ বাড়ী আমার! তুমি বাড়ী ছেড়েছ, টাকা তোমার! সোজা কথা! টাকাটা তোমার, আর বাড়ীখানা আমার!

দিদিমা বললেন, সকালবেলা বুঝি গাঁজায় দম দিয়ে এসেছিস?

ওই দ্যাখো, উল্‌টো বুঝলি রাম!—মামা যেন একটু ক্লান্তকণ্ঠে বললেন, কথাটা বোঝো, সাক্ষীর জোরে কী না হয়! অত বড় হাইকোর্ট দাঁড়িয়ে আছে শুধু সাক্ষীর জোরে! তোমার সাক্ষী না হয় হীরেন দত্ত, আর আমার সাক্ষী খাঁদা শুঁড়ি নেই? ওই তোমার গোবর্ধন ময়রা নেই? কার্তিক স্যাকরা নেই? সব আছে, সব উঠবে মাটি ফুঁড়ে! মামলার টাকা পেলেই বাড়ীখানা ফিরিয়ে আনবো!

মামলা চালাবি, হাইকোট করবি, সাক্ষী ডাকবি,—টাকা দিচ্ছে কে তোকে?

তুমি!—মামা এবার বেশ গুছিয়ে বসলেন।

আমি? আমার নামে মামলা করবি, আর আমি তোকে টাকা দেবো? নেশাভাঙ ক'রে বুঝি তোর আর মাথার ঠিক নেই?

ওই দ্যাখো, আবার উল্‌টো বুঝলি রাম! তোমার নামে মামলা হবে কেন? যে ব্যাটা বাড়ী কিনেছে, তা'র নামে! জাল-উইলের সম্পত্তি সে যে বেনামীতে কিনেছে! তুমি টাকা নিয়ে ব'সে থাকো গ্যাঁট হয়ে, ওবেটাকে আমি ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো! দেখছো না, ওই জন্যেই আজো দখল নিতে আসেনি! ব্যাটা ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি হাত করতে গিয়েছিল কিনা, তাই পুলিশের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। এ যে ফৌজদারি মামলা, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর!

দিদিমার কাছাকাছি আমি এক পাশে বসেছিলুম। মামা হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন। বললেন, কথাগুলো গিলছে দ্যাখো! ব্যাটা নিঘ্‌ঘাত গোয়েন্দা, মনে-মনে সব টুক্‌ছে!

মামার সেই ছোট ছোট ভীমরুলের মতন চোখ দেখলেই আতঙ্কে গলা শুকিয়ে আসতো। আস্তে আস্তে উঠে আমি আড়ালে স'রে গেলুম। মামা পিছন থেকে বললেন, জন-জামাই-ভাগ্‌না, তিন নয় আপ্‌না! লুটেপুটে সব নিলে চিরকাল।

দিদিমা এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন, তা'হলে তুই মামলাই করগে যা, আমার কাছে আর কেন?

তাই ত' যাবো,—শুধু টাকাটার অপেক্ষা।—মামা বললেন, আগে বাড়ীখানা ভাড়া দেবো, রসিদ কাটবো নিজের নামে। নতুন দলিল তৈরী করাবো,—উকীল এটর্নী'রা আমার হাত-ধরা। সাক্ষীরা সব মজুত। বেটাকে এবার তুর্কি নাচন নাচাবো।

দুর্গা দুর্গা,—তোকে পেটে ধরেছি, সাত জন্মের পাপ! কিন্তু তোকে আমি পথের 'বেগার' করবো না। কুপুত্তুর যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়! তিন হাজার টাকা তোকে আমি দেবো—লোকে জলেও ত' ফেলে দেয়,—তাই দেবো। এই টাকা নিয়ে মানে-মানে যদি জীবন কাটাতে পারিস ত' ভালো, নৈলে ভিক্ষে করিস, আমি আর খোঁজ নেবো না!

ঘাড় দুলিয়ে মামা বললেন, উল্টো বুঝলি রাম! তিন হাজার টাকা খরচ

ক'রে তিরিশ হাজার টাকার সম্পত্তি ফিরিয়ে পাবো, সেটা দেখলে না! তুমি দেখাবে গোপাল মল্লিক, আমি দেখাবো হাইকোর্ট! তিন হাজারই সই! মাসে পাঁচশো টাকা মামলায় খরচ হ'লে ছ'মাসে সম্পত্তি ফিরবে ওই টাকায়! কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে বলবো, হুজুর, খরচা সুদ্ধ বাড়ী আমার ফেরৎ চাই! জজের পেশকার হোলো আমার এক কল্‌কের ইয়ার!—টাকাটা কখন্‌ দেবে বলো দিকি?

কাল এসে নিয়ে যাস।—দিদিমা ওঠবার চেষ্টা করছিলেন।

ওর ওপর আর গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমাকে দিয়ো। আমারো এই শেষ পাওনা! বাজারে কিছু ধার আছে, জামা কাপড় বিছানা কিছুই নেই, দুধের দরুণ তিন টাকা বাকি, আফিঙও ফুরিয়ে এলো! হাত একেবারে খালি।

মামার ক্লান্তকণ্ঠে কোথায় যেন উদ্দীপনার অভাব মনে হচ্ছিল। যে ব্যক্তি পরিবারের সবাইকে চিরদিন হত্যার ভয় দেখিয়ে ছুরিতে শান দিয়ে এসেছে, সে যেন হঠাৎ আজ জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

পরদিন এসে মামা টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোনোদিনই তিনি মামলা ঠোকেননি। তা ছাড়া হাইকোর্ট অনেক দূর, অনেক কাঠখড় না পোড়ালে হাইকোর্টে পৌঁছনো যায় না। তা'র চেয়ে বরং ওই টাকায় খাঁদাশুঁড়িদের পাড়ায় গিয়ে তিন টাকায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাবে। তা'র আগে চুলের ঝুঁটি ধ'রে মামীকে বাপের বাড়ী থেকে টেনে আনা দরকার।

কিন্তু মামী আর এজীবনে স্বামীর ঘরে ফিরবেন না। কথা উঠলো, তবে কি মামা যাবেন শ্বশুরবাড়ী? কেউ বললে, তা যেতেও পারেন। কেউ বললে, গেলেও মামীকে আর ফেরানো যাবে না। কেউ বা বললে, রাম বলো! শ্বশুর-বাড়ী যাবেন উনি কোন্‌ মুখে? বছর তিরিশ আগে এক জামাই ষষ্ঠীর দিনে খাদ্‌রি বাঁশ নিয়ে শাশুড়ীকে ঠ্যাঙাতে গিয়েছিলেন। খড়ে নদী সাঁতরে শ্বশুর পালান্‌, আর শাশুড়ী সেই জামাই ষষ্ঠির রান্নাবান্না ফেলে এক বাগ্দীর বাড়ীতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান্‌!

তারপর?

তারপর যা হয়! পাড়ার ছেলেরা লাঠি সোঁটা নিয়ে পাঁদাড় পেরিয়ে জামাইকে তাড়া করে! কিন্তু জামাই তা'র আগেই শ্বশুরের বাক্স ভেঙে লুটপাট ক'রে খিড়কির বাগান পেরিয়ে সট্‌কান্‌ দেয়! ধরতে পারেনি কেউ!

সুতরাং জানতে পারা গেল, মামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মামার পক্ষে আপাতত শ্বশুরবাড়ীর দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছুকাল পরে দিদিমার কানে খবর এসেছিল, হাইকোর্টের কোন্ উকীলের ফাঁদে মামা নাকি পা দিয়েছেন। সে-ব্যক্তি নাকি এই কথা জানিয়েছে, বাপের সম্পত্তি ছেলেই পায়। মামলা একবার ঠুকলেই বাজীমাৎ।

কাশীতে ব'সে দিদিমা এই খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু আর কিছু জানবার ঔৎসুক্য তাঁর ছিল না। নিশ্বাস ফেলে কেবল বলেছিলেন, অনন্তরাম ন্যায়-বাগীশও একদিন ভিক্ষেয় বেরিয়েছিল পথে পথে, দুশো বছর পরে তা'র বংশ আবার ভিখিরি হোলো! মরুক গে, আমি আর ভাববো না!

*

প্রায় বছর ন'য়েক পর্যন্ত স্ব-গৌরবে মামা জীবিত ছিলেন। শেষের দিকে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গিয়েছিলেন কাশী। দিদিমা তখন দৃষ্টিশক্তিহীন, কপর্দকশূন্য।

কাশীতে আমি তখন এক ছাপাখানায় চাকরি করি এবং দিদিমার কাছাকাছি থাকি। মামা উঠেছিলেন সোনারপুরার কোনো একখানা বাড়ীর নীচের তলাকার ঘরে। সমগ্র পল্লীটি মামার দাপটে তখন হৃৎকম্প। মামার কণ্ঠে সেই পুরনো ভাষা, সেই অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর,—স্ত্রীধনের সম্পত্তি? সোনার পাথরবাটি? জাল-উইলের জোরে আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে খারিজ করেছে! আর আমি সবুর সইবো না। এবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নম্বর!

নখদন্তহীন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের সেই প্রাচীন হিংস্রতা আজও অব্যাহত রয়েছে। তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীতে থেকেও তাঁর চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্বভাবধর্ম তাঁর অক্ষুণ্ণই ছিল। দুর্যোধন মৃত্যুকাল অবধি সত্যাশ্রয়ী ছিল বৈ কি।

ঘটনাচক্রে মাসির বাড়ী ছেড়ে আমাকে এক হিন্দুস্থানীর বাড়ীতে ঘরভাড়া করতে হয়েছিল। মাসিক ভাড়া দুই টাকা। মামা একদিন হঠাৎ সেখানে গিয়ে উঠলেন। বিজয়োল্লাসের হাসি হেসে বললেন, এই ত' চাই—মামার নাম

রেখেছিস তুই। একেই বলি বাপের ব্যাটা। বেশ, দশটা পাঁচটা চাকরি করবি, আমি তোর ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দেবো। এক হাঁড়িতে মামা ভাগ্নে খাবো, আমাকে শুধু আফিঙের পয়সাটা দিস, বাবা। মেজমাসি নাকি তোকে সম্পত্তির অংশ দিতে চেয়েছিল শুনলুম? খবরদার, লোভ করবিনে! তোরা হ'লি সন্নিসির বংশ! তোর ঠাকুরদাদা রামকেষ্টপুর ঘাটে ব'সে দ্বিতীয় পক্ষের মাগিকে সর্বস্ব দান করেছিল। রাজা-রাজড়ার মেজাজ ছিল যে!

মুখ তুললুম মামার দিকে।

মামা বললেন, হাঁ, সেই মাগির নাম ছিল কাদম্বিনী, গোলাপসুন্দরীর সতীন। মাগি ছিল শঠ। কৈকেয়ী যেমন দশরথকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিল, ঠিক তেমনি। যা চাইবে তাই পাবে। তোর ঠাকুরদাদাটা ছিল গাধা, মাগির ফাঁদে পা দিয়েছিল। একদিন গঙ্গার ঘাটে ব'সে জপ করছিল, মাগি সঙ্গে নিয়ে গেল উকীল মোক্তার। সাক্ষী সাবুদের সঙ্গে যথাসর্বস্ব সই করিয়ে নিলে। লোকটার হাতে রইলো শুধু পেতলের একটা ঘটি। ফরিদপুর আর পাবনায় তোদের ছিল মস্ত সম্পত্তি, সেসব থাকলে ভাবনা কি ছিল?

মামা ছিলেন অনেকদিন আমার সঙ্গে। এক ঘরেই ছিলুম দুজনে। সেই মামা, সেই দানব, সেই হত্যাগ্রহী—যার ছুরি শানাবার আওয়াজ শুনে আমরা ঘর ছেড়ে পালাতুম পথে, নয়ত চিলে কোঠায়, নয়ত খাটের তলায়। যার হুঙ্কারে বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ানো দায় ছিল, যার সামনে কেউ কখনো মাথা তোলেনি। রোগা, লম্বা, কালো, কাঁচাপাকা দাড়ি, গাঁজা-আফিঙ ও বিভিন্ন মাদকের প্রভাবে যার মুখের উপরে বীভৎস আক্রোশের ছাপ দেখে এসেছি আশৈশব। সেই মামা। সেই মামা আমার জন্য রাঁধেন, আলু-বেগুন কিনে আনেন, আমার বিছানা পেতে রাখেন, আমার জন্য ভাতের থালা সাজিয়ে ব'সে থাকেন। তাঁর চোখে আমার যা কিছু সব ভালো। একদিন সেই হিন্দুস্থানীর এক আঁটসাঁট সোঁদা মেয়ে নাকি আমার দিকে বাঁকাচোখে চেয়ে হেসেছিল, মামা গিয়েছিলেন খুন্তি নিয়ে তা'র মাকে খুন করতে। নারীজাতির দিকে তাকিয়ে মামা বলতেন, ওদের গুষ্ঠি খারাপ!

সেই মামার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছিল কাশীতে,—তখন তাঁর টাকা নেই, স্বভাবের প্রচণ্ডতা কমে এসেছে, হাইকোর্টের কথাটা প্রায় ভুলতে বসেছেন—

আছে কেবল সেকালের সেই ক্ষয়িষ্ণু দেহ, আছে ঊনিশ শতাব্দির কঙ্কালের ভগ্নাংশ। তাঁর যখন মৃত্যু হোলো, আমি তখন পাঞ্জাব থেকে ফিরছিলুম কলকাতায়। তাঁর শ্রাদ্ধ হোলো যাদবপুরে।

শীতকাল, কিন্তু কী ঝড়বৃষ্টি সেদিন। শ্রাদ্ধবাসর একেবারে লণ্ডভণ্ড। কলাপাতা উড়ে গেল, পুরোহিত পালালো, উনুন নিবে গেল, নিমন্ত্রিতরা গা ঢাকা দিয়ে প্রাণ বাঁচালো। সেই দানবীয় দুর্যোগের দিনে জল কাদা ঠেলতে ঠেলতে সবাই বাড়ী ফিরলো। মামার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সেদিন হ'তে পারলো না।

এর বছর দেড়েক পরে দিদিমার দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে।

*

দিদিমার মুখে বাল্যকালে বহু শ্লোক শুনতুম। একটি মনে পড়ে, "এক বৃক্ষে নানা পক্ষী নিশীথে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে তা'রা কেবা কোথা যায়।"

দিদিমা ছিলেন বনস্পতি। সেই বনস্পতির শিকড় শুদ্ধ পতন ঘটেছিল। বাড়ী বিক্রির পর থেকে সবাই হয়ে গেল ছন্নছাড়া। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সবাই নানাদিকে ছিট্‌কে পড়েছিল।

ওদিকে ভাঙ্গন ধরেছে কলকাতায়। সেই ভাঙ্গনের আঘাতে প্রাচীনের কাঁদন মিলিয়ে গেছে, বাঁধন শিথিল হয়ে খসে পড়েছে, কোথাও কিছু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। যা কিছু আমাদের আশৈশবের চেনাশোনা, চারিদিকের যে পরিচয়টার মাঝখানে দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছিলুম,—সেটা ভাঙ্গনের টানে ভেসে যাচ্ছিল। এবার থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। খিড়কির আনাচে কানাচে ঘোরা হয়েছে, অলি-গলিতে পাক খাওয়া হয়েছে, এবার থেকে সদর দরজায়, এবার থেকে বড় রাস্তায়। পৃথিবীর মুখোমুখি।

তবু মন প'ড়ে রইলো ওইখানে, ওই ক্ষিরি নাপতিনির দাওয়ায়, ওই গঙ্গার মার চৌকীর তলায়, নলিতবাবুর বৌয়ের রান্নাঘরে, অন্ধ বুড়োর মন্তর

পড়া ঘটির জলে। ওই মহাকালী পাঠশালার পাশ দিয়ে অর্জুনের দোকান ছাড়িয়ে পুঁটি বাগানের গা দিয়ে—ওই রহস্য রন্ধ্রপথের কোথাও যেন শেষ নেই। খৃষ্টানদের গির্জাটার ওই বাগানে—যেখানে কৃষ্ণচূড়া আর দেবদারু গাছের ডালে-ডালে মধ্যাহ্ন পাখীর তন্দ্রা জড়ানো ক্লান্ত কাকলী চিরকালের জন্য মর্মে ছুঁয়ে রইলো। কত লোক মরেছে, কতজন কেঁদেছে, কত চেনা মানুষ কোথায় তলিয়ে গেছে, কত জীবনের ধারা কোথায় গিয়ে শুকিয়ে গেছে,—সেই যাদের নাম জানতুম না, খোঁজ পেতুম না, পরিণাম ভাবতুম না,—তারা তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে গেছে সেদিনের সেই অর্বাচীন বালকের বুকে। প্রাচীন আর নবীনের যুগ সন্ধিক্ষণে সেই তরুণ বালক তখন দাঁড়িয়ে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। প্রথম মহাযুদ্ধের তখন অবসান ঘটেছে। ভাঙ্গন ধরেছে কলকাতায়, বাঁধন কেটেছে জীবনের। তরঙ্গ উঠেছে সাগরে। ডাক এসেছে সুদূরের।